লেখকের রোজনামচা

আবুল ফজল

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলাবাজার, ঢাকা।

চিন্তাহীনতার এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে
যাঁরা চিন্তার দীপ-শিখাকে অনির্বাণ রাখতে
নিরন্তর প্রয়াসী সেই স্বল্প-সংখ্যকদের হাতে

'Let the living live ; and you, gather together your thoughts ; leave behind you a legalcy of your feeling and ideas ; you will be most useful so.'

Amiel's Journal

কথা প্রসঙ্গে

রোজনামচা বা জার্ণেলও এক মূল্যবান সাহিত্য কর্ম। এতে প্রতিফলিত হয় লেখকের মানস-চেতনা আর প্রতিদিনের মন-মেজাজের ছবি। অধিকন্তু অনিবার্য ভাবে এর উপর ছায়া ফেলে দেশ কাল সমাজও। যে সব ঘটনা লেখক দেখেন, শোনেন, কর্ম অকর্মের যে প্রবাহ তাঁর জীবন বৃত্তের চারদিকে প্রতিনিয়ত আবর্তিত, বিশেষ করে যা-কিছু এসে তাঁর মনের তটে আঘাত হানে, রোজনামচায় সে সবকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন তিনি। তাঁর জীবন দর্শনের স্বাক্ষর এমন রচনাকে দেয় বিশিষ্টতা।

রোজনামচার গুরুত্ব সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আমি নিজেও যে সচেতন ছিলাম তা নয়। থাকলে আরো বহু কথা, বহু ঘটনা লিখে রাখা সম্ভব হতো সম্ভব হতো এ শতাব্দীর বিগত আধখানায় মূল্যবোধের যে উত্থান পতন আমরা চোখের সামনে দেখেছি তারো কিছু ছবি ধরে রাখা। সে সঙ্গে স্বভাবতই লেখকের মন মানসেরও একটা ছক আঁকা হয়ে যেতো। যেমন কিছুটা আঁকা হয়েছে এ লেখাগুলিতে। অধীত বিদ্যা থেকে আহরণ আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস, সে আহরণের যথেষ্ট নিদর্শন এ বইর গায়ে ছড়িয়ে আছে।

ষাটের কোঠায় এসে হঠাৎ এধরণের রচনা সম্বন্ধে আমার চৈতন্য হলো। সে চৈতন্যেরই ফলশ্রুতি এ রোজনামচা। কাজেই জীবন ভর যা দেখেছি, যা জেনেছি এবং যা পড়েছি সে অনুপাতে এখানে যা লেখা হয়েছে তা সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। কারণ, কালের দিক থেকে এর পরিধি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এ বইকে আমার 'রেখাচিত্রের' দোসরও মনে করা যেতে পারে। দুই বইয়ে ঘটনাগত না হলেও চরিত্রগত মিল রয়েছে। লেখক শুধু চোখ দিয়ে দেখে না; দেখে মন দিয়েও। ফলে লেখায় তাঁর মনের ছোঁয়া যেমন লাগে, তেমনি লাগে তাঁর চিন্তা ভাবনার রঙও। এ ধরণের রচনায় লেখকের ভালো লাগা মন্দ লাগার প্রতিফলন কিছুটা বেশী করে ঘটে বলে এ প্রায় হয়ে উঠে লেখকের সার্বিক দৃষ্টিভংগিরও এক চলমান ছায়াছবি। আর এতে ধরা পড়ে লেখকের অন্তর-জীবনের ছবি অনেক খানি নিখাদ অবস্থায়। তাই তাঁকে বুঝতে 'রোজনামচা' এক অদ্বিতীয় উপকরণ।

স্মৃতি-কথার মতো রোজনামচায়ও লেখকের নিজের কথা অনেক বেশী এসে পড়ে। মাঝে মাঝে তা যে প্রায় আত্ম প্রচারণার সমধর্মীয় হয়েও পড়ে না, তা নয়। লেখক এ ব্যাপারে নিরুপায়। কারণ রোজনামচা মানে প্রতিদিনের আত্মকথা, আত্মকথায় আত্মপ্রচারণার ভংগি কিছুটা না এসে পারে না। বিশেষত যখন অন্যেরা তাঁর সম্বন্ধে কথা বলেন আর সে কথাকে ত দিতেই হয় স্থান। নিজের প্রতি খাঁটি হতে গেলে এ না করে উপায় থাকে না। তা ছাড়া এ সব বাদ দিতে গেলে লেখকের অভিজ্ঞতা আর মানস প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় পড়ে ছেদ, তখন এ জাতীয় রচনায় ঘটে স্বধর্মচ্যুতি। তবে সব কথার সেরা কথা ঃ দেখতে হয় সব কিছু মিলে রচনা সাহিত্য হয়েছে কিনা আর তাতে পাওয়া যায় কিনা সাহিত্যের কিছুটা স্বাদ।

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে 'রোজনামচা' লেখার রেওয়াজ আজো চালু হয়নি। চালু হোক এ আমি মনে প্রাণে কামনা করি। আমার এ রচনা সে কামনারই এক 'ক্ষমা চাওয়া।' এও সাহিত্যের এক স্বীকৃত আঙ্গিক, এমন রচনারও যে একটা বিশেষ স্বাদ ও বর্ণ গন্ধ আছে তা সাহিত্য রসিকদের নতুন করে বলার প্রয়োজন করে না। যতই সীমিত, খণ্ডিত আর ব্যক্তি কেন্দ্রিক হোকনা, 'রোজনামচা'ও লেখকের মন মানসের যেমন তেমন কালেরও এক নির্ভেজাল দলিল। সে দলিলের মূল্য সব সাহিত্যের ইতিহাসেই স্বীকৃত।

এ গ্রন্থের বেশীর ভাগ প্রায় দু'বছর ধরে মাসিক সওগাতে প্রকাশিত হয়েছে। সওগাতের প্রবীণ সম্পাদক জনাব নাসিরউদ্দিন সাহেবের কাছে এ জন্য আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আমাদের মধ্যে তাঁর মতো সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু খুব কমই আছেন।

পরিশিষ্টে, আমার বিভিন্ন রচনা থেকে চয়িত 'শত উক্তি' নামে যা স্থান পেয়েছে আমার এক জন্মদিবস উপলক্ষে (১৯৬৩) চট্টগ্রামের এক দৈনিকে তখন তা 'একে একে এক শ' এ নামে ছাপা হয়েছিল। যে সব তরুণ অনুরাগী বহু আয়াসে ঐ সব চয়ন করেছিলেন তাঁদের নাম এখন ভুলে গেছি। তাই উল্লেখ করা সম্ভব হলনা। তবে যতদূর মনে পড়ে এগুলিকে

সাজিয়ে প্রকাশের উদ্যোগ আর আনুসঙ্গিক যা-কিছু করণীয় তা করেছিলেন তরুণ লেখক অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ ('একে একে একশ' এ নামটিও বোধ করি তাঁরই দেওয়া) আর দৈনিক আজাদীর মালিক আর পরিচালনা সম্পাদক স্নেহভাজন আবদুল মালেক। উভয়ের প্রতি আমার অশেষ স্নেহ আর শুভেচ্ছা থাকলো।

সাহিত্য নিকেতন
চট্টগ্রাম
অক্টোবর, ১৯৬৯

আবুল ফজল

১. ১. ৬৩

সভ্যতার এখন মোটামুটি দুই চেহারাই আমরা দেখতে পাচ্ছি—প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য। সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে সভ্যতা জন্ম নিচ্ছে তার চেহারা এখনো আমাদের কাছে তেমন পরিস্ফুট নয়। আমাদের প্রাচ্য অনেকখানি স্থির ও স্থাণু। এর প্রধান রূপ আর বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাস আর আচার বিচারকে মেনে নেওয়া আর মেনে চলা। জিজ্ঞাসার স্থান এতে অতি সীমিত, অন্য দিকে পশ্চিমী সভ্যতার গোড়ার কথাই হলো জিজ্ঞাসা। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে—অতৃপ্তি আর আত্ম-সমালোচনাই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ। অতৃপ্তির পথেই আসে জিজ্ঞাসা আর আত্ম-সমালোচনাই বাৎলায় সংশোধনের উপায়, দেয় সঠিক পথের সন্ধান। সত্যে পৌঁছারও প্রথম শর্ত জিজ্ঞাসা, জানার কৌতূহল আর জানতে চাওয়া। নাম ভুলে গেছি কে একজন মনীষী বলেছেন : If you want happiness, believe, if you want truth, search. অর্থাৎ যদি মনের সুখে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও তবে সব কিছুকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে নাও আর যদি পেতে চাও সত্যকে তবে খোঁজো, সন্ধান করো। সত্য পোষা পাখীর মতো কারো হাতে আপনা থেকে এসে অমনি ধরা দেয় না। অতৃপ্তি আর আত্ম-সমালোচনা তথা আত্মজিজ্ঞাসার পথেই পশ্চিমী সভ্যতা নব নব সত্যের পথে এগিয়ে চলেছে আর আমরা আজো আত্মতৃপ্তির যে তিমিরে সে তিমিরেই আছি ঘুমিয়ে। সত্য মানে জ্ঞান আর জ্ঞানের সন্ধান মেলে জিজ্ঞাসা আর আবিষ্কারের পথে। বিশ্বাস করাটা খুবই সোজা, কারণ তাতে কোন মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে না।

২. ১. ৬৩

জীবনের অন্য দশটা প্রয়োজনীয় বস্তুর মতো সব শিল্প-কর্মও চাহিদা আর সরবরাহের নীতিতেই বাঁধা। নাটকের জন্মও এ ভাবেই হয়েছে। লোক-নাট্যও তার ব্যতিক্রম নয়। লোক মানে সমাজ, অধিকন্তু সব মঞ্চায়িত নাটকই যৌথ উদ্যমের ফল। লোক-নাট্যের উৎপত্তির মূলে কলা শিল্পের দাবীর চেয়ে সামাজিক দাবীই বেশী সক্রিয়। তাই সমাজের বিশেষ আদর্শ, রুচি, শিক্ষা দীক্ষা আর মূল্যবোধ লোক-নাট্যে প্রতিফলিত না হয়ে পারে না।

কবিতা, গল্প, উপন্যাস একক প্রতিভার সৃষ্টি কিন্তু নাটক তা নয়। লোক-নাটক আরো বেশি সমাজ নির্ভর। তাই দেখা যায় লোক-নাট্য দেশে দেশে ভিন্নতর রূপ নিয়েছে এমন কি যুগে যুগেও। এখন সমাজ যে ভাবে বিবর্তিত হয়ে দ্রুত নগর-মুখী হতে চলেছে তাতে লোক-নাট্যের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না।

৭. ১. ৬৩

আকবরের সমসাময়িক সংস্কৃত কবি গোবিন্দ ভট্ট তাঁর পৃষ্ঠপোষক আকবরের প্রতি এত বেশী কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি তাঁর নিজের পৈত্রিক নামটা বদলে আকবরীয় কালীদাস করে নিয়েছিলেন। সেকালে রাজানুগ্রহ যেমন ছিল দরাজ আর সার্বিক, তেমনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশটাও ঘটতো সে তৌলে। তখন দেওয়া নেওয়ায় ফাঁকি ছিল না। দাতা মুঠ ভরে যেমন দিতেন পেতেনও তেমনি বুক ভরে।

১০. ১. ৬৩

মানুষ এখন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে—সমাজে, রাজনীতিতে সর্বত্রই এখন দলের হিড়িক। যুথবদ্ধ হওয়াই যেন যুগের একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্ররাও পড়েছে এর খপ্পরে। নীতি বা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কোন কথা নেই, ভাগ হয়ে যাওয়াটাই যেন বড় কথা। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে মিল থাকলেও এ কারণে মিল

হয় না দুই দলে। প্যাষ্টারনক বলেছেন,—এভাবে দলে দলে ভাগ হয়ে দলানুগত্যে আত্মনিবেদন Mediocrity তথা মাঝারিতারই লক্ষণ। মাঝারিরা ব্যক্তিগত বিচার-শক্তির প্রয়োগ করে না, স্রেফ অনুসরণ। যার এক নাম হয়তো মেষ-ধর্মিতা। দল নয়, একমাত্র ব্যক্তিই সত্যের সন্ধান করে, তাই ধর্মকেন্দ্রিক দলেও ধর্ম বা সত্যের চেয়েও দল বা দলীয় নেতার আনুগত্যই এখন দেখা যায় বেশী করে।

১১· ১· ৬৩

টলষ্টয় বলেছেন: যাঁরা খুব বেশী করে সৌন্দর্য চর্চায় আত্মসমর্পণ করে পরিণামে তারা শুভ আর কল্যাণ থেকে সরে পড়ে দূরে। কারণ তখন সৌন্দর্যটাই সব কিছুর উপর বড় হয়ে উঠে। এমন লোক কাপড়ে দাগ লাগবে ভয়ে আসন্ন দুর্ঘটনা থেকে একটা শিশুকে বাঁচাতেও যাবে না ছুটে আর ক্ষতিকর প্রসাধনেও হয়তো করবে না সে আপত্তি। ভালো মন্দের বিচার ছাড়া যে সৌন্দর্য-চর্চা তারই নাম বিলাসিতা। অতিরিক্ত বিলাসিতা বিনাশের পথ রচনা করেছে এমন নজির ইতিহাসে দেদার।

১২· ১· ৬৩

কে একজন ওকালতীর সংজ্ঞা দিয়েছেন এ বলে, ওকালতী হচ্ছে, "The art of misleading an audience without actually telling a lie,' আর একজন বলেছেন: একটা বিড়ালের জন্য একটা আস্ত গাভী হারানোরই নাম মামলা। কথা দু'টার কথকদের নাম ভুলে গেছি।

জঁা ক্রিস্তপে রোঁলার এ কথাটাও মূল্যবান: "Every honest idea, even when it is mistaken, is sacred and divine.' আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যে যথোপযুক্ত ভাব-চর্চা হচ্ছে কিনা তা ভাববার বিষয়।

অধ্যাপক এড্উইন কঙ্ক্লিন (Edwin Conklin) বলেছেন—

সম্ভবতঃ জীবন কোন একটা আকস্মিক ঘটনারই ফলশ্রুতি, বিবর্তনে অবিশ্বাসীদের এ উক্তির সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় হঠাৎ কোন এক ছাপাখানায় বিস্ফোরণের ফলে একটা অভিধান বেরিয়ে আসার সাথে।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

২০. ২. ৬২

'দিনের পর দিন যদি তোমাকে তুমি যা অনুভব করো তার বিপরীত কথা বলতে হয়, যার প্রতি তোমার কোন শ্রদ্ধা নেই তার সামনে যদি তোমাকে হতে হয় নতমস্তক আর যা তোমার ক্ষতি ছাড়া কোন ফয়দাই আনে না তা নিয়ে যদি হতে হয় উল্লসিত— এমন অবস্থায় তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট না হয়েই পারে না। তোমার স্নায়ুযন্ত্র একটা উপন্যাস নয়, তা তোমার দেহেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ আর তোমার আত্মা বিরাজ করে তোমার দেহাভ্যন্তরে যেমন বিরাজ করে তোমার দন্তরাজি তোমার চোয়ালে। আত্মার প্রতি নির্যাতন চালিয়ে তোমার পক্ষে অক্ষত (অর্থাৎ সুস্থ) থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।' প্যাস্টারনক : ডাক্তার জিভাগো

ডক্টর স্যামুয়েল জনসন এক সান্ধ্য বৈঠকে কি একটা ঠাট্টার কথা বলেছিলেন, শুনে উপস্থিত এক তরুণ অত্যন্ত অসংযতভাবে অট্টহাস্য করে ওঠে; জনসন দ্রুত তরুণটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন : 'স্যার, আমি কি এমন কোন কথা বলেছি যা তুমি বুঝতে পেরেছো ? যদি তাই হয় তা হলে আমি উপস্থিত সবারই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।'

আইরিশ জাতি সম্বন্ধে জনসনের এ উক্তিটি এ কারণে স্মরণীয় যে, এর সঙ্গে আমাদেরও চারিত্রিক মিল আছে— "...The Irish are fair people for they never speak well of one another.' অর্থাৎ আইরিশরা বড্ড নিরপেক্ষ জাত, কারণ তারা কেউ কারো

প্রশংসা করে না। আমরা আরো এক ডিগ্রি সরেস—আমরা তো একে অপরকে দেখতেই পারি না। তার উপর ঈর্ষাও করে থাকি একে অপরকে। এমনকি অকারণেও। একটি সাম্প্রতিক নজির প্রাসঙ্গিক বলেই ১৯৬৭-এর ঘটনা ১৯৬৩-তে লেখা রোজনামচার সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি। ১৯৬৭-৬৮র আদমজী সাহিত্য পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার পর ঢাকার কোন এক পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আমার সাহিত্য কর্মের অনুরাগী এক তরুণ অধ্যাপক আমার সম্বন্ধে কিছুটা প্রশংসাসূচক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর কোন কোন মহলে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার আভাস দেখতে পাওয়া যায় উক্ত প্রবন্ধ লেখকের চিঠির একটি পঙক্তি থেকে। "..কর্তৃপক্ষ লেখা দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিল এবং আপনার সম্পর্কেই একটা লেখা দেবার জন্য বলেছিল। তাই ওটা লিখি। কিন্তু দেখলাম অনেকেই বাড়ী বয়ে এসে প্রতিবাদ করে গেল। তাতে আপত্তি নেই—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তারা ঈর্ষাবশত এ কাজটি করছে। এখন দেখছি, আপনার মতো লোকেরও শত্রু এ পোড়া দেশে আছে।" ২৯. ৫. ৬৭।

জনসনের আরো কয়টি কথা স্মরণ করা যেতে পারে এখানে। সবাই জানেন, বসওয়েল শুধু জনসনের এক অদ্বিতীয় জীবনীকার নন, তিনি একাধারে নিত্য-সঙ্গী সেবক আর সহচরও ছিলেন জনসনের। একবার তিনি জনসনকে বল্লেন—গত রাতে আপনার সঙ্গে যে মদটা খেয়েছি তাতে আমার বড্ড মাথা ধরেছে।

জনসন বলে উঠলেন: না স্যার, ওটা মদের দোষ নয়, আমি যে তার সঙ্গে কিছুটা সুবুদ্ধি (Sense) মিশিয়ে দিয়েছি ওটা তারই ফল।

বসওয়েল: স্যার, সুবুদ্ধিতে কি মাথা ধরে?

মৃদু হেসে জনসন বল্লেন: হাঁ, আলবৎ ধরে। যার মস্তিষ্ক তাতে অভ্যস্ত নয় তার ধরে বৈ কি!

মদ খেয়ে মাতাল হওয়া সম্বন্ধে জনসনের মন্তব্য হচ্ছে : মদ খেয়ে পশু হয়ে যেতে পারলে মানুষ হওয়ার দুঃখ থেকে সহজেই রেহাই মেলে।

ফরাসীদের সম্বন্ধে জনসনের মন্তব্য হচ্ছে : They have few sentiments but they express them neatly. ফরাসীদের আবেগ কম বটে কিন্তু যেটুকু আছে তা প্রকাশ করে অতি প্রাঞ্জল ভাষায়।

ফরাসী ভাষার একটি বড় গুণ নাকি স্বচ্ছতা, তাই বলা হয় : What is not clear is not French. ফরাসী সংস্কৃতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে : It is a culture giving priority to language and to literary polish! নতুন চিন্তা আর নতুন ভাবের এত কদর ফ্রান্সে ছাড়া আর কোথাও নেই, আর ফ্রান্স মানে তো প্যারী। প্যারী সম্বন্ধে য়ুরোপীয়দের ধারণা Paris is the best loved city in the world. পৃথিবীর প্রিয়তম নগরী প্যারী। Tom Appliton নামক এক আমেরিকান ত এমন কথাও বলেছেন : Good Americans, when they die, go to Paris. আর য়ুরোপে ত প্রবাদই আছে : When Paris sneezes, Europe catches cold. প্যারী একটু হাঁচি দিলেই সারা য়ুরোপে সর্দি লেগে যায়। প্যারীর এমন প্রভাব। বলা বাহুল্য এ প্রভাব সভ্যতা সংস্কৃতি আর মুক্ত জীবনেরই দল। কিপলিং লিখেছেন : যে মানুষ মাত্রকেই ভালোবাসে ফ্রান্স তার প্রিয়। ভিতর বা বাইরের যে কোন শত্রুর আক্রমণে ফ্রান্স যদি বিপন্ন হয় তা হলে সে বিপদ সভ্যতার বিপদ, শুধুমাত্র ফ্রান্সের নয়। ফ্রান্স হচ্ছে স্বাধীনতা, যুক্তি আর মানবতার প্রতিভূ।

য়ুরোপে, বিশেষ করে আমেরিকায় কাকেও যদি বলা হয়—দ্বিতীয় একটি স্বদেশ বেছে নাও। তা হলে বিনা দ্বিধায় সে ফ্রান্সকেই নেবে বেছে। ফ্রান্সের জন্য এটি কম গৌরবের কথা নয়।

৩.৩.৬৩

কয়েকটি রবীন্দ্র উক্তি :

আজকাল চারিদিকে সকলে Modern বা আধুনিক হইবার জন্য উদগ্রীব। এই আধুনিকত্বের অর্থ হইতেছে য়ুরোপীয়দের বহিরাবয়বের অনুকরণ, তাহাদের প্রকৃতিগত চারিত্রিক-নীতির অনুশীলন নহে।

ধর্মের দিকে যখন সত্যকার টান না থাকে তখন ধর্মটাও বংশ, মান, টাকাকড়ির মতোই অহংকার করবার সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতিভার অন্যতম লক্ষণ—গ্রহণ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা।

০ ০ ০

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই, ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার পরে ভারী রাগ করে হাতি দেয় নাই বলে।
বহু সাধনায় যার কাছে পায় কালো বেড়ালের ছানা,
লোকে তারে বলে নয়নের জলে, দাতা বটে ষোল আনা!

৩.৪.৬৩

বৃটিশ শ্রমিক দলের অন্যতম নেতা বিভান (Aneurin Bevan) ছিলেন নিরীশ্বরবাদী কিন্তু মানবতায় বিশ্বাসী, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Humanist। অন্নদাশংকর রায় হিউমেনিজমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে : 'হিউমেনিজম কথাটির পিছনে পাঁচ শো বছরের ইতিহাস রয়েছে। আগেকার দিনে ভাবুকরা ডিভাইনকে কেন্দ্র করে ঘুরতেন। তার বদলে যারা হিউমনকে কেন্দ্র করেন, গির্জায় না গিয়ে ল্যাবরেটারিতে বা লাইব্রেরীতে যান, টেলিস্কোপ বা মাইক্রস্কোপ বানান, থিওলজির পরিবর্তে ফিলসফি চর্চা করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলসফির চেয়ার প্রতিষ্ঠা করেন, মানুষের প্রকৃত অধ্যয়নের বিষয় যে মানুষ এই মন্তব্য প্রচার করেন ও মানব নিয়তির ধ্যানে বিভোর থাকেন, তাঁরাই হিউমেনিষ্ট ও তাঁদের মতবাদই হিউমেনিজম্। মতবাদ না বলে জীবনবেদ বলা

যেতে পারে।" বিভান ছিলেন তেমন এক হিউমেনিষ্ট্। মৃত্যুর পর আমাদের যেমন জানাজা তেমনি খ্রীষ্টানদের গির্জায় প্রার্থনা, খ্রীষ্টীয় পরিভাষায় যাকে Service বলা হয় তা নিবেদনের নিয়ম আছে। বিলাতে খ্যাতিমানদের জন্য এ করা হয় সাধারণতঃ লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে (West Minister Abbey)। আর এর প্রধান অঙ্গ বাইবেল বচন পাঠ আমাদের জানাজায় যেমন কোরাণের আয়াৎ আবৃত্তি।

গোঁড়া খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিভংগির দিক থেকে নিরীশ্বরবাদী বিভানের জন্য এধরনের প্রার্থনার প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু বিভানের বন্ধু বিশপ ডক্টর মেরভিন ষ্টকউড্ (Dr. Mervyn Stockwood) বন্ধুর জন্য এ শেষ কৃত্যটুকু না করে যেন শান্তি পাচ্ছিলেন না। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এভিতে তাঁর উদ্যোগে আয়োজিত Service প্রার্থনার শুরুতে বিশপ ওয়েষ্টউড বন্ধুর জন্য কিছুমাত্র মনকে চোখ ঠারানো কথা না বলে, স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন, 'বিভান নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, বিশ্বাস করতেন না ঈশ্বর কিম্বা পরকালে, স্রেফ বিশ্বাস করতেন মানবতায়। এমন মানুষের জন্য শেষ প্রার্থনায় বাইবেল বচন পাঠ স্রেফ পরিহাস আর পাঠকের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনারই সামিল। তাই ষ্টকউড তা করলেন না, তার পরিবর্তে বিভানের স্বরচিত গ্রন্থ 'In Place of Fear' থেকেই কিছুটা অংশ পাঠ করে শোনালেন শ্রোতাদের। পরে যোগ করলেন বিভান বাগাড়ম্বর আর আত্মপ্রতারণাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন, তিনি যা নন্ আমি যদি আজ তাঁকে তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতাম তাতে তিনি মোটেই খুশী হতেন না। ইংলণ্ডীয় গির্জার বিশপের তাঁর সম্বন্ধে সপ্রশংস উচ্ছ্বাস বাণীতেও তাঁর মনে কিছুমাত্র সাড়া জাগাত বলে মনে হয় না কিন্তু বন্ধুদের তাঁর অবদান স্বীকৃতির মূল্য তিনি দিতেনই। আমার মতো যিনি ঈশ্বর আর পরকালে বিশ্বাস করে তেমন বন্ধুর মতামত আর বিশ্বাসকেও তিনি নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করতেন।'

বিভানের জীবন ছিল সব রকম গোঁড়ামি আর গতানুগতিক বিশ্বাসের এক মূর্ত প্রতিবাদ—মৃত্যুতেও যেন তিনি সে প্রতিবাদের স্বাক্ষরই রেখে গেলেন। পেশাদার ধর্মযাজক আর পাদ্রী হলেও বিশপ ষ্টক্‌উডের উদারতা আর বিপরীত মতের প্রতি শ্রদ্ধাও কিছুমাত্র কম প্রশংসনীয় নয়। মনে হয় পরমত সহিষ্ণুতা য়ুরোপীয় সভ্যতার একটি বড় লক্ষণ আর তার সবলতারও এক প্রথম উৎস।

৫.৫.৬৩

একবার এক ব্যক্তি এরিষ্টোটলকে বল্লে: অমুক লোকটা আপনার খুব নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। শুনে এরিষ্টোটল বল্লেন: বেশ। ওকে গিয়ে বলো যতক্ষণ আমি অনুপস্থিত থাকি ততক্ষণ আমার উপর ও যেন খুব কষে চাবুক চালাতে থাকে।

নোবেল প্রাইজ প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর আলফ্রেড নোবেল বলেছেন: I would like to help dreamers, for they find it hard to get on in life. কবি-শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক এঁরাই স্বপ্ন-দ্রষ্টা। সভ্যতা মানে এঁদের স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন। অথচ দুঃখ আর অভাব অনটনেই কাটে এদের জীবন। নোবেল প্রাইজ সে দুঃখ লাঘবেরই এক মহৎ প্রচেষ্টা। আলফ্রেড নোবেল ছাড়া বিশ্বের স্বাপ্নিকদের জন্য অত বড় দান আর কেউ রেখে যাননি।

শিল্পে কিছু অলঙ্করণ-অতিরঞ্জন অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে অদ্বিতীয় কথাশিল্পী মোপাসাঁর মন্তব্য: The artist has the liberty to exaggerate, to create in his novel a world more beautiful, more simple, more consoling than ours.' এ কারণেই বলা হয় শিল্প জীবনের চেয়ে বড় 'larger than life.' হুবহু জীবন-চিত্রণ শিল্প নয়—জীবনের চেয়ে বড় করে সৃষ্টি করাতেই শিল্পের সার্থকতা। তেমন শিল্পই নিয়ে আসে মহত্তর জীবনের প্রতিভাস।

স্রেফ আর্থিক ক্ষেত্রে উৎপাদন বা সম্পদ কোন দেশেরই সঠিক উন্নয়নের কারণ হতে পারে না—যদি না তা সমগ্র দেশের সার্বিক জীবনে সঞ্চারিত হয়ে প্রতিটি মানুষের বিকাশের পথ খুলে দেয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধেও তা বলা যায়—পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে অর্থাৎ তার গতিধারার সঙ্গে মিল রেখে চলার কোন সংকল্প যদি রাষ্ট্রনীতিতে প্রতিফলিত না হয় তা হলে তেমন স্বাধীনতাও একটা বদ্ধ জলাসয়ে পরিণত হতে পারে অচিরে। আরব দেশগুলোর দিকে তাকালে এ সত্য সহজেই বুঝতে পারা যায়। তৈল-সমৃদ্ধ ঐ দেশগুলোর আর্থিক সম্পদের কিছুমাত্র অভাব নেই, তাদের স্বাধীনতার আয়ুও কম দীর্ঘ নয়। এ প্রসঙ্গে ইরান-আফগানিস্থানের কথাও ভাবা যায়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যা আর তার সার্বজনীন জ্ঞানসাধনা থেকে এরা বিচ্ছিন্ন—অন্ততঃ তাদের তেমন কোন উল্লখযোগ্য অংশ বা অবদান নেই এতে। ফলে এরা পিছিয়ে আছে সব দিকে—আধুনিক বিশ্বে পিছিয়ে পড়া মানে দুর্বল হয়ে থাকা। নিজের সভ্যতা আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে অত্যধিক অহঙ্কার-বোধও মারাত্মক—এতে বৃদ্ধি পায় কূপমণ্ডুকতা, নিজের খোলস ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার কোন সংকল্পই তখন মনে দানা বাঁধতে পারে না কিছুতেই। মনে হয় মধ্যপ্রাচ্য এ রোগেই ভুগছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: 'পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে। জাতিগত বিদ্যা-স্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আর নাই। আজ বিদ্যা-সমবায়ের যুগ আসিয়াছে, সেই সমবায়ে যে-বিদ্যা যোগ দিবে না, যে-বিদ্যা কৌলিন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফলা হইয়া মরিবে।' আরব সভ্যতা যা বুঝায় তা আজ এ নিষ্ফলতার চোরাবালিতেই আটকা।

১০. ৫. ৬৩

'Be not wiser than you should, but be soberly wise.' Bible

জ্ঞানের সঙ্গে সুবিবেচনার মিল না হলে তা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

An unsatisfied woman requires luxury, but a woman, who is in love with a man will live on a bread. অতৃপ্ত মেয়েরাই বিলাসিতার কাঙাল, যে ভালোবাসে সে এক রুটিতেই খুশী। কথাটা সত্য কিন্তু কার উক্তি ভুলে গেছি।

. . . . .

Be independent of opinions of the others—'

. . . . .

বলেছেন আইনষ্টাইন। নিজের মতামতের উপর নিজের প্রত্যয় না থাকলে শিল্প সাহিত্যে কেন, দৈনন্দিন কাজেও সাফল্য অসম্ভব। যে লেখকের মন অন্যের কথায় বেতস পাতার মতো দুলতে থাকে সাহিত্যে তার নিজের কণ্ঠস্বর কখনো শোনা যাবে না।

. . . . .

একটি লোককে শিক্ষা দেওয়া মানে একটা ব্যক্তিকে শিক্ষিত আর একটি মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া মানে একটা গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা। (আরবী প্রবাদ)

. . . . .

No good novel will ever proceed from a superficial mind (Henry James) তুলনীয় : বাংলা সাহিত্যে স্রেফ রম্যরচনায় যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের কেউই আজো কোন ভালো উপন্যাস লিখতে পারেন নি।

. . . . .

কে একজন বলেছেন, 'He who thinks reasonably must think morally. যে যুক্তির সাথে চিন্তা করে তার চিন্তা কখনো নীতি-ধর্মের বিরোধী হতে পারে না অর্থাৎ যে যুক্তিবাদী সে নীতিবাদীও।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কথার সঙ্গে আমার মনের সায় আছে। তাই পড়বার সময় তাঁর রচনা থেকে অনেক কথাই আমার নোট বইতে টুকে রেখেছি। সেখান থেকে তাঁর আরো কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত হলো যা আমাদের জীবনেও প্রযোজ্য: "লোকে মনে করে ধর্মের কথা কানে উঠলেই যেন একটা পুণ্য আছে ·····। এ জন্যে ধর্ম বক্তা সম্বন্ধে তার যোগ্যতা বিচার হয় না। আমার ত মনে হয় এ নিতান্ত অন্যায়।.....যাদের ধর্মবোধ আর সাহিত্যবোধ কিছু আছে তারা যে ভাবহীন রসহীন অনর্গল পুরোনো বাজে কথা কি রকম করে সহ্য করে আমি ত ভেবে পাইনে। নিয়মিত বেসুরো গান শোনা যেমন মানুষের পক্ষে অশিক্ষা, নিয়মিত অনুপযুক্ত ধর্ম বক্তৃতা শোনাও মানুষের পক্ষে তেমনি একটা ক্ষতিজনক কাজ।"

আমাদের মিলাদ মহফিল আর ওয়াজ নছিহতের মজলিসের বক্তৃতাগুলির কথা স্মরণ করলেই এ কথাগুলির মর্ম সহজেই বুঝতে পারা যাবে। ঐ সব বক্তৃতায় দিনের পর দিন সারা বছর ধরে এক কথারই কি জাবর কাটা হয় না? শ্রোতারা ঐ সব শুনে কিছু মাত্র উপকৃত হয়েছেন আজো শুনিনি। বরং দেখেছি শুনতে শুনতে অনেকের হাই ওঠে, অনেকে আশু সমাপ্তির আশায় হয়ে থাকে অধীর। মানসিক ক্ষতিটা সহজে নজরে পড়েনা বলে ঐ সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই আমাদের অভ্যাস।

আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মুক্ত-বুদ্ধি মানুষ আজো জন্মান নি। তাই আমরা যারা নিজেদের বুদ্ধিকে কিছুটা মুক্ত রাখতে চাই, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সহজেই প্রিয় হয়ে পড়েন।

১৫. ৬. ৬৩

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন দুর্যোগের দিনে বিশ্বের ক'জন সেরা কবি-শিল্প-সাহিত্যিক মিলে মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করে যে ইস্তাহার

প্রকাশ করেছিলেন তা ছিল রোমাঁরোলার রচনা—অন্যান্যদের সাথে তাতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর ছিল। সে ইস্তাহারের কয়েকটি কথা ঃ

মানবাত্মা কারো নৌকর নয়। আমাদের অন্য কোন প্রভু নেই। আমরা শুধু সত্যের সেবক—যে সত্য মুক্ত, স্বাধীন, যার কোন সীমান্ত বা সীমা নেই। জাত-ধর্মেরও নেই যার কোন সংস্কার। আমরা মানবতার স্বপক্ষেই কাজ করে যাবো—অখণ্ড আর সার্বিক মানবতার। আমরা জাতি মানি না—মানুষকেই শুধু মানি, যে মানুষ এক আর সার্বজনীন।

• • • • •

The rich always fear the poor, and they have good reason for their instinctive dread (মোপাসাঁ)। অর্থাৎ ধনীরা সব সময় গরীবদের ভয় করে থাকে। তাদের এ সহজাত ভীতি একেবারে অকারণ নয়। মানব চরিত্রে বিশেষজ্ঞ মোপাসাঁর এ কথাটায় যথেষ্ট সত্য রয়েছে। বহু মানুষের সম্পদ এক হাতে জমা না হলে কেউ ধনী হতে পারে না। তাই ধনকে সাম্যবাদী পরিভাষায় চোরাই মাল বলে অভিহিত করা হয়। চোরেরা সব সময় ভয়ে ভয়েই থাকে আর সে ভয় সহজাত।

• • • • •

রবীন্দ্রনাথ Capitalism এর বাংলা করেছেন 'পেটুক সভ্যতা' বলে। শুধু নিজেরটুকু খেয়ে কখনো পেটুকের পেট ভরে না—অন্যের ভাগটুকুও তার চাই। সেটুকু হারাবার বা পাছে যার ভাগ সে এসে ওটা কেড়ে নেয় এ ভয় পেটুকের মনে সব সময় বিরাজ করে। অপরের হক গজব করার ভয়ের চেয়ে বড় ভয় আর নেই। ধনীর ভয়ও এ জাতীয়।

১৬. ৬. ৬৩

উইলিয়াম ক্যরির মটো ছিল ঃ Expect great things from God. Attempt great things for God. আল্লার কাছ থেকে

মহৎ কিছু কামনা করো আর চেষ্টা করো আল্লার জন্য মহৎ করার। নিরলস ও নির্লোভ বিদেশী এ পাদ্রীটি জীবনে অনেক মহৎ কাজই করে গেছেন, বিশেষ করে বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

• • • • •

চার্চিলকে নাকি একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: কোন তরুণ যদি রাজনীতিবিদ হতে চায় তার কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন?

উত্তরে চার্চিল বলেছিলেন: আগামীকাল কিম্বা আগামী সপ্তাহে কিম্বা আগামী মাসে অথবা আগামী বছরে কি ঘটতে যাচ্ছে তা আগাম বলতে পারার দক্ষতা আর যদি তা না ঘটে, কেন ঘটেনি তার ব্যাখ্যা দেওয়ার যোগ্যতা তার থাকা চাই। অর্থাৎ এ গুণ যার আছে তারই রাজনীতিতে আসা উচিত।

চার্চিল নাকি এক একটা বক্তৃতা দশ বারো বার করে কাটছাঁট করতেন। এমনকি অপ্রধান বক্তৃতা তৈরীর জন্যও নাকি তিনি দু'দিন সময় নিতেন আর শব্দের রদবদল করতেন বার বার। তৈরী হয়ে গেলে অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শুনতেন কেমন শোনাচ্ছে তা নিজের কানে যাচাই করে দেখার জন্য। চার্চিলের বক্তৃতার ভাষা যে নিখুঁত আর পুরোপুরি সাহিত্যধর্মী ছিল তার মূল কারণ বোধ করি এটি।

২১.৪.৬৩

এমার্সনের 'প্রবন্ধ সংকলন' পড়ছিলাম। ১৮৩৭ এর ৩১ শে আগষ্ট, কেম্ব্রিজে তিনি The American Scholar নামে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার এক জায়গায় বলেছেন: কথিত আছে সূচনার যুগে ঈশ্বর এক মানুষকেই বহু মানুষে ভাগ করে দিয়েছেন একারণে যে তা হলে মানুষ নিজেকে আরো বেশী সফল করে তুলতে পারবে যেমন অধিকতর কার্যক্ষম হওয়ার জন্য তিনি হাতকে করেছেন আঙ্গুলে বিভক্ত। এ এক পুরা কাহিনী হলেও এতে এক মহৎ সত্য পেয়েছে রূপ। অর্থাৎ আসলে এক মানুষই বিশেষ বিশেষ মানুষে বিরাজ

করে স্রেফ আংশিকভাবেই। অথবা একটা শক্তিরই বিকাশ দেখা যায় কোন এক বিশেষ ব্যক্তিতে। গোটা মানুষকে জানতে হলে গোটা সমাজকেই জানতে হয়। আনতে হয় সমস্ত সমাজকে বিচারের আওতায়। মানুষ পুরোহিত, পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ, উৎপাদক আর সৈনিকে বিভক্ত অবস্থায় অর্থাৎ সামাজিক স্তরে এ সব কাজ ব্যক্তি বিশেষে ন্যস্ত বটে কিন্তু প্রত্যেকেই পালন করে এক যৌথ দায়িত্ব আর করে যার যা কর্তব্য। অতএব নিজেকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হলে সময় সময় মানুষকে নিজ শ্রম থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে সব শ্রমিকের শ্রমকেও আলিঙ্গন করা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ মৌল উপাদান, সব শক্তির এ উৎস, আজ এত অজস্র খণ্ডে বিভক্ত, এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে তা প্রায় বিন্দুতে পরিণত। তাই একে সম্মিলিত করা এক রকম দুঃসাধ্য বল্লেই চলে। সমাজের অবস্থা আজ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে মনে হয় মূল কাণ্ড থেকে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেই যেন ছেটে ফেলা হয়েছে। সব যেন চলন্ত বিভীষিকা হয়েই হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ যেন আজ স্রেফ একটা আঙ্গুল, একটা গর্দান, একটা উদর বা একটা বাহু মাত্রে পরিণত। পূর্ণাঙ্গ মানুষ নয় একজনও। এভাবে মানুষ রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে বস্তুতে, বহুতর দ্রব্যে। যে চাষীটাও আদতে মানুষ মাত্র তাকে যখন খাদ্য সংগ্রহের জন্য মাঠে পাঠানো হয় তখন সে তার পেশার সত্যকার মর্যাদা সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত বোধ করে না। সের মণ দাঁড়ি পাল্লার বেশী আর কিছুই দেখেনা সে চোখের সামনে, ক্ষেত খামারেও সে যে একজন আস্ত মানুষ এ বোধ হারিয়ে সে হয়ে পড়ে স্রেফ এক চাষী। ব্যবসায়ীও কিছুমাত্র আদর্শের ছোঁওয়া লাগায় না তার কাজে, তার কাঁধের উপর সওয়ার হয়ে বসে তার রুটিন বাঁধা কাজের জোয়াল আর টাকা আনা পাই পয়সা হয়ে পড়ে তার আত্মার প্রভু। আজ পুরোহিত স্রেফ অনুষ্ঠানে, উকিল আইন

বইতে, কারিগর যন্ত্রে আর নাবিক জাহাজের রজ্জুতে পরিণত।

এ রকম কর্ম বিভক্ত সমাজে মননশীল ক্রিয়া কর্মের দায়িত্ব পণ্ডিতের। সত্যকার অবস্থায় তিনি চিন্তাশীল মানুষ। কিন্তু সমাজ যদি পতিত হয় আর তিনি যদি হন তার শিকার, তখন তিনিও হয়ে পড়েন স্রেফ চিন্তাবিদ অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় নেমে গিয়ে তিনি হয়ে দাঁড়ান অন্যের চিন্তার এক তোতাপাখী মাত্র। আজকে আমাদের সমাজের দশাও বোধ করি এর চেয়ে উন্নত নয়। তাই কথাগুলি স্মরণীয়।

২২. ৪. ৬৩

অন্য এক কলেজের (Dartmouth College) বিদায়ী ছাত্রদের সম্বোধন করেও এমার্সন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে বক্তৃতাও স্মরণীয়। তার কয়েকটি কথা এখানে উধৃত হলো:

"...তোমরা এখন কলেজের চৌকাঠ পেরিয়ে দেশের সরকারী কি বেসরকারী কাজে অর্থাৎ তোমাদের নিজ নিজ পেশায় প্রবেশ করতে যাচ্ছো। মনন বা মনীষার দায়িত্ব সম্বন্ধে এ সময় কিছু কথা বল্লে আশা করি তা বেমানান হবে না। কারণ তোমাদের নতুন সঙ্গী-সাথীদের মুখ থেকে এমন কথা তোমরা কচিৎ শুনতে পাবে। বরং প্রতিদিন শুনতে পাবে হিসেবী বলে হিসেবী হয়ে চলার কথাই। শুনবে তোমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে: পয়সা আর জমির মালিক হওয়া, পদ আর খ্যাতি অর্জন করা। অনেকে ঠাট্টা করে বলবে: রেখে দাও সত্য আর সৌন্দর্যের কথা। কেন বে-ফায়দা খুঁজতে যাবে ঐ সব?

এ অবস্থায় তোমাদের কেউ যদি সত্য আর সৌন্দর্যের সন্ধান করতে চাও তা হলে তাকে হতে হবে দুঃসাহসী, একনিষ্ঠ আর সত্যশীল।

আবার তোমাদের কেউ যদি বলো: 'ঠিক আছে, অন্যেরা যা করে আমিও তাই করবো, কিছুটা দুঃখের সাথে হলেও আমিও এবার

বিসর্জন দেবো আমার প্রথম জীবনের সব সাধ-স্বপ্ন। আমিও ভালো খাওয়া-দাওয়া চাই বই কি। সুযোগ-সুবিধার সুদিন করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার সব লেখাপড়া আর স্বাপ্নিক প্রত্যাশা আপাতত মুলতুবিই থাক!' তা হলে তোমার ভিতর যে মানুষটা আছে তার মৃত্যু অবধারিত। এর ফলে শুকিয়ে মরবে তোমার মনের ভিতরকার শিল্পকলা কবিতা আর বিজ্ঞানের কুঁড়ি যেমন মরেছে আরো হাজার হাজার মানুষের জীবনে। জীবনের পথ নির্বাচনে এটিই সংকট-মুহূর্ত—এ সময় মননশীলতার প্রতি সুদৃঢ়ভাবে অনুগত থাকাই তোমার কর্তব্য। ইন্দ্রিয় জগতের এ সব প্রবল প্রলোভন আকর্ষণ জয় করার জন্য চাই একনিষ্ঠ বিজ্ঞান-সাধকের দল।...ক্ষুদ্র আলোটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করো তাহলেই নিজস্ব করে নিতে পারবে ওটাকে। সন্ধান করো, সন্ধান করো। অবিরাম সন্ধানের পথ থেকে তিরস্কারে কিম্বা তোষামোদে হয়োনা কখনো বিচ্যুত। কোন মত-বিশ্বাসেই গোঁড়ামির দিয়ো না পরিচয় আর হয়োনা অন্যের গোঁড়ামির শিকার। অকালে আরাম-আয়েসের এক-খণ্ড ভূমি কিম্বা বাড়ী একটা শস্য-গোলার জন্য কেন তুমি তারকা-খচিত সত্যের মরুভূর মালিকানা ত্যাগ করবে? বলা বাহুল্য সত্যেরও ছাদ আছে, আছে বিছানা আর খোরাক। নিজেকে বিশ্বের জন্য অত্যাবশ্যক করে তোল, মানবজাতিই জোগাবে তোমার খাদ্য যদিও মৌজুদ ভাণ্ডারের মালিক হয়তো হতে পারবে না তুমি কখনো। তথাপি তুমি বঞ্চিত হবে না মানুষের স্নেহ, শিল্প-কলা, প্রাকৃতিক আর আশার সম্পদ থেকে।"

২৫.৪.৬৩

ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস (Frank Harris) বলেছেন: 'মানবচিন্তার অগ্রগতিই আমার কাছে ঈশ্বরের একমাত্র অবতীর্ণ বাণী (Revela-

tion)। হ্যারিসের এ কথা শুনে মার্কস্ নাকি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেঃ অদ্ভুত। চমৎকার! (Wonderful! Excellent!)

এ হ্যারিসই সত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ 'হেইনে (Heine) যেমন এ বলে অহঙ্কার করতেন যে তিনি সারাজীবনই পবিত্রাত্মা সত্যেরই সৈনিক তেমনি আমিও সব সময় সত্যকেই ভালোবেসেছি, ভালোবেসেছি তার সহোদরা শুভ আর সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক বেশী—যদিও সত্য ক্ষীণাঙ্গী আর কম আকর্ষণীয়া। তার মুখবয়ব মোটেও পুষ্পপেলব নয় আর তা মণ্ডলাকার কিন্তু চোখ দু'টি তার অদ্ভুত সুন্দর আর সব আবেগ যেন তাতেই সংহত। তার চুম্বন যেন আন্তরিকতার এক পবিত্র উৎসর্গ। সত্যের নেই কোন ভয়-ভীতি কিম্বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব—তার সেবা অন্তরে যে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে তার মূল্য তার বোনেরা (অর্থাৎ শুভ আর সৌন্দর্য) যা দিতে পারে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। সত্যের যে প্রিয় তাকে সৈনিক হতে হয়, যে সৈনিক সব অব্যবস্থাকে করে ঘৃণা। তার পথ সব সময় সোজা, অগ্রশীল আর ঊর্ধ্বগামী—এ দুর্গম পথে সে হয়তো হারিয়ে বসে সব সঙ্গীসাথী আর বন্ধু-বান্ধব, এমন কি নিজের প্রিয়জনও হয়তো তাকে যায় ছেড়ে এবং বঞ্চিত হয় সে জীবনের মধুর সঙ্গ থেকেও। সারাজীবনই হয়তো তাকে করতে হয় সংগ্রাম, পায় না সে একটুও বিশ্রামের সুযোগ। সব সময় এক মহৎ সংগ্রামের পুরোভাগে সে থাকে এ সগর্ব চেতনা ছাড়া সারাজীবন দেখে না কোন পুরস্কার কি আরামের মুখ আর নির্ঘাত আজ কি কাল একদিন তাকে দিতেই হবে তার এ সত্য নিষ্ঠার খেসারত। নিঃসন্দেহে কর্মক্ষেত্রেই বরণ করতে হবে তাকে মৃত্যু, অজ্ঞাতে, অপ্রশংসিত অবস্থায় আঘাতের ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ক্ষরণ করতে করতেই।'

২৬. ৪. ৬৩

"বার্ণাড্ শ' তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী, যুক্তি আর তর্কবিতর্কেই তাঁর অসীম আনন্দ। কিন্তু কোন কিছুর গভীরে প্রবেশ ঘটে নি তাঁর কখনো। ফলে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিকর্মে তিনি ক্বচিৎ পৌঁছেছেন। Vauvenargues বলেছেন 'সব মহৎ ভাবের উৎস হৃদয়।' শ'র সব চিন্তার উৎস কিন্তু মস্তিষ্ক।"

শ'র সাহিত্য বিচারে হ্যারিসের এ মন্তব্য মনে হয় একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

২০. ৫. ৬৩

জর্জ অরওয়েলের (George Orwell) মতে বিজ্ঞাপন মানে মিথ্যার সুড়সুড়ি দিয়ে বোকাদের পকেট থেকে টাকা বের করে নেওয়া।

আর পুঁজিবাদ আজ তক্ যতসব ফন্দি-ফিকির বের করেছে তার কুৎসিততম (dirtiest) হচ্ছে বিজ্ঞাপন।

উইলিয়াম মরিস বলেছেন : আজকের রুগ্ন শিল্পকলা যদি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে চায় তা হলে তাকে জনগণের শিল্প হতে হবে, যা হবে জনসাধারণের দ্বারা জনসাধারণের জন্যই। সবকে যেমন তার বুঝতে হবে তেমনি তারও হতে হবে সবারই বোধগম্য।'

এ প্রসঙ্গে ডোবার উইলসন (Dover Wilson), এর কথাগুলিও স্মরণীয় : সংস্কৃতির অন্য একটি রূপও আছে যার উৎপত্তি সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবন থেকেই। এ সংস্কৃতি মানে মানবাত্মা রূপী অতি সাধারণ মৃত্তিকারই কর্ষণা, যা মানুষের সব রকম হাতের কাজকে দান করে মর্যাদা আর যে শ্রমের দ্বারা মানুষ জীবিকা অর্জন করে তাকে করে তোলে অর্থপূর্ণ আর সুন্দর।"

২৫. ৫. ৬৩

আমরা যে বলে থাকি আমাদের প্রতি ইংরেজের বিরূপ মনোভাবের জন্যই আমরা হিন্দুদের সমতালে পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে এগিয়ে

যেতে পারিনি আর এ কারণেই সাহিত্যেও আমরা হতে পারিনি অগ্রসর। মনে হয় একথটায় কিছু গলদ আছে—এ সম্পর্কে নতুন করে ভেবে দেখা প্রয়োজন। ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা আর আনুকূল্যে কোন কোন হিন্দু যে বিত্তশালী হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস হিন্দুর হাতে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে অনেকখানি স্বাধীনভাবে, বরং ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব আর সে আবহাওয়ায়। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেউই ইংরেজের বশংবদ ছিলেন না। এঁরা কেউই ইংরেজের মুখের দিকে চেয়ে করেন নি সাহিত্য রচনা। এ প্রসঙ্গে এও বিবেচ্য, মুসলমানের প্রতি ইংরেজের প্রতিকূলতা তিরোহিত হয়ে যখন পরিণত হয়েছে কিছুটা অনুকূল্যে তখনো সাহিত্য-শিল্পে মুসলমানের উল্লেখযোগ্য অবদান দেখতে পাওয়া যায় না কেন? আর যে সব দেশে ইংরেজ কর্তৃত্ব ছিল না বা নেই সে সব মুসলমান দেশেও সাহিত্য শিল্পের তেমন সমৃদ্ধি ঘটেনি কেন? আফগানিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি, এমন কি তুরস্কের কথাও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। এও জিজ্ঞাসা করা যায়, স্বাধীনতার পরেও পাকিস্তানে স্মরণীয় তেমন সাহিত্য রচিত হয়েছে কি?

রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা শাসকদের আনুকূল্য কিম্বা প্রতিকূলতার সঙ্গে সাহিত্য শিল্পের সমৃদ্ধির তেমন সাক্ষাৎ যোগাযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না। থাকলে পরাধীনতার যুগে পাক-ভারতে অমন সমৃদ্ধ সাহিত্য-শিল্প রচিত হতে পারতো না। বলাবাহুল্য এদেশ কর্তৃক সে যুগেই সর্বপ্রথম বিজিত হয়েছে বিশ্বের সেরা সাহিত্য পুরস্কার।

আমার মনে হয় ধর্মীয় তথ্য শাস্ত্রীয় কঠোরতার ফলে আমাদের মনে যে সামাজিক দৃষ্টিভংগি আর মনোভাবের সৃষ্টি হয় তা সাহিত্য শিল্পের অনুকূল নয়। জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ঠিক শিল্পীর

দৃষ্টি নয়। শাস্ত্রের সুকঠোর বেড়া ডিঙাতে না পারলে সহজ নয় শিল্প-দৃষ্টি আয়ত্ত করা। এযুগে নজরুল ইসলাম তার এক সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত। সাহিত্য শিল্পে মুসলমানের ব্যর্থতার কারণ হিন্দু কিম্বা ইংরেজের প্রতিকূলতার মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না, সে কারণের সন্ধান করতে হবে আমাদের ধর্মীয় আর সামাজিক বিন্যাসেই। এখন আবার সমাজের আসন দখল করেছে রাষ্ট্র, ফলে সাহিত্য শিল্পের ভবিষ্যৎ এখন হয়ে পড়েছে রাষ্ট্রীয় বিন্যাস আর তার স্বরূপের উপরই নির্ভরশীল। রাষ্ট্র সমাজের আসন দখল করায় সাহিত্যিক শিল্পীদের বিপদ বেড়ে গেছে অনেক খানি। বোহেমিয়ান শিল্পী সহজেই সামাজিক শাস্তি অগ্রাহ্য করতে পারতো কারণ গোটা সমাজ বা তার উল্লেখযোগ্য অংশকে উত্তেজিত করে তোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু রাষ্ট্র অতি সহজেই শিল্পীকে কাবু করতে পারে, পারে নির্বাক করে দিতে এমন কি কিনে নিয়েও শিল্পের পথ থেকে পারে সরিয়ে দিতে বা সরিয়ে রাখতে। রাষ্ট্র উদার আর সহিষ্ণু না হলে খাঁটি শিল্পীদের অকারণে বিপদে পড়তে হয়, সামান্য একজন ক্ষুদ্র ইনফরমারও ইচ্ছা করলে শিল্পীকে এখন ফেলতে পারে চূড়ান্ত হয়রাণিতে। আগে অবস্থা এমন ছিল না।

শাস্ত্র বা ধর্মের দিক দিয়ে মুসলমানের তুলনায় হিন্দু অনেক বেশী স্বাধীন। ফলে সাহিত্য-শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতাও হিন্দু সমাজে একারণে অনেক বেশী। হিন্দু বহু ধনী ও বিত্তবানের সহায়তায় বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চ, নাটক আর অভিনয়-শিল্প গড়ে উঠেছে। মুসলমান সমাজে তেমন দৃষ্টান্ত বিরল।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেশব সেনের 'সুলভ সমাচার' সংবাদপত্র আর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য মাসিকী 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় আর ঐ একই বছর প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল থিয়েটারও। বাঙালী হিন্দুর নব জীবন চেতনা আর সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে এ তিনের ভূমিকা ছিল

অসাধারণ। হিন্দু পরাধীনতার যুগে যা করেছে আমরা আজ স্বাধীনতার যুগেও তার থেকে কত দূরে !

১০. ৬. ৬৩

"মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা।...কিন্তু সেই মন্ত্রকে যখন মনন ব্যাপার হইতে বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়—মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরমপদ অধিকার করিতে চায় তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কি হইতে পারে ? কতকগুলি বিশেষ শব্দ সমষ্টির মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না, তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে ; তখন চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়া রচিত, তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রু জয় করা ইত্যাদি নানা প্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে।" রবীন্দ্রনাথ

নাম-জপা আর তস্‌বি-টেপা লোকদের পক্ষে কথাগুলি স্মরণীয়।

"আমি বিশ্বাস করি যে, আমার জীবন, আমার মুক্তি, আমার জ্যোতি আমাকে দেওয়া হয়েছে স্রেফ মানুষের মনকে আলোকিত করে তোলার জন্যই। আমি বিশ্বাস করি যে, সত্যের জ্ঞানই মেধা, এ মেধা আমাকে ধার দেওয়া হয়েছে এ উদ্দেশ্যেই : এ মেধাই আগুন যা আত্মসাৎ করা হলেই হয়ে ওঠে শিখা। আমি বিশ্বাস করি যে, আমার অন্তরে যে আলো আছে তার সাহায্যে বাঁচাই আমার জীবনের অর্থ আর সে আলোকে এমন-ভাবে উঁচু করে তুলে ধরাই আমার কাজ যাতে মানুষ তা দেখতে পায়।" টলষ্টয়

এ শপথ বাণীর আলোয় টলষ্টয়ের জীবন আর বিপুল সাহিত্য সম্ভারের দিকে ফিরে তাকালে তার অর্থ বুঝতে আর বেগ পেতে হয় না।

* * * *

"যা মিলায় আর ঐক্যের কারণ হয় তারই নাম ভালো আর যা বিচ্ছেদ ঘটায় তারই নাম মন্দ।"

আলডুস্ হাক্সলী

* * * *

"অন্য সব আবেগ-অনুভূতিকে পুরোপুরি চাপা দিতে পারলেই রাজনৈতিক আগ্রহকেও চাপা দেওয়া সম্ভব—তখন লোকটি যে শুধু অ-রাজনৈতিক হবে তা নয়, হবে নিস্পৃহও, আর পরিপূর্ণ নিস্পৃহতা মানে মৃত্যু, দর্শন আর কবিতার মৃত্যু, কারণ এসবের একমাত্র বিষয়বস্তু আবেগ-অনুভূতি।"

ক্রোচে

* * * *

'ইচ্ছা করলে ফুলদানিটাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারো, করতে পারো চূর্ণ বিচূর্ণ কিন্তু তবুও গোলাপের সৌরভ-টুকু ছড়িয়ে থাকবে তার চারদিকে।"

টমাস ম্যুর

* * * *

"যে সমাজের বুনিয়াদ স্রেফ উৎপাদনের উপর, সে সমাজ উৎপাদনশীল হবে সত্য কিন্তু হবে না সৃষ্টিশীল।"

আলবেয়ার কামু

* * * *

"মামলা করতে যাওয়া মানে একটা বিড়ালের জন্য আস্ত একটা গাভী হারানো।"

চীনা প্রবাদ

বেটা বিয়লাম বৌকে দিলাম
ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম,
আপনি হলাম বাঁদী
পা ছড়িয়ে কাঁদি।

গ্রাম্য ছড়া

* * * *

"আমরা এলাম, কাঁদলাম—এই তো জীবন। আমরা কাঁদলাম, ছেড়ে গেলাম—এই তো মৃত্যু।"

* * * *

"কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে যে থেমে পড়ে তার পক্ষে পথ চলা বা গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।"

আরবী প্রবচন

* * * *

"শিল্পে বিদ্রোহ স্থায়িত্ব আর পূর্ণতা পায় সত্যিকার সৃষ্টিতেই। ভাষ্য কিম্বা সমালোচনায় নয়। বিপ্লবও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে একমাত্র সভ্যতায়, ভয় ভীতি বা নির্যাতনে নয়।"

আলবেয়ার কামু

* * * *

"যা কিছু আরম্ভ করা যায় তা সবই মানুষ নিজের মধ্যে আয়ত্ত করে নিতে পারে। সৃষ্টিতে যা কিছু সংশোধন করা সম্ভব তা সবই মানুষ নিতে পারে সংশোধন করে। সব কিছু করার পরও, এমন কি নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ সমাজেও অন্যায় ভাবে শিশুমৃত্যু থেকে যাবে। এমন কি মানুষ তার সব শক্তি প্রয়োগ করেও বড় জোর সংখ্যানুপাতে পৃথিবীর দুর্ভোগ কিছুটা কমাতে পারে শুধু। কিন্তু অবিচার আর দুর্ভোগ দুনিয়া থেকে নির্মূল হবে না—যত সীমিত ভাবেই হোক,

কিছু না কিছু উপদ্রব থেকে যাবেই। শিল্প আর বিদ্রোহের মৃত্যু ঘটবে সেদিন যেদিন ভূপৃষ্ঠে একটি মানুষও অবশিষ্ট থাকবে না।"

আলবেয়ার কামু

১৫. ৭. ৬

"বিদ্রোহ মানব সত্তার এক অপরিহার্য পরিধি, কিন্তু এ যুগে বিদ্রোহের স্বরূপ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন আর মনিবের বিরুদ্ধে দাসের বা ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের বিদ্রোহ নয়—এখনকার বিদ্রোহ অনেকখানি পরা-বিদ্যক (Metaphysical)। জীবনের অবস্থার বিরুদ্ধেই এ বিদ্রোহ, এমন কি গোটা সৃষ্টির বিরুদ্ধেও যেন। সে সঙ্গে এ বিদ্রোহ চিন্তায় ঐক্য আর স্বচ্ছতারও এক এষণা, এমন কি অসম্ভব মনে হলেও এও শৃঙ্খলা আর সামঞ্জস্য খোঁজারই অভীপ্সা।"

হার্বার্ট রীড্

২০. ৭. ৬৩

কৈশোরই যথার্থ বীর-পূজার বয়স। আমাদের কিশোরদের সামনে আজ বীর কোথায়? অতীত ইতিহাসের সঙ্গে তাদের নেই পরিচয়, থাকলেও মৃত অতীত জীবন্ত কিশোরকে কতটুকুই বা দিতে পারে নাড়া। পরিচয় নেই ওদের মহৎ কোন সাহিত্যের সঙ্গেও ফলে ওদের সামনে দেশ বিদেশের সিনেমা তারকারাই হয়ে উঠেছে এখন বীর আর বীরাঙ্গনা। এখন প্রায় প্রতিটি সচেতন কিশোর কিশোরীর এক মাত্র স্বপ্ন কি করে তারা 'তারকা' হবে, কারো কারো স্বপ্নের দৌড় বড় জোর বেতার শিল্পী কিম্বা ক্রিকেটিয়ার হওয়া পর্যন্তই।

* * * *

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সরকার মানে এখনো বহুর বিরুদ্ধে গুটিকয়েকের সে পুরোনো ষড়যন্ত্রই, তবে তা এখন গ্রহণ করেছে নূতন রূপ।"

বেবপ (Babeuf)

"কান পেতে শুনলে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে একটানা মৃদু টিপটিপ শব্দ শোনা যায়। এ হচ্ছে পুঁজিপতিদের অনবরত প্রতারণা আর লভ্যাংশের অবিরাম জমে ওঠারই এক আওয়াজ। কেউ ইচ্ছা করলে ধনীর মুনাফা বহুগুণিত হয়ে ওঠার আওয়াজ আন্তরিক ভাবেই শুনতে পারে। এর মাঝখানে অবশ্য সময় সময় শোনা যায় নিঃস্বের নীরব কান্না, আর সে সঙ্গে ছুরি শানানোর একটি ধাতব শব্দও।"

হাইনরিখ হাইনে

"রক্ত মাংসের পাপও অতি তুচ্ছ! আরোগ্যের প্রয়োজন হলে সে আরোগ্য ডাক্তারেরা অনায়াসে করে দিতে পারে। একমাত্র আত্মার পাপই হচ্ছে লজ্জাকর ও দুরারোগ্য।"

অস্কার ওয়াইল্ড

২৫. ৭ ৬৩

"গানের মূল উৎস ব্যক্তি-সত্তার গভীরতম উপলব্ধি—সেখানে প্রত্যেকে স্রষ্টা, প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র। বাইরে আঙ্গিকে একের সঙ্গে অপরের মিল হতে পারে কিন্তু ব্যক্তি-সত্তার গভীরে প্রত্যেকেই পৃথক, আলাদা ও নিজস্ব উপলব্ধিতে বিশিষ্ট। তাই সত্যিকার কম্পোজার একক ও নিঃসঙ্গ।

"বদলোকেরা একে অন্যকে ঘৃণা করলেও দুষ্কর্মের সময় কিভাবে যেন এক হয়ে মিলে যায় এটিই তাদের শক্তির মূল কারণ। অন্য দিকে সজ্জনেরা কিছুতেই হতে পারে না একত্র আর এটিই তাদের দুর্বলতা।"

জেবটুসেস্কো

"শিল্পী নিঃসন্দেহে যুগ-সন্তান কিন্তু তাই বলে তিনি যদি যুগ-শিষ্য হয়ে পড়েন সেটিই তাঁর জন্য অত্যন্ত শোচনীয়।"

শীলর

"বাইবেল বলে, তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো আর বলে, ভালোবাসো তোমার শত্রুকেও - সম্ভবত দুই-ই প্রায় এক বলেই এ উপদেশ!"

চ্যাষ্টারটন

পথিক, এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে রেখো,
আজ তুমি যা, একদিন আমিও তা ছিলাম,
আজ আমি যা, একদিন তুমিও তা হবে
অতএব আমার অনুসরণের জন্য তৈয়ারি হও
অবিলম্বে।

একটি অজ্ঞাত সমাধি-ফলক

৩০. ৭. ৫৩

"স্রষ্টা আমাদের দিয়েছেন সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমতুল্য এক আত্মা তবুও গোটা দুনিয়ার মালিক হলেও তার তৃপ্তি হয় না।"

ফ্রান্সিস বেকন

"চিন্তাতেই নিহিত আমাদের সব আত্মমর্যাদা। স্থান আর কালের উপর নির্ভর না করে তাই চিন্তার উপরই আমাদের করা উচিত নির্ভর। কারণ কোন রকমেই আমরা স্থান কালকে পারবো না পূর্ণ করতে। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করার উপরই তাই আমাদের সব শক্তি প্রয়োগ করা দরকার—আর এ হচ্ছে নৈতিকতারও বুনিয়াদ। ভূমির মালিক হয়ে আমার আর কতটুকুই বা ফয়দা হবে, স্থানের দিক থেকে দেখলে পৃথিবী আমাকে ঘিরে ধরেছে, গ্রাস করে ফেলেছে ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো কিন্তু চিন্তায় আমি দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছি সারা বিশ্বকেই।"

পাসকেল

১০. ৮. ৬৩

কীট্সের সৌন্দর্য-চেতনা ছিল অসাধারণ, প্রকাশের ভাষাও অতুলনীয়। সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর দু'টি পংক্তি অনুবাদে দাঁড়ায় এ রকম ঃ

সৌন্দর্যই মহত্তম শক্তি।

এ শক্তি অর্ধ-নিমীলিত হয়ে আছে তার নিজেরই ডান বাহুর উপর।

° ° ° ° *

"সত্যসত্যই পৃথিবী যদি দুঃখে গড়া হয়ে থাকে তা হলেও তা গড়া হয়েছে প্রেমের হাত দিয়ে, কারণ তা ছাড়া যে মানবাত্মার জন্য এ পৃথিবী নির্মিত তা অন্য কোন উপায়েই তার পরিপূর্ণ অবয়ব বা সত্তা লাভ করতে পারে না।"

—অস্কার ওয়াইল্ড

"পরিবারের জন্য উৎসর্গ করো ব্যক্তিকে,
আর সমাজের জন্য করো পরিবারকে,
সমাজকে করো দেশের জন্য উৎসর্গ,
কিন্তু আত্মার জন্য উৎসর্গ করো সারা বিশ্বকে।"

—সংস্কৃত আর্য উক্তি

১৫. ৮. ৬৩

"পবিত্রতা জন্মলব্ধ কোন বস্তু নয় আর নয় তা প্রকৃতির দানও। তা অর্জিত হয় জীবনের সংগ্রাম আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়েই।"

—আলবার্টো মোরাভিয়া

"টাকা হচ্ছে ভিজা গোবরের মতো, ছড়িয়ে না দিলে তা মোটেও সুখদ হয় না।"

—বেকন

''নির্জনতা জন্ম দেয় মৌলিকতার, অজ্ঞাত আর বিপদ-সংকুল সৌন্দর্য-চেতনা আর কবিতার; কিন্তু এর বিপরীতের জন্মও তা দিয়ে থাকে, বিকৃতি, অবৈধ-প্রবৃত্তি আর অযৌক্তিকতারও।''

টমাস মেন্

১৬. ৮. ৬৩

অস্কার ওয়াইল্ডের মতে: সাহিত্যে আধুনিকতা মানে সামান্য লাভের জন্য বিরাট দাম দেওয়া আর আঙ্গিকে বিশুদ্ধ আধুনিকতা সব সময় কিছু না কিছু অশ্লীলতাপ্রবণ।

আমাদের অনেক লেখক আধুনিকতার নামে উঠতে-বসতে গদগদ হয়ে ওঠেন কিন্তু আধুনিকতা যদি ভাববাহী না হয় তা হলে তা যে কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হতে পারে না তাঁরা কিছুতেই তা বুঝতে চান না। খোসার অন্তরালে যদি রস না থাকে তা যেমন সুস্বাদু ফল হিসেবে পায় না মর্যাদা তেমনি সাহিত্যেও আঙ্গিকের আড়ালে ভাব-রস না থাকলে ক্ষণায়ু হতে বাধ্য। সাহিত্য-শিল্পের মূল্যায়ন সম্বন্ধে অবনী ঠাকুরের এ মতটুকুও স্মরণীয়: উত্তমাধম সব উপমাই যাচাই হয়ে তার স্থান পাচ্ছে কাব্যে, সাহিত্যে শিল্পে। এই যাচাই হবার দুটো জায়গা—তার একটা হল রসিকের সভা আর একটা হল মহাকালের বিচারালয়।' আঙ্গিক সর্বস্ব আধুনিকতা এ দু'জায়গার কোথাও ঠাঁই পাবে বলে মনে হয় না।

২০. ৮. ৬৩

'মাদাম বোভারির' সুবিখ্যাত লেখক ফ্লবার্ট বয়োকনিষ্ঠ মোপাসাঁকে লেখা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন মনে হয় তা প্রত্যেক লেখকেরই স্মরণীয়। তাঁর পুরো উপদেশের অনুবাদ দেওয়া হলো এখানে:

'অবিশ্বাস করো সব কিছুকে। সৎ ও আন্তরিক হও। হও মুক্ত-বাক্। চালাকি ছাড়ো। প্রতিভা আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে—মানুষের কাজ হলো নিজের মেধার পরিচর্যা করা। সব সময়

দেখতে পাবে বিবেকের চেয়ে প্রতিভা অনেক বেশী সহজলভ্য। নিজের মহত্তম ভাগ্যের অনুগত হতে চেষ্টা করো আর করে যাও নিজের কর্তব্য। জেনে রেখো শিল্পীর বহু ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। যে শিল্পী কাজ করতে চায় তাকে যতদুর সম্ভব বহির্জগত থেকে নিজেকে কিছুটা সরিয়ে আনতেই হবে। তাঁকে বধির হয়ে থাকতে হবে তাৎক্ষণিকের ধূয়া আর ফ্যাশনের প্রতি। অন্যের কাছে নিয়-মানুবর্তিতা, নির্জনতা, অধ্যবসায় একঘেয়ে মনে হতে পারে কিন্তু তোমাকে করতে হবে এসবকে জীবনের নিয়ন্তা। যা কিছু তোমার মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে তার থেকে সাবধান—যেমন খাদ্য, মেয়ে মানুষ ইত্যাদি। হাঁ মেয়ে মানুষও! শিল্প বিশ্রাম কেন্দ্র নয় বরং এক মহত্তম ব্রত তথা জীবনের মিশন। এক সঙ্গে সুখ আর সৌন্দর্য যদি কামনা করো তা হলে কোনটাই পাবে না—কারণ দ্বিতীয়টা বিপুল ত্যাগের ফল। শিল্পের খাদ্যই হল ত্যাগ আর উৎসর্গ। নিজেকে খুব করে চাবকাও তা হলেই এগিয়ে যেতে পারবে শিল্পের দিকে। যখনই কোন কিছু সম্বন্ধে লিখতে শুরু করো তখন তার প্রতি একান্তভাবে, পরিপূর্ণভাবে সুবিচার করবে, মেনে নেবে সব ঝুঁকি, এমন কি তোমার রুচির বিপরীত হলেও। তোমার মধ্যে যদি কোন রকমের কিছুমাত্র মৌলিকতা থাকে, সবার উপরে তাকে বিকশিত করে তোল। যদি না থাকে অনুশীলনের পথে খুঁজে নাও কোন না কোন রকমের মৌলিকতা।'

২৫· ৮· ৬৩

ব্যল্‌জাকের দারিদ্র আর অভাবের কথা শুনে ফ্রান্সের রাজা তাঁকে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। শুনে ব্যলজাক রাজাকে বলে পাঠিয়েছিলেন: আমি একজন লেখক, ভিক্ষুক নই। আমি অভ্যস্ত নই ভিক্ষাগ্রহণে এমনকি ফ্রান্সের রাজার কাছ থেকেও।

৯. ১১. ৬৪

সেদিন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে শিশু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হলো। উদ্বোধন করলেন কবি জসিমউদ্দীন। উপস্থিত আর নেপথ্য শ্রোতা শিশুদের সম্বোধন করে আমাকেও কিছু বলতে হয়েছিল। আমি একথা কয়টি বলেছিলাম ঃ

তোমরা অনেক শিশু অনেক ছেলেমেয়ে বসে বসে আমাদের কথা শুনছ। তোমাদের তুলনা দেওয়া হয় ফুলের সঙ্গে, চাঁদের সঙ্গে—যা কিছু সহজ সরল নির্মল সুন্দর সে সবের সঙ্গে। ফুল দেখতে যে শুধু সুন্দর তা নয়, ফুল তার চারদিকে সুবাসও বিলায়, ভরে তোলে মানুষের দিলমন খুশীতে। চাঁদের সম্বন্ধেও সে একই কথা। চাঁদ দেখে কে না খুশী হয়? চাঁদ দেখলে তোমাদের মতো শিশুরাও হা করে তাকিয়ে থাকো আকাশের পানে। তোমরা যখন আরো ছোট ছিলে তখন তোমাদেরে কোলে নিয়ে চিরকাল ধরে মায়েরা চাঁদকে ডেকে ডেকে বলেছে ঃ

আয় চাঁদ আয় চাঁদ
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

দেখেছ এখানেও তোমাদের চাঁদ বলা হয়েছে। মায়ের চোখে আকাশের চাঁদ আর তাঁর কোলের চাঁদে কোন তফাৎ নেই। তোমাদের জীবন ধীরে ধীরে ফুলের মতো ফুটে উঠুক, বড় হয়ে তোমরা দেশের আর সমাজের চারদিকে খোশবু ছড়াও, বিলাও চাঁদের মতো আলো। এ তোমাদের মা-বাপের যেমন ইচ্ছা, তেমনি দেশের আর সকলেরও এ ইচ্ছা। এঁদের সকলের ইচ্ছার সাথে আমি আমার ইচ্ছাটাও তোমাদের জন্য জমিয়ে রাখলাম। তোমরা ফুলের মতো ফুটে ওঠো, চাঁদের মতো আলো ছড়াও। তোমরা বড় আর মহৎ হও।

১০. ১১. ৬৪

"অন্ধকারকে অভিশাপ দেওয়ার চেয়ে একটি বাতি জ্বালানো ঢের ঢের ভালো।"

—চীনা প্রবচন

'অন্তর থেকে যে বইর উৎপত্তি অন্যের অন্তরে প্রবেশের পথ তা খুঁজে নেবেই। সব শিল্প-কৌশল আর রচনার কারুকার্য এর কাছে তুচ্ছ।' কার্লাইলের এ উক্তি কোরআন সম্বন্ধে বলা হলেও মনে হয় সব মহৎ গ্রন্থ সম্বন্ধেই এ কথা প্রয়োগ করা যায়।

১২. ১১. ৬৪

আরবীতে আল্লার সংজ্ঞাবাচক একটি ছড়া আছে, ছড়াটি মিসরেই নাকি অধিকতর চলতি। ছড়াটি এই: 'কুল্লু মা খতর বে বালেক, ফহুয়া হালেক, অ-আল্লাহু বে-খেলাফ জালেক'। অর্থ: যা কিছু তোমার মনে জাগে তা ধ্বংসশীল কিন্তু আল্লাহ তার বিপরীত। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের সব চিন্তা-ভাবনার বাইরে। কারণ আমাদের চিন্তা-ভাবনা ক্ষণস্থায়ী আর পরিবর্তনশীল। আল্লাহ তা নন্।

১৫. ১২. ৬৪

খাঁটি শিল্পী কে? এ সম্বন্ধে ব্লেক (Blake) চারটি পঙক্তিতে যা বলেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে।

একটি বালু-কণায় যে দেখতে পায় আস্ত একটি পৃথিবী আর
একটি বুনো ফুলে আস্ত একটি স্বর্গ—
হাতের তালুয় যে ধরতে পারে অসীমকে
আর একটি ঘণ্টায় চিরন্তনকে।

খাঁটি শিল্পীর এ লক্ষণ। শিল্পের এ রহস্যই শিল্পকে জীবনের চেয়েও দীর্ঘায়ু করে তোলে। Life is short, Art is long—কথাটা মোটেও অর্থহীন নয়।

৫. ১. ৬৫

সম্প্রতি আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহু ছাত্রকে নানাভাবে দণ্ডিত করেছেন। এসব দণ্ড সম্বন্ধে আমাদের তেমন কোন বক্তব্য নেই। অপরাধ আর অপরাধের গুরুত্ব আর প্রদত্ত দণ্ডের যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই বিচারকদের জানা। তবে একটি দণ্ড আমার কাছে হাস্যাস্পদ মনে হয়েছে—মনে হয়েছে প্রতিহিংসাপরায়ণতার ফলেই বিচারের নামে সম্ভব হয়েছে এমন চরম আহাম্মুকি দেখানো। ১৯৬১ ইংরেজিতে পাশ করা দুটি ছেলের এম-এ ডিগ্রী, ১৯৬৪ ইংরেজিতে সংঘটিত ঘটনার সঙ্গে তারা লিপ্ত ছিল এ অভিযোগে, বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যে পরীক্ষা পাশ করে ওরা ডিগ্রী পেয়েছে তার সঙ্গে দু'বছর পরে সংঘটিত ঘটনার কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়, থাকা সম্ভবও নয়। শাসক আর বিচারকরা যত শক্তিমানই হোন ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তাঁদেরও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমতো লেখাপড়া করে পরীক্ষা দিয়ে আর তা পাশ করে তবে পেতে হয় ডিগ্রী। সে সময়সীমায় যদি ছাত্র কোন অপরাধ না করে থাকে তাহলে তার ডিগ্রীর গায়ে হাত দেওয়ার অধিকার সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রয়েছে তা সাধারণ বুদ্ধিতে ভাবা যায় না। ডিগ্রী কোন অনুগ্রহ নয়—ওটা ছাত্রের অর্জিত সম্পদ। অর্জিত সম্পদের নিরাপত্তা সব সভ্য আইনেই স্বীকৃত। অপরাধী ছাত্র অছাত্র সবাইকে দণ্ড দেওয়ার আইনের কোন অভাব নেই দেশে, তেমন আইনের আশ্রয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহজেই নিতে পারতেন। বলাবাহুল্য আইনও সাধারণ জ্ঞানের বাইরে নয়—এ দণ্ডের বেলায় তাঁরা সে সাধারণ জ্ঞানকে ডিঙিয়ে গেছেন বলেই দণ্ডটি হাস্যাস্পদ হয়ে পড়েছে। শুনেছি, পরে উচ্চতর আদালতে এ দণ্ড টেকেনি। পণ্ডিত মূর্খ কথাটা সত্য বলেই হয়তো চালু

হয়েছে—আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা যেন আবার নতুন করেই প্রমাণ করলেন।

এখানে বলে রাখা ভালো, যে-ছেলে দু'টার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো তারা কেউই আমার চেনা-শোনা নয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের বাইরে ওদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এক বর্ণও বেশী নয়। তবে জানি এরা কেউ-ই আমার নিজের জেলার ছেলে নয়। জেলা কথাটা বিশেষ করে উল্লেখ করছি এ কারণে যে এখন জেলা-প্রীতি পূর্ব পাকিস্তানে এক নতুন ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুগটাই যেন হয়ে পড়েছে জেলা-প্রীতির যুগ!

৬. ১. ৬৫

আমাকে মাঝে মাঝে ছাত্রদের সভাসমিতিতে যেতে হয়। দল আর মতামত নির্বিশেষে সব ছাত্র সমাবেশেই আমি যেতে থাকি যদি ডাকা হয় আমাকে। ইদানীং ছাত্রদের আমি এ কয়টি 'না' পালনের নির্দেশ দিয়ে থাকি:

১. তোমাদের স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় বাইরের রাজনীতি ঢুকতে দিয়ো না। (২) জেলা কিম্বা এলাকা-প্রীতিকে দিয়ো না প্রশ্রয়। (৩) প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে, কিম্বা পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে ধর্মঘট করো না, কারণ এসব ছাত্রজীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। (৪) তোমার শিক্ষক বা অধ্যাপককে মনে করো না তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ। (৫) কোন ব্যাপারেই করো না বাড়াবাড়ি। পরিমিতিবোধ আত্মমর্যাদার লক্ষণ।

পশ্চিম বঙ্গের সুবিখ্যাত 'নবজাতক' মাসিক আমার এ কথা ক'টি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন,: "যা সহজ নয় তাও করবার সাহস ওখানকার (পূর্ব পাকিস্তানের) কোন কোন অধ্যাপকের আছে বলেই বোধ হয় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় এমন উপদেশ দিতে পারেন যা অধ্যাপক আবুল ফজল দিয়েছেন।" শেষের দিকে

এ কথাটুকুও যোগ করেছেন সম্পাদিকা : "কোন ছাত্র সম্মেলনে এখানকার (অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের) কোন অধ্যাপক এ জাতীয় পরামর্শ দিতে ভরসা পাবেন বলে তো আমার মনে হয় না।" (নবজাতক, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭৩)

১৭. ১. ৬৬

আমাদের বিচারালয়গুলির চারদিকে চলে হৈ চৈ আর সোরগোলের এক তাণ্ডব লীলা। এ পরিবেশে হাকিম আর উকিল মক্কেল কারো পক্ষে সুস্থির হওয়া কিম্বা মন-মেজাজের ভার-সাম্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। শান্ত স্থির গাম্ভীর্যের কোন পরিচয় কোথাও দেখা যায় না। অথচ বিচারের জন্য এ সবই অত্যাবশ্যক। অনেক সময় বিচারের নামে যে প্রহসন চলে তার জন্য বিচারালয়গুলির এ পরিবেশও কম দায়ী নয়।

১. ২. ৬৬

সাহিত্য এক পুরোনো ব্যাপার। মানুষ যখন থেকে মানুষ হয়ে উঠেছে অর্থাৎ ভাবতে আর অনুভব করতে শিখেছে তখন থেকেই সাহিত্যের সূচনা। প্রকাশ সাহিত্যের অপরিহার্য বাহন। সব মানুষই অল্পবিস্তর ভাবতে আর অনুভব করতে পারে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে লাখে এক। এখানেই সাহিত্যিকের অনন্যতা। ভাব বা অনুভূতি প্রকাশিত হয়ে দেখা না দিলে সাহিত্য হয় না। মাটির নীচে অজস্র ফল্গুধারা আছে। সব ধারা নদী কিম্বা ঝর্ণা হয়ে বা সমুদ্রের রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে না। যে স্রোত নিজের দুর্বার গতিতে মাটি ফুঁড়ে বেড়িয়ে আসে স্রেফ সেগুলিই রূপ নেয় নদী, ঝর্ণা বা সমুদ্রের। বাকিগুলি হারিয়ে যায় মাটির নীচে।

ভাব বা অনুভূতির বেলায়ও একথা। যার মনে কোন চিন্তা বা অনুভূতি দুর্বার হয়ে ওঠে, প্রকাশের জন্য আকুলি ব্যাকুলি করে সে-ই সাহিত্যিক। অর্থাৎ সেই খুঁজে নেয় বা খুঁজে পায়

প্রকাশের মাধ্যম। অবশ্য কৃত্রিমতা সব ক্ষেত্রেই আছে, সাহিত্যেও আছে দেদার। শুধু লেখক হওয়ার জন্যও অনেকে লেখে থাকেন, মনের ভিতর কোন ভাবই হয়তো ওঠেনি দুর্বার হয়ে, তবুও লেখায় বিরাম নেই তাঁদের, ছেপে প্রকাশ করতে বোধ করেন না কোন সংকোচ তাঁরা। এ সব লেখাকে কাগজের ফুলের সঙ্গেই শুধু তুলনা দেওয়া যায়। বাগানের পুষ্পসভায় যেমন এ সব ফুলের স্থান নেই তেমনি আন্তরিকতাহীন কৃত্রিম লেখারও স্থান নেই সাহিত্যের আ'ম কি খা'স কোন দরবারেই।''

২. ২. ৬৬

'তুমি বা আমি যে কেউ কোন একটা মিথ্যায় বিশ্বাস করার চেয়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়াই ভালো। এ হচ্ছে চিন্তার ধর্ম। এর জ্বলন্ত শিখায় পৃথিবীর সব মালিন্য পুড়ে ছাই হয়ে যায়।'

বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল।

১৪. ২. ৬৬

গত সন্ধ্যায় আলাউদ্দিন আল্ আজাদ এসে জিজ্ঞেস করলেন: মূল্যবোধের অর্থ কি? মনে হয় এ সম্বন্ধে কারো ধারণা স্পষ্ট নয়।

উত্তরে আমি বল্লাম: মনুষ্যত্ব আর মনুষ্যত্ব-বিকাশের যা সহায়ক তাই মূল্যবোধ।

আজাদ: ধর্মীয় নির্দেশগুলিকে মূল্যবোধ তথা value বলে গ্রহণ করা যায় কি?

আমি: সেখানেও যাচাই প্রয়োজন। ধর্মের সব নির্দেশ কখনো মূল্যবোধ বলে মানা যায় না। ধর্মের এমন নির্দেশ আছে যা প্রয়োগ করা যায়না সব মানুষের উপর, অনেক নির্দেশ আছে যা মনুষ্যত্ব-বিরোধী। তাই রবীন্দ্রনাথের এ কথাটা সত্য: যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র, যা শাস্ত্র তা-ই বিশ্বাস্য নয়।' আমাদের দেশের মানুষ শাস্ত্রকেই মনে করে ধর্ম।

আজাদ : একজন অধ্যাপক বলেছেন—সত্য বলা, চুরি না করা, ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া ইত্যাদিই মূল্যবোধ।

আমি : এ সব আদিকাল থেকেই মূল্যবোধ বা value বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে এবং মনুষ্যত্বের সঙ্গে এর সম্পর্কও অনস্বীকার্য। কিন্তু এসবের তাৎপর্য মনুষ্যত্ব-বিকাশের সঙ্গে কোথায় এবং কি ভাবে সহায়ক তা বুঝতে হবে। না হয় মূল্যবোধের চেতনা থেকে যে ফল প্রত্যাশা করা যায় তা কিছুতেই পাওয়া যাবেনা। মূল্যবোধ কথাটাকে ব্যবহারিক অর্থে না নিলে বুলির বেশী তার কোন দাম থাকে না। আজ যাকে আমরা ব্যভিচার বলছি—এককালে, যখন বিয়ে-প্রথা চালু হয়নি, তখন তাকে ব্যভিচার বা দোষণীয় মনে করা হতো না। স্বাভাবিক মানবীয় প্রয়োজন বা অত্যাবশ্যক এক দৈহিক ক্রিয়া বলেই করা হতো গণ্য। কালের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধের ধারণায়ও বিবর্তন অনিবার্য। এ সব ব্যাপারে য়ুরোপের মূল্যবোধের সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধের তফাৎও অনুধাবন যোগ্য।

১৫. ২. ৬৬

কয়েকদিন আগে এক তরুণ অধ্যাপক আমার রচনার বিরূপ সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—আমি নাকি মন-গড়া কথা লিখে থাকি। কথাটা তিনি নিন্দা অর্থেই ব্যবহার করেছেন। একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে সাহিত্য মানে মন-গড়া কথা। বিশেষত যাকে উচ্চ আর সুকুমার সাহিত্য বলা হয় তার ষোল আনাই রচয়িতার মন-গড়া কথা। মন-গড়া কথায় যত যাদু, নিখুঁত ভাবে প্রামাণ্য দলিলী কথায় তার সিকি পরিমাণ যাদুও নেই। মন-গড়া কথার ভেল্কি দেখাতে পেরেছেন বলেই না কালিদাস মহাকবি আর তাঁর মন-গড়া কথার মধু-ভাণ্ড 'মেঘদূত' অমর কাব্য

আরব্যোপন্যাসকে তো মন-গড়া কথার এক যাদুঘর বল্লেই চলে। আর যা কিছু ক্লাসিকস্ নামে অভিহিত সবই তো এ মন-গড়া

কথা দিয়েই গড়া। ব্যাস-বাল্মিকী-হোমার-দান্তে-সেক্সপিয়ার সবাইতো এ মন-গড়া কথারই যাদুগীর। এমন কি এলিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড্ও মন-গড়া কথার যাদুয় মোড়া বলেই ক্লাসিক্সে উন্নীত। আসলে সাহিত্য মানে মন-গড়া কথা, বাদ বাকি সব ইতিহাস, ভুগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত বা শাস্ত্র। কিন্তু সাহিত্যের আসন এসব কিছুর উর্ধ্বে, তাই ভুগোলের চেয়ে কাব্যের আর শাস্ত্রের চেয়ে উপন্যাসের আদর এত বেশী। কাব্য-উপন্যাস মানেই তো মন-গড়া কথা। তবে সার্থক মন-গড়া কথা যে-সে রচনা করতে পারেনা, তার জন্য অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। রাগে বা ঈর্ষায় দিগ্বিদিক জ্ঞান না হারালে সমালোচক আমাকে কখনো এমন শক্তিমান ঠাউরে ভুল করে বসতেন না!

১৭. ২. ৬৬

সম্প্রতি 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ' এ নামে আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না, তাঁর কালের অবস্থা-মতো যতটুকু সম্ভব মুসলমান সমাজকে তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন আর শিক্ষিত মুসলমানদের কাছেও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধেয়। বহু নজিরের সাহায্যে এ কথাটাই শুধু আমার উক্ত প্রবন্ধে চেয়েছি বলতে।

প্রবন্ধটা পড়ে অথবা না পড়েই কোন এক মহলের এক মুখপত্র নাকি মন্তব্য করেছেন: 'এমন পাক-ভারত বিরোধ আর যুদ্ধের দিনে এ ধরণের প্রবন্ধ লেখা আর প্রকাশ করা কিছুতেই উচিত হয়নি।' কেন অনুচিত তার ব্যাখ্যা নাকি তিনি করেননি।

যুদ্ধ আর বিরোধ নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। কিন্তু যুদ্ধ ও বিরোধের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন সাহিত্য আর সাহিত্যিককেও যদি আমরা বর্জন করি তা হলে বুঝতে হবে আমরা মনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য আর সুস্থ মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছি। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের অনুকূল যা করেছেন আর যা বলেছেন তারই কিছু

কিছু নমুনা আহরিত হয়েছে। এ সব কথাও হজম-করতে না পারা শুধু যে রুগ্ন মনের পরিচায়ক তা নয়, মুসলমান সমাজের কল্যাণ সম্বন্ধেও এসব মানুষের ধারণা যে কতখানি খণ্ডিত তা দেখে শঙ্কিত হতে হয়। সাহিত্য-শিল্পের ব্যাপারে আমার মন কোন সীমায় আবদ্ধ হয়ে থাকতে রাজি নয়। সংকটের দিনের বদ্ধ হাওয়া থেকে আমার মন সামুদ্রিক হাওয়ায় খোঁজে মুক্তি। এটা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এ আমি মনে করিনা। দার্শনিক কিয়ার্কেগার্ডের মতে, সাহিত্যের এক বড় কাজ মানুষকে সচেতন করে তোলা-To make people aware। সাহিত্যের এ ভূমিকায় আমিও বিশ্বাসী। এ বিষয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য এক মোক্ষম উপাদান।

২৪. ২. ৬৬

৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ তথা ৯৯ হিজরির ঘটনা।

বাদশা সোলেমান রাজধানী দামেস্ক থেকে হজ করার জন্য অনেক সভাসদ ও কবি সমভিব্যাহারে মক্কা যাচ্ছিলেন। মদিনায় পৌছার পর তিনি যখন বিশ্রামরত তখন তাঁর সামনে নিয়ে আসা হয় চার শ' গ্রীক বন্দীকে। তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁর সঙ্গী সভাসদ আর কবিরা এদের উপর ক্রীড়াচ্ছলে তলোওয়ার চালানো অভ্যাস করুক। একের পক্ষে যা খেলা অপরের পক্ষে যে মৃত্যু এ প্রবাদ বাক্যটাকে প্রমাণ করার জন্যই যেন দেওয়া হলো এ নির্দেশ।

সভাসদরা এক এক কোপে এক এক বন্দীর মাথা ধর থেকে পৃথক করে ফেললো মুহূর্তে। কবি ফরাজদকের সামনেও এক বন্দীকে এনে তাঁর হাতেও তুলে দেওয়া হলো ধারালো এক তলোওয়ার। তিনি একাধিকবার চেষ্টা করেও সফল হলেন না বন্দীকে হত্যা করতে। কবির ব্যর্থতায় বাদশাহ আর সভাসদরা কবিকে করতে লাগলো নানাভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, করতে লাগলো হাসাহাসি কবির

অক্ষমতাকে নিয়ে। কবি এবার হাতের তলোওয়ারটা ছুঁড়ে ফেলে মুখে মুখে এমন কয়েকটি চরণ রচনা করে সপারিষদ বাদশাহকে শুনিয়ে দিলেন যে, মুহূর্তে সকলের মুখ হয়ে গেলো চুন, মুখের হাসি হয়ে গেলো স্তব্ধ। প্রত্যেকের ভিতরের মানুষটি যেন মাথা নোয়ালো লজ্জায়। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন স্যার উইলিয়াম মুর তাঁর **Early Caliphate** বইতে।

বহুকাল আগে আমাকে একবার এক ধার্মিক সহকর্মী জিজ্ঞেস করেছিলেন—ধার্মিকে আর সাহিত্যিকে পার্থক্যটা কোথায়? আমি বলেছিলাম: ধর্মশাস্ত্রে যদি কাফেরকে বধ করার নির্দেশ থাকে ধার্মিক বিনা দ্বিধায় তা হয়তো করে বসবে কিন্তু সাহিত্যিক প্রয়োজন হলে নরক-বাস কবুল করে নেবে কিন্তু জ্বলজ্যান্ত একটা মানুষকে কিছুতেই করবেনা খুন। বাদশাহ সোলেমানের সভাসদরা সবাই হয়তো ধার্মিক ছিলেন এক কবি ফরাজ্‌দক্‌ ছাড়া।

১৭. ১২. ৬৬

আজ বেলা প্রায় বারোটার দিকে বাসায় ফিরছিলাম এখানে ওখানে টুকিটাকি কাজ সেরে। পি, আই, অফিস ছাড়িয়ে বাসার কাছাকাছি পৌঁছতেই আমার বিপরীত দিক থেকে, আমার মতই পায়ে হেঁটে আসা এক বয়স্ক হিন্দু ভদ্রলোক হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বসলেন। আমি তো রীতিমতো অবাক! ভদ্রলোক আমার সম্পূর্ণ অচেনা—কখনো দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে বলে উঠলাম, কী ব্যাপার! আপনি এভাবে.........।

বল্লেন: কিছুই না, আপনাকে একটা প্রণাম করতে ইচ্ছা হলো, তাই করলাম। আমাকে আশীর্বাদ করবেন। বলেই, পা বাড়ালেন সামনের দিকে, ফিরে তাকালেন না আমার দিকে আর একবারও।

মনে হলো, মানুষ যেমন বিচিত্র তেমনি তার আচার আচরণও কম বিচিত্র নয়। আমি কোন সাধুপুরুষ নই, কোন রকম সাধুতার

ভানও আমার নেই। তবুও মানুষ মাঝে মাঝে ভুল করে বসে আমাকে নিয়েও। একবার তো গ্রামে আমার কাছে পানি-পড়া নিতেও লোক এসেছিল !

এর বিপরীত ঘটনাও যে ঘটেনা তা নয়। সে সবও রীতিমতো অবাক হওয়ার মতো।

শুনেছি কেউ কেউ আমাকে নাস্তিক, এমন কি ধর্মদ্রোহীও মনে করে থাকে। এক মৌলবী সাহেব নাকি একবার আর এক বন্ধুকে আমার নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন: জানেন, লোকটি খোদাকেও মানে না।

উত্তরে উক্ত বন্ধুটি নাকি বলেছিলেন: খোদাকে তিনি মানেন কিনা জানি না. তবে মনে হয় খোদা তাঁর প্রতি তেমন অপ্রসন্ন নন, তা না হলে এত ইজ্জৎ সম্মান আর কিছুতেই জুটতো না।

আর একবার তো একজন রীতিমতো উচ্চশিক্ষিত এম. এ. পাশ ভদ্রলোক আমার অন্য এক বন্ধুকে এ বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন: আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে বেশী হাঁটবেন না, আপনার ঈমানও নষ্ট হয়ে যাবে।

এ বন্ধুটিও নাকি উত্তর দিয়েছিলেন: আমরা তো রোজই এক সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ করে থাকি, আমার ঈমান নষ্ট হওয়ার হলে তা তো অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। সাবধান যখন করলেনই তখন এতো দেরীতে করলেন কেন ?

১৯. ১২. ৬৬

এমিল ক্রটকির (Emil Krotky) কয়েকটি কথা বাংলা অনুবাদে এ দাঁড়ায়:

১। লোকটির মাথায় একটি ভাব এসেছিল বটে কিন্তু মাথার ভিতরটা খালি দেখে ভাবার্থ আবার ফিরে গেছে।

২। এমন কি ঘাসটাকেও মাথা চাড়া দিয়েই উঠতে হয় উপরের দিকে।

৩। যতক্ষণ গরম আর কড়া থাকে চা আর বন্ধুত্ব ততক্ষণই উপাদেয় কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি না হওয়াও চাই।

৪। বহু নববর্ষের পুনরাবৃত্তি বার্ধক্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫। এমন বহু লোক আছে যাদের সামনে মনীষা বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া রীতি মতো বেয়াদবি।

৬। বিয়ে হচ্ছে দুই বিপরীত স্নায়ু যন্ত্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান।

৭। যেখানে অধিকাংশ মানুষ চোর সেখানে সততা নিশ্চয়ই দণ্ডনীয় বিবেচিত হয়।

২০. ১২. ৬৬

মানসিক সততা (Mental honesty) সাহিত্যের এক প্রধান শর্ত আর সাহিত্যের বিকাশের জন্য সব চেয়ে বড় প্রয়োজন ন্যূনতম দমন (Minimum of censorship)। কবিতার চেয়ে গদ্যে এর প্রয়োজন আরো বেশী। কারণ গদ্য বক্তব্য-নির্ভর বলে তার জন্য স্বচ্ছতা অপরিহার্য—বিশেষ করে চিন্তা আর ভাষার স্বচ্ছতা। এখন আমাদের দেশে গদ্যের তুলনায় কবিতা কিছুটা ভালো হওয়ার কারণও এটি। এখন আমরা অনেক ব্যাপারে মনের কথা মন খুলে বলতে পারি না। এ প্রসঙ্গে জর্জ অরওয়েলের এ কথা কয়টিও স্মরণ করা যেতে পারে: 'গোঁড়ামি সব সময় গদ্যের জন্য ক্ষতিকর। সর্বোপরি উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ ভয়ানক মারাত্মক। সাহিত্যে যত রকম আঙ্গিক আছে তার মধ্যে উপন্যাস সব চেয়ে নৈরাজ্যিক। কয়টা রোমান ক্যাথলিক এযাবৎ ভালো ঔপন্যাসিক হতে পেরেছে? যে কয়জনেরও বা নাম করা যায় তারাও সাধারণতঃ ক্যাথলিক হিসেবে নিকৃষ্ট। উপন্যাস মূলতঃ প্রোটেসটেন্ট তথা প্রতিবাদী শিল্প—মুক্ত আর স্বায়ত্বশাসিত মনেরই তা সৃষ্টি।'

অবাধ আর কল্পনা নির্ভর গদ্যের (অরওয়েল যাকে Imaginative Prose বলেছেন) প্রশস্ত ক্ষেত্র উপন্যাস। আমরা আজ কেউই মুক্ত

আর স্বায়ত্বশাসিত মনের অধিকারী নই—ফলে কল্পনা নির্ভর গদ্যের ক্ষেত্রও আমাদের জন্য অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আমাদের গল্প সাহিত্যের দুর্গতির এও একটি বড় কারণ। খাঁটি ক্যাথলিক যেমন এযাবৎ ভালো ঔপন্যাসিক হতে পারেনি তেমনি খাঁটি মুসলমানও পারেনি বড় ঔপন্যাসিক হতে। অন্ততঃ তেমন নজির আজো দেখা যায়নি। খাঁটি ধার্মিক আর খাঁটি সাহিত্যিক অনেকটা আলাদা ব্যাপার—আলাদা শুধু না কিছুটা বিপরীত ধর্মীও।

২৬. ১২. ৬৬

গত ৮ই ডিসেম্বর, আলাউদ্দীন আল আজাদের চট্টগ্রাম বাসভবনে স্থানীয় সংস্কৃতি পরিষদ একটি সাহিত্য সভার আয়োজন করেছিল। আশ্চর্য, সভার উদ্যোক্তাদেরও অনেকে, এমনকি স্বয়ং সম্পাদকও সভায় হাজির হওয়ার বোধ করেন নি প্রয়োজন। এ সভায় আজাদের নতুন লেখা একটি নাটক আর অন্যান্যরাও কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পড়বেন এমন কথা বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। শেষকালে দেখা গেল গৃহকর্তা আজাদ ছাড়া নির্দিষ্ট লেখকদের আর কেউই উপস্থিত হন নি। নির্দিষ্ট লেখকদের একজন ছিলেন সাহিত্য ব্যাপারে পরম উৎসাহী এক অধ্যাপক। তিনি ব্রিজ খেলায় অংশ নেবেন বলে আসতে পারবেন না খবর পাঠিয়েছেন! সাহিত্যের প্রতি এ যাঁদের মনোভাব, এখন আমাদের দেশে সাহিত্য করেন তাঁরাই!

২৭. ১২. ৬৬

অনেক কিছু ফিরে আসে, ফিরিয়ে আনা যায় কিন্তু সময়কে যায় না ফিরিয়ে আনা। বয়স্ক লোকেরা সাধারণতঃ বুঝতে পারেন না ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে, তাঁদের যৌবনকালে যা মনে করা হতো, যে মতামত দেওয়া হতো বা করা হতো পোষণ, সে সব আর এখন নির্বিচারে যায় না গ্রহণ করা। কারণ সময় আমাদের এখন অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে এসেছে, নিয়ে এসেছে আমাদের সামনে নতুন অবস্থা

নতুন সমস্যা, আর নতুনতর জিজ্ঞাসা—যার মোকাবেলা না করে আমাদের উপায় নেই। আমাদের অতীত যত মহৎ আর বিরাটই হোক না কেন ইতিহাস তার চেয়েও বড়, ইতিহাস সে সবকে গিলে হজম করতে পারে, করেও। ইতিহাসের পাতায় তার দেদার নজির ছড়িয়ে রয়েছে। অতীতকে ছোট করে দেখা যেমন উচিত নয়, তেমনি অতিরিক্ত মূল্য দেওয়াও অত্যন্ত ক্ষতিকর। অতীত নিয়ে বড়াই করাও স্রেফ এক শিশু সুলভ মানসিকতা। অনেকে যেমন নিজের শৈশবকেই পৃথিবীর স্বর্ণযুগ ভেবে থাকেন তেমনি নিজের জাতির অতীতকেও ভেবে থাকেন তাই। অনেকে আবার অতীতের কয়েকটি মহৎ কীর্তিকেই মনে করে বসেন অতীতের সারসম্পদ আর তার অগৌরব গুলিকে যান ভুলে, অনেক সময় ইচ্ছা করেই। এসব লোক বর্তমানের অপকীর্তিগুলিকেই মনে করেন—এযুগের একমাত্র প্রতিনিধি, তাই তাঁরা বর্তমান যুগের নিন্দায় হন পঞ্চমুখ।

১৮. ১. ৬৭

ইডিয়ট (Idiot) কথাটা নাকি গ্রীকদের আবিষ্কার। আমাদের ভাষায় তার যথাযথ প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। বোকা বা হাবা কথায় তার পুরোপুরি অর্থ আর দ্যোতনা প্রকাশ পায় না। মনের দিক দিয়ে যারা বামন আর ভারসাম্যহীন অর্থাৎ তথাকথিত বাস্তববাদী (Practical man), যারা সব রকম সংস্কৃতি চর্চাকে মেয়েদের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে, নিজেরা একান্তভাবে ভালোভাবে থাকার নামে এমন আরাম আয়াসী জীবনের গোলাম হয়ে পড়ে যে তারা হারিয়ে বসে নিজেদের মন আর মনের দৃষ্টিভংগির সব রকম সচেতনতা। ফলে ওদের জীবন-বোধ এত সংকীর্ণ আর খণ্ডিত হয়ে পড়ে যে ভালো জীবন কাকে বলে সে উপলব্ধিটুকুও থাকে না ওদের। এসবলোক জানেই না মহৎ-জীবন বা Good life কাকে বলে আর কি করে তা করতে হয় আপন। এ রকম লোককেই নাকি গ্রীকরা বলতো ইডিয়ট।

আমাদের সমাজে এমন ইডিয়টের সংখ্যা এখন দিন দিন কি ভাবে বেড়ে চলেছে তা বোধকরি কারো নজর এড়াবার কথা নয়।

২১. ১. ৬৭

গতকালের পত্রিকা থেকে জানা গেল—কয়েকদিন আগে রমজানের শেষের দিকে নব নির্মিত এক মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে উচ্চ পর্যায়ের এক মিলাদ মহফিল হয়েছিল রাজধানী ঢাকা শহরে। বহু আলেম ফাজেল, ছাত্র-অধ্যাপক, চ্যান্সেলার-ভাইচ-চ্যান্সেলার, উচ্চ রাজকর্মচারী অনেকেই উক্ত মহফিলে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামের শিক্ষা, সাম্য, ন্যায়-নীতি, সুবিচার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক অনেক আবেগী বক্তৃতা হয়েছিল। প্রধান অতিথির বক্তৃতা হয়েছিল সবচেয়ে জোরালো। বক্তৃতার পর পাঁচ শ'জনের ইফতারি ঠেলাঠেলি করে কেউ তিন প্লেট খেয়ে মুখ মুছেছেন, কারোও বা আধ প্লেটেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কেউ কেউ স্রেফ পানি মুখে দিয়েই সঞ্চয় করেছেন রোজা ভাঙ্গার দুর্লভ অভিজ্ঞতা। বরাদ্দ ইফতারির একজনে তিন প্লেট খেলে আর দু'জনকে যে পানি খেয়ে ইফতার করতে হবে ধর্মীয় উচ্ছ্বাসের স্রোতে এ গাণিতিক সত্যটাও বোধ করি সেদিন তলিয়ে গিয়েছিল! কিন্তু সত্য সহজে মরবার কি ছাড়বার পাত্র নয়, একটু পরে তার বিকৃত মুখটা বেরিয়ে পড়লো অন্যভাবে। মগরেব শেষে বিদায় বেলায় দেখা গেলো পঁচিশ জোড়া জুতাই নিখোঁজ। যাঁদের জুতা নিখোঁজ হয়েছিল তাঁরা নিশ্চয়ই অল্পক্ষণ আগে শ্রুত বক্তৃতার হাতেনাতে এমন বিপরীত ফল দেখে মুহূর্তের জন্য হলেও বনেছিলেন বেকুব।

আশ্চর্য, ধর্মের আদর্শ যাঁরা এভাবে প্রচার করে বেড়ান তাঁরা জানেন না যে, চোরেরাও দেখে আর বুঝতে পারে এমন প্রচারক আর বক্তাদের কথা আর কাজে কোন সঙ্গতিই নেই। ইসলামের শিক্ষা আর আদর্শ পালনের দায়িত্ব কি শুধু গরীবদের? এ প্রশ্ন

গরীবদের মনে না জাগার আর তার ফলে কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়ার তেমন কোন মানবিক কারণ নেই। আর তার অভিব্যক্তি যদি অসামাজিক পথে ঘটে তাও অসঙ্গত বলা যায় না। বলা বাহুল্য, জুতাচুরিও দশটা সামাজিক সমস্যারই অন্যতম—এর সঙ্গেও অর্থনীতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। স্রেফ ইসলামের আদর্শ আর ধর্মের বুলি শুনিয়ে এ সমস্যার সমাধান কিছুতেই হবে না যদি না আর্থিক আর সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য আর ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩০. ১. ৬৭

গতকাল ফেনী কলেজের ছাত্র মজলিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। ছাত্রদের উদ্দেশ করে মুখে মুখেই কিছু বলেছিলাম। সভ্যতা আর গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত যে পরমত-সহিষ্ণুতা একথাটার উপরই দিয়েছিলাম জোর। স্কুল কলেজ বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সামান্য নির্বাচনের হার জিৎ নিয়ে ছাত্ররা যে ভাবে উত্তেজিত ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে তা লক্ষ্য করেই এ বিষয়ে বলা আমি সঙ্গত মনে করেছিলাম। অন্যান্য ছাত্র-অনুষ্ঠানেও এমন কথা যে বলিনি আগেও, তা নয়।

১. ১২. ৬৭

ধর্ম আর ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। বিশেষত যাঁরা জীবনের গভীরতম সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তাঁরা এ জিজ্ঞাসার সম্মুখীন না হয়ে পারেন নি। এ সম্পর্কে মনীষী রোমা রোঁলা বলেছেন: 'সুখ ও দুঃখ শুদ্ধ যা-কিছুই বিরাজ করছে তার সব কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করেন। সে সঙ্গে বিশ্বাস করেন তাবৎ বিশ্ব আর মানব ও মানবজাতিতে জীবনের যত রূপ (form) রয়েছে সে সব কিছুতেও। তাঁর মতে তিনিই ঈশ্বর যিনি অবিরাম জন্ম নিচ্ছেন। প্রতি মুহূর্তেই সৃষ্টির নব জন্মান্তর ঘটেই চলেছে। ধর্ম কখনো পরিপূর্ণতা পেতে পারে না, অবিরাম কর্ম আর অবিরাম

প্রচেষ্টারই ঐ এক নাম—ঐ যেন ঝর্ণার জল নিঃসরণ, তা কখনো চারিদিকে পাড় বাঁধা পুষ্করিণী নয়। যে নদী মানবাত্মার গভীরতম তলদেশ থেকে, তার অদৃশ্য শিলা, বালুকণারাশি আর বরফ প্রবাহ থেকে অনন্তকাল ধরে অবিরাম নির্গত হচ্ছে সে নদীই পবিত্রতম। যা' আদি ও আদিম শক্তির উৎস তাকেই আমি ধর্ম বলে অভিহিত করে থাকি।'

২. ২. ৬৭

কাগজের ফুল আমার দু'চোখের বিষ। সহ্য করতে পারিনা মোটেও। তবুও এর হামলা বার বার এসে পড়ে আমার উপরও। যখনই এ ফুলের মালা দিয়ে আমাকে কোন অনুষ্ঠানে বরণ করা হয় তখন মুহূর্তে আমার মন মেজাজ যায় বিগড়ে। রাগে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়ি। প্রথম এ অভিজ্ঞতা হয় আমার নাজিরহাট কলেজে, সেদিনও ছেলেদের কষে ভর্ৎসনা করেছিলাম। গত ৩১ শে জানুয়ারী ফেনী কলেজেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটল—আমার গলায় কাগজের মালা দিতেই মুহূর্তে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেল্লাম। বক্তৃতা দিতে উঠে প্রথমে এক চোট নিন্দা করলাম এর জন্য ছাত্রদের। আরো কয়েক জায়গায় এমন তরো কাণ্ড ঘটেছে—প্রতিবারই নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। নিন্দা করেছি কণ্ঠের সব জোর দিয়ে কঠোর ভাষায়। নিমন্ত্রিত হয়ে এসে সব ব্যাপারেই মুখ বুজে থাকা আমাদের দেশের রেওয়াজ। এ ব্যাপারে আমি কখনো সে রেওয়াজ রক্ষা করতে পারিনি। তবুও দেখেছি কোন ফল হয় না—একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে বার বার। কাগজের মালার দৌরাত্ম্য থেকে কিছুতেই যেন রেহাই মেলে না। কতবার বলেছি এ ভাবে মালা নাই বা দিলে। রীতিরক্ষার নামে কাগজের মালা দিয়ে অপমান করার কোন মানে হয় না। কাগজের ফুলের মালা আমার কাছে সব সময় অপমানকর মনে হয়।

ফুল সংগ্রহ করতে কিছুটা পরিশ্রম করতে হয়। আশ্চর্য এ যুগের

ছেলেরা সেটুকু পরিশ্রম স্বীকারেও নারাজ। পয়সা দিয়ে দোকান থেকে কাগজের নকল ফুলের মালা কিনে এনে তা দিয়ে কিছুটা নকল ভক্তি দেখিয়েই তারা দায় সারে। মনে হয় দিন দিন আমাদের সমস্ত জীবনটাই যেন কেমন কৃত্রিম আর ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আর ছেলেরা হয়ে যাচ্ছে একদম শ্রম-বিমুখ।

'জাতীয় দৃষ্টি ভংগী বনাম সরকারী মনোভাব।' এ নামের একটি লেখা দৈনিক সংবাদে পাঠিয়েছিলাম ছাপার জন্য। লেখাটি সংবাদ ছাপাতে পারেনি। গতকাল পাক-সোভিয়েট মৈত্রী সমিতির চট্টগ্রাম শাখা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বেগম সুফিয়া কামালের সাথে সংবাদের সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান খ্যাতনামা লেখক শহীদুল্লাহ কায়সারও এসেছিলেন। তিনি তখন লেখাটি আমাকে ফেরৎ দিলেন। শুধু বল্লেন : আপনি এ লেখায় যাঁদের কথা বলেছেন আমরা এখন তাঁদের তুলে ধরতে চাই না। আমার নিজের লেখা বা বক্তব্য নিয়ে তর্ক করা আমার স্বভাব নয়। তাই নিরুত্তরে লেখাটি ফেরৎ নিলাম। লেখাটি যে ফেরৎ পেয়েছি এতেই আমার আনন্দ। দুঃখ শুধু এ যে লেখা প্রকাশের সুযোগ আমাদের যে ভাবে দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে তাতে ভয় হয় সম্পাদকদের বিপরীত মতামতের কোন লেখাই আর ছাপানো যাবে না। স্বাধীন মতামতের লেখা প্রকাশের সুযোগ যে কিভাবে এখন সীমিত হয়ে এসেছে তা আমার মতো ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা। আমরা লেখকরা লেখার সাহস করলেও সম্পাদকেরা এখন ঝুঁকি নিতে চান না কিছুতেই। অথচ প্রকাশ ছাড়া লেখক লেখক হিসেবে বাঁচতে পারে না কিছুতেই। তাই প্রশ্ন জাগে যে সব লেখক আজো মনের কিছুটা স্বাধীনতা বজায় রেখে লিখতে চায় তাদের অবস্থা কি হবে? লেখক যদি মনের স্বাধীনতা হারায় তা হলে তাঁর আর কি রইল?

৬. ৩. ৬৭

গতকাল রাত্রি সাড়ে ন'টা থেকে কোন এক সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে একটি সাংস্কৃতিক উৎসব হলো। কয়েকদিন আগে ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন সহকারী এসে এ উপলক্ষে তাঁর যে স্মরণিকা বা সভেনির প্রকাশ করছেন তার জন্য সংক্ষিপ্ত বাণীও আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্বোধনও তাঁরা আমাকে দিয়েই করিয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁদের আরো বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান হিসেবে যোগ দিতে হয়েছে—দিয়েছি তাঁদের আমন্ত্রণে ও অনুরোধে। এমন কি এখনো তাঁদের কোন কোন অনুষ্ঠানে আমাকে শরিক হতে হয়। তদুপরি ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃস্থানীয় সবাই আমার পরিচিত। গতকালের এ সাংস্কৃতিক উৎসব দেখতে ও শুনতে আমন্ত্রিত হয়ে যথাসময়, বরং যথাসময়ের কিছু আগে মণ্ডপের দোর-গোড়ায় পা দিতেই আমার হাতে নিমন্ত্রণ-পত্র দেখে ঐ প্রতিষ্ঠানের এক কর্ম-কর্তা ছুটে এসে এক রকম ছোঁ মেরেই আমার হাত থেকে নিমন্ত্রণপত্রখানা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলেন: এ কি! আপনার নিমন্ত্রণ পত্রের কি দরকার? আসুন, আসুন, বসুন।

সঙ্গে সঙ্গে সহকারী প্রধান কর্তা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনিও বল্লেন: বসুন। খোলা মাঠেই মণ্ডপ বা মঞ্চ তৈয়ার হয়েছিল। প্রবেশ পথের দু'পাশে তিন সাড়ি করে চেয়ার বসনো। প্রথম দু'সাড়ির চেয়ারগুলি বেশ বড়, হাতা আর গদিওয়ালা আর কুশনও ছিল কয়েকটা। তৃতীয় সাড়ির গুলি দোকান থেকে ভাড়া করে আনা হাতাহীন কাঠের ছোট ছোট ফোল্ডিং চেয়ার। আমি যখন পৌঁচেছি তখন এ তিন সাড়িতে কোন লোক বসেনি, সব চেয়ারগুলিই খালি।

সহকারী প্রধান আমাকে তৃতীয় সাড়ির কাঠের চেয়ারগুলি নির্দেশ করে সেখানে কোন একটায় বসতে ইংগিত করলেন। আমি তাই করলাম। কিছুক্ষণ পর স্বয়ং প্রধান কর্মকর্তা এসেও আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে গেলেন। একটু পরেই একজন তরুণ পুলিস অফিসার সপরিবারে এলেন (য়ুনিফর্ম দেখেই আমি তা অনুমান করলাম)। তখন সহকারী আর প্রতিষ্ঠান-প্রধান ছুটে এসে অভ্যর্থনা করে সপরিবারে কুশন চেয়ারগুলিতেই তাঁকে আর তাঁর পরিব'র পরিজনদের অত্যন্ত তাজিমের সাথে বসালেন। এভাবে আরো অফিসার, সেমি-অফিসার অনেকেই এসে আমার সামনের দু'সাড়িতে বসলেন অর্থাৎ তাঁদের বসানো হলো।

ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন পরিচিত কেউ কেউ আমাকে দেখে বলে উঠলেন: স্যার, আপনি এখানে কেন, সামনে এসে আরাম করে বসুন। বুড়ো মানুষ শুধু কাঠের চেয়ারে এতক্ষণ বসে থাকতে আপনার কষ্ট হবে।

আমি বল্লাম: না, আমি যাঁদের নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি তাঁরা আমাকে যেখানে বসিয়েছেন, তাঁরা নিজেরা না বল্লে আমি সেখান থেকে অন্যত্র যাই কি করে? আমি তো তাঁদের মেহমান, আমি কোথায় বসার যোগ্য তা তাঁরাই তো তোমাদের চেয়ে ভালো জানেন।

এক আধজন পরিচিত বন্ধু পরিহাস না করেও ছাড়লেন না: ওরা এইমাত্র আপনার বাণী পড়ে শোনাল আর আপনি এখানে সবাইর পেছনে বসে আছেন?

বল্লাম: বাণীর মূল্য থাকতে পারে তাই বলে বাণী-দাতাকেও মূল্য দেওয়ার কোন মানে হয় নাকি এযুগে? কর্তৃপক্ষ কার মূল্য কতটুকু তা ভালো করেই জানেন।

সাহিত্য ছাড়া কোন কোন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান চলে না। তাই দায়ে পড়ে সাহিত্যিকের কিছুটা কদর করতে কর্তৃপক্ষ অনেক সময় বাধ্য

হন, অন্তত মুখরক্ষার খাতিরে। কিন্তু সাহিত্যিক মানুষটাকে তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন নজরে দেখেন। নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরেই সাহিত্যটা তাঁদের কাছে সাময়িকভাবে মূল্যবান হয়ে ওঠে—সাহিত্যিকেরও ব্যবহার হয় সেভাবে।

একজন ক্ষুদে অফিসার যে উপকার বা অপকার করতে সক্ষম, যত বড়ই হোন একজন সাহিত্যিক বা শিল্পী তার শতাংশ করতেও সক্ষম নন। এমনকি তিনি সাহিত্যের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেলেও। কাজেই তেমন অক্ষম সাহিত্যিককে অত আরাম করে কুশন কি গদি আঁটা চেয়ারে বসতে বলার কোন মানে হয় না।

যে কোন অবদানের জন্য সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্তদের সরকারী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে কিছুটা মর্যাদা দেওয়ার রেওয়াজ সব দেশে, সব রাষ্ট্রেই প্রচলিত। যে প্রতিষ্ঠানের কথা এখানে বলছি, তা পুরোপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান, উল্লেখিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিও সে প্রতিষ্ঠানেরই আয়োজিত। যে কারণেই হোক সাহিত্য ক্ষেত্রে আমি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পেয়েছি—উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ম-কর্তাদের তা অজানা থাকার কথা নয়। তবে ভদ্রতা, সৌজন্য ইত্যাদির মতো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও এদের কাছে হয়তো অতি তুচ্ছ। মনে হয় দেশে মূল্যবোধ আজ চরম অবনতির সম্মুখীন।

৩. ৪. ৬৭

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লার বিরাশীতম জন্মদিবস উপলক্ষে, লেখক সঙ্ঘের পূর্বাঞ্চল শাখা, ঢাকার হোটেল কন্টিনেন্টালে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য আয়োজন করেছিল গত ৩০শে মার্চ। আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম কিছু বলার জন্য। বক্তা ছিলাম আমরা চারজন: ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, কবি জসিম উদ্দীন আর আমি। সভাপতি ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক।

যদিও রক্তের চাপ আমার স্থায়ী ব্যারাম, তবুও গত কয় বছর আমি বেশ ভালই ছিলাম। অনেক বড় বড় সভা করেছি, বক্তৃতা

দিয়েছি—রক্ত-চাপের তেমন প্রকোপ বা আক্রমণ বোধ করিনি। হোটেল কন্টিনেন্টাল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, তবুও এদিন আমার লিখিত ভাষণ পাঠের মাঝখানে হঠাৎ আমার মাথা ঘোরা শুরু হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম রক্তের চাপ বেড়ে চলেছে। পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে টেবিল ধরে বসে পড়লাম। কেউ কেউ ছুটে এসে মঞ্চের উপরই আমাকে শুইয়ে দিলেন, কেউ কেউ চোখেমুখে পানির ছিঁটা দিতে লাগলেন, পানি খাওয়ালেন, মাথায় বাতাস করতে লাগলেন। সুফিয়া কামাল ছুটে এসে মাথার কাছে বসে পড়ে কার হাত থেকে একটি খবরী কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। শহীদুল্লাহ সাহেব অনেক দোয়া-দরূদ পড়ে আমার দু'কানে দিলেন অনেক ফুঁ, কে একজন তাঁকে পানি-পড়া দিতেও বল্লেন। পানি-পড়া তিনি দিয়েছিলেন কিনা আমিও খেয়েছি কিনা সে হট্টগোল আর জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে আমার মনে থাকার কথা নয়। তবে পানি খেয়েছি কয়েকবার। কে যেন মেডিকেল কলেজে ফোন করে দিয়েছিলেন --অল্পক্ষণের মধ্যেই এম্বুলেন্স এসে হাজির। যাই হোক এ যাত্রা ষ্ট্রোকের ধাক্কাটা যেন একটা হুসিয়ারী মাত্র জানিয়ে দিয়ে ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। আস্তে আস্তে অবস্থা আমার স্বাভাবিক হয়ে এলো, বোধ করতে লাগলাম সুস্থ। এম্বুলেন্সে চড়ে হাসপাতালে আর যেতে হলো না সেদিন।

ডক্টর এনামুল হক, শওকত ওসমান আর আহমদ হোসেন সাহেব সঙ্গে এসে কবি আবদুল কাদিরের বাসায় আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এনামুল হক সাহেব তাঁর বাসায় নিয়ে যেতে পীড়া-পীড়ি করেছিলেন, আমি কিন্তু গেলাম না। এ যাত্রাও কাদিরের বাসায় উঠেছিলাম, সেখানেই রয়ে গেলাম! পরদিন বিকেলের ট্রেনে সীট্ পাওয়া গেল, ফিরে এলাম চাটগাঁ, নিজের আস্তানায়।

গতদিনের খবর কাগজে বেরিয়ে গিয়েছিল—আত্মীয়-বন্ধু আর হিতৈষীরা সে খবর পড়ে স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সে জন্যই ঢাকায় একদিনও দেরী না করে আমার তাড়াতাড়ি ফিরে আসা। ঐদিন আমার খবর নিতে আলাউদ্দীন-আল আজাদ সস্ত্রীক আমার বাসায় এসে শুনেছেন যে, আমি বিকেলের ফ্লাইটেই ফিরে আসছি। প্লেন না আসা পর্যন্ত তাঁরা আমার বাসায় রয়ে গেলেন। পি, আই, এ, অফিস আমার বাসার খুব কাছেই। আমাকে ওখান থেকে আসতে দেখে আজাদ ছুটে এসে রাস্তার উপরই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন! তারপর টুক্ করে আমার পায়ে হাত দিয়ে একটা শোকরিয়া সালামও করে বসলেন। আমাকে ফিরে পেয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস যেন থামতেই চায় না, ওর স্ত্রী জমিলারও সে একই দশা। অকৃত্রিম ভালোবাসা বোধ করি এমনিই অবুঝ ও বাঁধভাঙ্গা আত্মপর বিবেচনাহীন।

২৮. ৪. ৬৭

গত রাত্রে রেডিয়োতে ঘোষিত হয়েছে, আজ কাগজে নিজেও স্বচক্ষে দেখলাম, আমার 'রেখাচিত্র' বইটা ১৯৬৫-৬৬ তে প্রকাশিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য বই হিসাবে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছে। মনে হয় বইটি শুধু সাধারণ পাঠকের নয়—বিশেষজ্ঞদেরও ভালো লেগেছে। যে কোন লেখকের জন্য এ এক বড় রকমের আনন্দের কথা। 'রেখাচিত্র' ধারাবাহিক মাসিক সওগাতে বেরিয়েছিল—আমার সাহিত্যিক জীবনে সওগাতের দান অবিস্মরণীয়। শেষ জীবনেও সওগাতের পৃষ্ঠা বেয়েই আমি নতুন ভাবে সম্মানিত হলাম। লেখক তৈরী করা, লেখককে বিকাশের সুযোগ দেওয়া যে কোন সাহিত্য সাময়িকীর এক বিশেষ ভূমিকা। সওগাত আমাদের অনেকের বেলায় সে ভূমিকা পালন করেছে। সওগাত কোনদিন বন্ধ হয়ে গেলেও সওগাত ইতিহাসে থেকে যাবে।

৩. ৫. ৬৭

গতকাল ডাকে এক অপরিচিতা মেয়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। মেয়েটির নাম মিস নিবেদিতা ·· সিলেট থেকে লিখেছে, পরিচয় দিয়েছে ও ওখানকার এক কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে এক কবিতা লিখে আর কলেজের সভায় তা পাঠ করে ও দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে। কলেজের অধ্যাপকরাই ছিলেন বিচারক। পরে জনৈক সিনিয়র অধ্যাপক নাকি অভিযোগ করেছেন, ওর লেখা কবিতাটিতে রাষ্ট্র-বিরোধী কথা আছে। ফলে ঘোষিত পুরস্কার বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, তদুপরি ওকে দণ্ড দেওয়ার কথাও নাকি এখন কলেজ কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন। চিঠির সঙ্গে কবিতাটির একটি নকলও মেয়েটি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কবিতাটিতে আমি রাষ্ট্র-বিরোধী কোন কথাই খুঁজে পেলাম না। কবি মতিউল ইসলাম আর কবি আল-মাহমুদকেও আমি উক্ত কবিতাটি দেখিয়েছি—তাঁরাও তাতে এমন কিছু দেখতে পেলেন না যাকে রাষ্ট্র-বিরোধী বলে সনাক্ত করা যায়। বলা বাহুল্য, এঁরা দু'জনেই প্রতিষ্ঠিত কবি এবং রাষ্ট্রের অত্যন্ত অনুগত নাগরিক। একজন ত বড় দরের সরকারী চাকুরী করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে এ রকম কবিতা হর হামেশাই লেখা হয়ে থাকে আর এমন কবিতায় মাতৃভাষা আর রক্তদানের কথা থাকেই। অধিকন্তু এ দিনটি এখন সরকারীভাবেও স্বীকৃতি পাচ্ছে। সরকারী কলেজে ঐ দিনের স্মরণে অনুষ্ঠান তারই প্রমাণ।

চিঠি পড়ে মনে হলো মেয়েটি খুবই ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে পড়েছে, তাই তার কবিতা সম্বন্ধে আমার মতামত জানিয়ে আর তাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়ে একখানা চিঠি সেদিনই লিখেদিলাম। সে সঙ্গে এও লিখলাম: শিক্ষক আর অধ্যাপকরা পুলিশের দারোগা বা দণ্ডদাতা নন, ছাত্র-ছাত্রীদের পথ দেখানোই তাঁদের প্রধান কাজ।

ছাত্র-ছাত্রীরা কোন ব্যাপারে যদি ভুল করে থাকেও, তা দেখিয়ে দিয়ে সংশোধন করে দেওয়াই তাঁদের প্রধান দায়িত্ব। অধ্যক্ষ-অধ্যাপকেরা কিছুটা সহিষ্ণু আর উদারমনা না হলে সামান্য ব্যাপার নিয়েই তাঁরা তিলকে তাল ক'রে চার পেয়ালায় এক একটা তুফান তুলে বসেন। এ ঘটনাটি তারই যেন এক নজির। পরে শুনেছি, এ অপরাধে কিনা জানি না, মেয়েটিকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও মেয়েটিকে আমি কোনদিন চাক্ষুষ দেখিনি তবে তার অনেক লেখা—কবিতা আর গল্প, বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হতে দেখেছি। সে কারণেও, তার প্রতি কিছুটা সহানুভূতি হয়তো আমার রয়েছে। শুধু সহানুভূতিই, তার বেশী কিছু করার সাধ্য আমার নেই। এ কথাটুকুও বোধ করি মেয়েটিকে লিখে দিয়েছিলাম সেদিন।

৫. ৫. ৬৭

আজ সকালে হঠাৎ এক তরুণ এসে হাজির—ঢুকেই আমার পায়ে হাত দিয়ে এক লম্বা সালাম। লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত ছিলাম, বাধা পড়ায় মনটা বিগড়ে গেল। অপরিচিত মুখ দেখে কিছুটা অবাকও হলাম। নাম বল্লে গোলাম মোস্তফা, বাড়ী আমার নিজের থানায়। আর জানালে চাকুরী করে সি, এণ্ড বি,তে—থাকেও সেদিকে তার অফিসের কাছকাছি, আমার থেকে অনেক দূরে। এ সাত সকালে সেখান থেকেই এসেছে ছুটে। চেয়ারটা কাছে টেনে এনে, ঘনিষ্ঠ হয়ে আমার কাছে ঘেঁসে, প্রায় গোপন কথা বলার সুরে বল্লে, সে নাকি গত রাত্রে এক স্বপ্ন দেখেছে।

বিস্ময়ের সঙ্গে বল্লাম: বেশ ভালো কথা। স্বপ্ন ত সবাই দেখে। তাতে আমি কি করতে পারি? আমার কাছে কেন...?

লোকটি বল্লে: স্বপ্ন ভাঙ্গতেই কিন্তু সর্বাগ্রে আপনার কথাই মনে পড়ল, আপনার চেহারাটাই ভেসে উঠল মনের সামনে। তাই স্বপ্নটা আপনাকে বলতে ছুটে এসেছি।

অগত্যা বল্লাম : বলুন, শুনি আপনার স্বপ্ন।

তরুণটি তেমনি চাপা আর গোপন সুরে বলে গেল তার স্বপ্ন। দেখলাম তেমন কিছু অভিনব কিছু নয়। এক হাতী তাকে পিঠে তুলে নিয়ে পথ চলতে লাগল। চলতে চলতে এক অতি সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির সামনে পৌঁছে তাকে আলগোছে পিঠ থেকে নামিয়ে দিলে হাতীটা। সামনে একটা ঘরের খোলা দরজা দেখতে পেয়ে ও তাতেই ঢুকে পড়লে। দেখতে পেলে একটি যুবতী মেয়ে এক মনে কোরআন শরিফ পড়ছে। ওকে দেখে মেয়েটি প্রথমে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, পরে শান্ত কণ্ঠে বল্লে : আমি তোমার মা হই। এরপর ওর ঘুম গেল টুটে। সংক্ষেপে এ ওর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত। এটুকু শোনাতে সে পাঠানটুলি থেকে ছুটে এসেছে কাজীর দেউড়ী! কি আর করা যায়। বল্লাম : এত খুব ভালো স্বপ্ন। হাতী ত চিরকালই শুভের প্রতীক, সেকালে অপুত্রক রাজারা হাতীর সাহায্যে পুত্র বা ভাবী উত্তরাধিকারী সংগ্রহ করতেন আর কোরআন পাঠরত মেয়ে লোক ত আরো বেশী শুভের লক্ষণ। মনে হয় আপনার ভালো হবে, শুভ হবে। হয়তো আজ অফিসে গিয়েই শুনবেন যে আপনার প্রমোশন হয়েছে, এমনও হতে পারে যে একদিন আপনিই হয়তো আপনার অফিসের বস্ হয়ে বসেছেন।

এ সব সাত পাঁচ বলে কোন রকমে ওকে বিদায় করে তবে রেহাই পেলাম। ভয় ছিল পাছে আবারও না একদিন এসে পড়ে কারণ স্বপ্নের ত কোন শেষ নেই—অনেকে রোজও ত স্বপ্ন দেখে। সুখের বিষয় ওর শুভাগমন আর হয়নি। যত খুশী স্বপ্ন ও দেখুক কিন্তু জেগে উঠে আমার কথাটা আর মনে না পড়লেই বাঁচোয়া!

৭. ৫. ৬৭

হিন্দু পুনর্জীবনবাদীদের লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি।
শিখর গুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি ?

আমাদের সমাজেও পুনর্জীবনবাদীর অভাব নেই। মনে হয় তাঁদের সংখ্যা এখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যে অতীতে ফিরে যাওয়া বা যে অতীতকে ফিরে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, সে অতীতের জাবর-কাটাতেই দুর্বল মানুষ সব সময় সান্ত্বনা খুঁজে পায়। নতুন কিছু করার সামর্থ যাদের নেই তারাই হয়ে থাকে পুনর্জীবনবাদী।

৯. ৫. ৬৭

সকালের বেড়ানটা সেরে বসে আছি নিজের পড়ার ঘরে। তখন কানে ভেসে এল সমবেত কণ্ঠের আল্লাহু আকবর আর জিন্দাবাদ ধ্বনি। তাকিয়ে দেখলাম ট্রাক আর বাস-ভর্তি লোক ষ্টেশন-মুখো যাচ্ছে—সকালের মেল ট্রেনে কোন এক বিত্তশালী হজ্বযাত্রী হজ্ব করে ফিরে আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। এ আওয়াজ তারই আগাম মহড়া। হাজী সাহেবের নাম লেখা একটা চওড়া লাল শালুও টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে সব ক'টা ট্রাক আর বাসের সামনে। ট্রাক-বাসের আরোহীদের কারো কারো হাতে কাগজের মালা আর লাল নীল নিশান।

এ দৃশ্য আমি আগেও দেখেছি, দেখেছি রেল ষ্টেশন আর পতেঙ্গা এয়ারপোর্টে। এটি গত কয়েক বছরের উন্নয়ন। হজযাত্রীদের আত্মীয় স্বজন মিলে আগ্ বাড়িয়ে দেওয়া আর আগ্ বাড়িয়ে নেওয়া আগেও সমাজে রেওয়াজ ছিল। তখন তাতে—যিনি হজ করতে যাচ্ছেন বা হজ করে ফিরে এলেন তাঁর ত কথাই নেই, অন্যদেরও ব্যবহারে একটা বিনয় আর আত্মনিবেদনের ভাব ফুটে উঠতো। এখন এটা একটা রীতিমতো শো আর প্রদর্শনীর ব্যাপার হয়ে উঠেছে। হজ করা ত নয়, এও যেন

এক ইলেকশন-জেতা। রাজনৈতিক আওতার বাইরে আগে শ্লোগান আর মিছিল অজ্ঞাত ছিল। এখন রাজনীতির অনুকরণে স্রেফ ধর্মীয় ব্যাপারেও মিছিল শ্লোগান, ফুলের মালা এমন কি ক্যামেরাও রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। ধর্ম আর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে এখন বিনয় আর আত্মনিবেদনের কোন সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্মকে এখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে অহরহ ব্যবহার করা হচ্ছে, এমনকি অকারণেও রাজনৈতিক বক্তৃতায়ও তোলা হয় ধর্মীয় জিকির। তবুও আশ্চর্য, ধর্ম রাজনীতিকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারছে না বরং উল্টো ধর্মই দিন দিন রাজনীতির খপ্পরে পড়ে বিকৃত হয়ে, রাজনীতির ধরন ধারণই এখন চেপে বসছে ধর্ম আর ধর্মীয় ব্যাপারের উপর। এতে রাজনীতি দুর্বল হচ্ছে আর ধর্মের উদ্দেশ্য যে আত্মনিবেদন, তা বিসর্জিত হয়ে সে জায়গায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, আত্মপ্রচারণা। বিনয় আর উপাস্যে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে এখন ধর্ম হয়েছে আত্মম্ভরিকতা আর লোকরঞ্জনের বিষয়, ফলে ধর্ম এখন মানুষের জীবন ছেড়ে আশ্রয় খুঁজছে মসজিদ আর হজ্বে, কারো কারো হাতের তসবিহ আর মাথার টুপিতে।

১১. ৫. ৬৭.

রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এক স্থানে লিখেছেন: 'যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিক ভাবে দেখাই সঙ্গত।' চিন্তা করতে করতে লেখা কথাটা যে কোন লেখকের জন্য অত্যন্ত মুল্যবান। অনেক লেখক লেখার প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও চিন্তা করে না-লেখার ফলে বিভ্রান্তি ও পরস্পর বিরোধিতার শিকার হয়ে পড়েন। তাঁদের লেখায় চিন্তার সঙ্গতি যেমন দেখা যায় না তেমনি দেখা যায় না কোন ক্রম পরিণতিও। তাঁরা লিখতে পারেন বা লিখতে জানেন বলেই লেখেন, নিজের মানস চেতনার তাগিদে সামাজিক কিম্বা মানবিক কোন সত্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখেন না।

দেখেছি অনেকেই ভালো লেখেন—গল্পে কিম্বা অন্যতর রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন, দিচ্ছেনও। কিন্তু তেমন চিন্তা করে লেখেন না বলে অনেক সময় রচনায় তাঁরা চূড়ান্ত অসঙ্গতির পরিচয় দিয়ে থাকেন। ফলে তাঁদের রচনায় আত্মপ্রত্যয়ের কোন স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় দেখা যায় ক্ষমতার রঙ বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও মনের আর রচনার রঙ বদলায়। সত্যিকার লেখকের জন্য এ এক বিড়ম্বিত ভূমিকা।

১৪. ৫. ৬৭.

প্রায় নব্বই বছর বয়সে কবিয়াল রমেশ শীল মারা গেলেন—কিছুদিন আগে। গত ২২ শে বৈশাখ (১৩৭৪) অর্থাৎ ৬ই মে, ১৯৬৭, তাঁর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁর স্বগ্রাম গোমদণ্ডীতে গ্রামবাসীরা একটি শোক সভার আয়োজন করেছিল। ঐ সভায় আমাকেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল আর দায়িত্ব পড়েছিল আমার উপর স্মৃতি-ফলক স্থাপনের। তখন অতি সংক্ষেপে যে কয়টি কথা বলেছিলাম তা এখানে উধৃত হলো :

অনেক দিক দিয়েই রমেশ শীল ছিলেন এ যুগের এবং এ দেশের মানুষের কণ্ঠস্বর। তাদের নানা বাসনা-কামনা, আশা-আশঙ্কা, পাওয়া না-পাওয়ার ব্যথা বেদনা, ঐহিক ও পারত্রিক আকুতি সব কিছুই একদিন তাঁর কণ্ঠে কবিতা আর সংগীত হয়ে বেজে উঠেছিল ওদের নিজস্ব বোধগম্য ভাষা আর পরিচিত রূপকল্পে। ওদের প্রতিদিনের হাজারো কথা আর সমস্যা রূপ পেয়েছিল তাঁর কবিতার ভাষা আর মিলে, গানের সুর আর সংখ্যাতীত কবি আসরের বাক-যুদ্ধে। তিনি ছিলেন এক জাগ্রতচিত্ত সংগ্রামী শিল্পী। তাঁর পরে আমাদের আর তেমন কোন দ্বিতীয় লোক-শিল্পী রইল না।

সর্বতোভাবে তিনি ছিলেন মাটির মানুষ, তাঁর সম্পর্কও ছিল মাটির মানুষদের সঙ্গেই। জীবনও কেটেছে তাঁর ওদের মাঝেই।

ওদেরই মুখপাত্র ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে ওদেরই ক্ষতি হলো সব চেয়ে বেশী। তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে আমাদের পল্লী-সংস্কৃতির একটা বিরাট দিক ধসে পড়লো। তাঁর আগে কবি-গান ছিল কিছুটা মোটা রস আর সস্তা আনন্দের বস্তু। তিনিই প্রথম দেখালেন স্থূল রস আর আনন্দ পরিবেশন ছাড়া, কবি-গান জনগণের সংগ্রামী জীবনে ও হতে পারে পাথেয়, জনগণকে জীবন সমস্যা সম্বন্ধে জাগ্রত আর সচেতন করে তোলারও এ হতে পারে উত্তম বাহন। তাঁর কবি গানের উৎস ছিল জীবন, জীবন থেকেই তার উৎপত্তি, জীবনের জন্যই তা রচিত আর জীবনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মতো এমন জীবন-বাদী শিল্পী আমাদের পল্লী-সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি মিলবে কিনা সন্দেহ।

তাঁর জীবনবোধ আর সাধনায় একনিষ্ঠা আমাদের তরুণদের অনুপ্রাণিত করুক। তাঁর এ সমাধি আর স্মৃতি-ফলক দেশের সামনে বিরাজ করুক শুধু এক জড়-বস্তু হিসেবে নয় তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা আর মানবিক আদর্শের জীবন্ত প্রতীক হয়েই।'

রমেশ শীল সম্বন্ধে ভাবলে কিছুটা বিস্মিত হতে হয়। হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরে তাঁর জন্ম। ঐ স্তরের মানুষ সাধারণত গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত। রমেশ শীলের জীবনধারা আর চিন্তা ভাবনা কিন্তু মোটেও গতানুগতিক ছিল না। দেশের সব জীবন চেতনাকে আত্মস্থ করার আর তাতে নিজেকে একাত্ম করে দেওয়ার এমন একটা মনো ভাব আর দৃষ্টি ভঙ্গী তিনি কি করে যে জীবনের শুরুতেই পেয়েছিলেন তা ভেবে দেখলে রীতিমতো অবাক হতে হয়। কারণ তখন দেশের আর তাঁর নিজ সমাজের চিন্তাধারা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আধ্যাত্মিক সাধনা আর উপলব্ধির ক্ষেত্রেও তিনি স্বসমাজের গণ্ডী-রেখা মানেননি। তাঁর কবিতা আর গানে যেমন একটা বিদ্রোহী মনোভাব সুস্পষ্ট তেমনি তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার ক্ষেত্রেও বিদ্রোহী-চেতনা

লক্ষ্যগোচর। এক মুসলমান সাধকের সাধন-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে তিনি সেখানকারই ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে সাধন-পীঠ মাইজভাণ্ডারে তিনি কাটিয়েছেন দীর্ঘকাল, সেখানেই যেন খুঁজে পেয়েছেন তাঁর আধ্যাত্মিক আকুতির তৃপ্তি আর সেখানকার ভাবনা চিন্তা-বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে দিয়েছেন রূপ সংখ্যাতীত গানে, যা আজো গাওয়া হয়, ওখানকার ভক্ত আর শিষ্যমণ্ডলীতে। যার জনপ্রিয়তা নাকি আজো কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি।

আশ্চর্য, জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি রেখে গেছেন তাঁর বিদ্রোহী চেতনার স্বাক্ষর। দাহ করেই মৃতের সৎকার করা তাঁর সমাজ, ধর্ম, পিতৃপুরুষের যে প্রথা ও সংস্কার তিনি তাও মানেননি—মৃত্যুর আগে তিনি নাকি নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, দাহ না করে তাঁর মৃত-দেহ যেন সমাধিস্থ তথা কবর দেওয়া হয়। এ নির্দেশ পালিত হয়েছিল।

সামাজিক বিধি নিষেধ, সংস্কার ও প্রথা ইত্যাদি যে খুব মূল্যবান বা অলঙ্ঘনীয় তার পরিচয় তাঁর কবিয়াল-জীবন আর আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে যেমন তিনি দিয়েছেন, মনে হয় মৃত্যুতেও সেই স্বাক্ষরই রেখে গেলেন তিনি। অবশ্য এর সঙ্গে তাঁর সাধন-গুরুর প্রতি নিষ্ঠাও মিশে থাকতে পারে। তবে তাঁর মধ্যে সব সময় একটা বিদ্রোহী-সত্তা যে জাগ্রত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ফলে একাধিকবার তাঁকে কারা-যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়েছে।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পল্লী-সাহিত্য আর সাংস্কৃতিক জীবন থেকে এমন একটি অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটলো যা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

১৫. ৬. ৬৮

T. E. Lawrence—যিনি লরেন্স অব্ এরেবিয়া নামে খ্যাত, তাঁর লেখা 'Seven Pillars of Wisdom' ইংরেজি সাহিত্যে

একটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ। সম্প্রতি বইটি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। লরেন্স সম্বন্ধে কলিন উইলসন (Colin Wilson) লিখেছেন: 'His most characteristic is his inability to stop thinking. Thought imprisons him (The Outsider P82)। তাঁকে যখন বাদশাহ ফয়সলের উপদেষ্টা হতে অনুরোধ করা হয়েছিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছেন: 'I hated responsibility ... and that all my life, objects had been gladder to me than persons, and ideas than objects.' প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় তুরস্কের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহের পেছনে যুগপৎ তাঁর হাত আর মস্তিষ্ক সক্রিয় ছিল। যুদ্ধজয়ের পর মিত্রপক্ষ যখন আরবদের প্রতি দেয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ওদেরেও শত্রুপক্ষ হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয় তখন লরেন্স এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তাঁর দেশের বৈদেশিক দফতরের চাকুরি তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে যখন নাইট উপাধি দিতে চাইল বৃটিশ সরকার তিনি তা গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানান। আরবদের প্রতি তাঁর স্বদেশের ব্যবহারে তিনি এত হতাশ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে শেষে নাম ভাঙ্গিয়ে বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রায় আত্মহত্যা করেই বসেন। গতি ছিল তাঁর এক নেশা —এ নেশাই তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আরবদের সম্বন্ধে লরেন্সের অভিজ্ঞতা গভীর ও সাক্ষাৎ - তাঁর রচনার আলোয় আরব চরিত্র সম্বন্ধে আমার যা ধারণা হয়েছে তাই শুধু এখানে বলতে চেষ্টা করলাম। লরেন্স চিন্তা করতেন, চিন্তা করে লিখতেন আর সব চেয়ে বড় কথা আরবদের ভালোবাসতেন তিনি অন্তরের সঙ্গে। তাই তাঁর আরব-চরিত্র অধ্যাযন একজন বিদেশীর পক্ষে যতখানি নিরপেক্ষ আর নৈর্ব্যক্তিক হওয়া সম্ভব তা হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। তিনি লিখেছেন: প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় আরবদের

বিশ্বাসে কোন গোঁজামিল বা অস্পষ্টতা নেই। বিশ্বাসে কঠোরতা আরব-চরিত্রের এক সার্বিক লক্ষণ আর এ বিশ্বাসে নেই কোন রকম জটিলতাও। এ প্রায় সাদা আর কালোর মতই, হয় এটা-না হয় ওটা, মাঝখানে আর কোন রঙের অস্তিত্ব ওদের ধারণায় স্থান পায় না। ওদের বিশ্বাস প্রায় গণিতের মতই স্পষ্ট, অনড় আর সীমিত। সেমিটিক জাতির কল্পনায় অর্ধ-ছবির কোন ঠাঁই নেই।

আদিরঙ-ই ওদের কাছে একমাত্র রঙ, পৃথিবীটা ওদের কাছে স্রেফ সমতলভূমি। বিশ্বাসে তারা গোঁড়া, সন্দেহ সংশয়কে করে ঘৃণা। ওরা কিছুমাত্র মাথা ঘামায়না তত্ত্ব জিজ্ঞাসা বা পরাবিজ্ঞান (Metaphysics) নিয়ে, অন্তরের তথা মনের কোন অদম্য জিজ্ঞাসা ওদের করে তোলে না তোলপাড়। তারা শুধু বুঝে সত্য আর মিথ্যা, বিশ্বাস আর অবিশ্বাস। সূক্ষ্ম কোন সন্দেহে ওদের মন হয় না আন্দোলিত। সব কিছুর চরমেই ওদের তৃপ্তি। অনেক সময় আপোষ করে না কিছুতেই। ওরা সংকীর্ণ আর সীমিত মনা— কোন রকম কৌতূহল জিজ্ঞাসায় ওদের মন-মানস উদ্দীপিত হয় না বলে ওদের মননশীলতা বন্ধ্যা হয়ে থাকে। ওদের কল্পনা শক্তি স্বচ্ছ কিন্তু সৃষ্টিশীল নয়। এশিয়ায় তাদের কোন শিল্প কর্মের অস্তিত্ব নেই বল্লেই চলে অথচ তারা উদার হস্তে স্থাপত্য, কারুকলা, প্রতিবেশী আর দাসদের হস্ত-শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে দীর্ঘকাল ধরে। তারা কোন বড় রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠান (Industry) গড়ে তোলেনি, পরিচয় দেয়নি কোন রকম সংগঠন শক্তিরও। তারা আবিষ্কার করেনি কোন দার্শনিক পদ্ধতির বা জটিল কোন পুরা-কাহিনীও (Mythology)। গোত্রদেবতা আর পর্বত গুহা—এ দু'য়ের মাঝখানেই সীমিত ওদের জীবনের আনাগোনা। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ওদের মনে স্থান পায় না, জীবনের কাছ থেকে যা পায় তাকেই ওরা মেনে নেয় স্বতসিদ্ধের মতো। মনে করে ঐ নিয়তি, যা যাবে

না কিছুতেই হঠানো। আত্মহত্যা ওদের কাছে অসম্ভব ঘটনা, মৃত্যুতেও ওরা হয় না শোকাভিভূত।

হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া, একটা আলোড়ন বা বিদ্রোহ করে বসা নানা ভাব মনে পোষণ করে রাখা আর ব্যক্তিগত প্রতিভাই ওদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। প্রতিদিনের শান্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ওদের আন্দোলন আলোড়ন দেখায় বড্ড নির্মম। সাধারণ জনতার তুলনায় ওদের মহতেরা বেশী মহৎ। ওরা বিশ্বাস করে সহজ প্রবৃত্তিতে অথচ কাজ করে ঝোঁকের টানে। ওদের সব চেয়ে বড় উৎপন্ন দ্রব্য ধর্ম-বিশ্বাস বা Creed—প্রায় সব ক'টা প্রেরিত ধর্মেরই তারা এক চেটিয়া মালিক। এর তিনটি আজো টিকে আছে—দু'টি বাইরে অ-সেমিটিক জাতির কাছেও হয়েছে রপ্তানি। এ সবের প্রভাবে গ্রীক-ল্যাটিন আর টিউটনিক ভাষা সমূহের ভাবধারা হয়েছে পুষ্ট। গ্রীক ধর্ম য়ুরোপ আমেরিকায় আর ইসলামের নানা রূপ এশিয়া আফ্রিকার বহু অংশে হয়েছে সম্প্রসারিত। সর্বসাকুল্যে এ হচ্ছে সেমিটিক জাতির সাফল্য। তাদের অসাফল্য তাদের জীবনের মধ্যেই হয়ে আছে গণ্ডীবদ্ধ। এদের ধর্মবিশ্বাস মানে দাবী (Assertions), যুক্তি নয়। কাজেই দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য নবী (বা নেতা) চাই। আরবদের মতে চল্লিশ হাজার নবী এসেছিলেন-- আমরা মাত্র কয়েক শ'র নাম জানি। তাঁর কেউই মরুভূমি বেদুইন নয়—কিন্তু জীবনের গতি ছিল সবাইর একই রকম। তাঁদের জন্ম জনাকীর্ণ স্থানে, পরে অদৃশ্য এক আকুতি ওঁদের নিয়ে গেছে নির্জন মরুভূমিতে কিম্বা পর্বত গুহায়। সেখানে দীর্ঘদিন ধ্যানে ও উপবাসে কাটিয়ে তাঁরা ফিরে এসে প্রচার করেছেন নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস। বিখ্যাত তিন ধর্ম-প্রবর্তকেরই জীবনের এ একই বৃত্ত-রেখা। সব ক'টি সেমিটিক ধর্ম-বিশ্বাসের মূল দাবী: দুনিয়া তুচ্ছ। বস্তুর প্রতি এ সব ধর্ম-প্রবর্তকদের ছিল প্রবল অনীহা, তাঁরা প্রচার করেছেন রিক্ততা,

ত্যাগ আর দারিদ্র। এর ফলে ওখানকার তথা মরুভূমির মানুষ-গুলির মন হয়ে পড়েছে অতি নির্মমভাবে পঙ্গু।

আরবেরা জীবনের সৌরভ আর বিলাস থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে এমন বস্তুর দিকে যাতে মানব জাতির নেই কোন হাত বা অংশ। জীবনের আনন্দ আর বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, ব্যক্তিগত মুক্তির সন্ধানে সে নিজেকে বহু কিছু থেকে করে বঞ্চিত, এমনকি তার জন্য ক্ষুধা আর মৃত্যুকে বরণ করতেও সে করে না দ্বিধা। দারিদ্র সে বরণ করে কিন্তু তাতে খুঁজে পায় না কোন মহত্ত্ব, তাই কফি, স্বচ্ছ পানি আর মেয়ে মানুষ যা এখনো তার করায়ত্ত, তা ভোগ করতে তার আপত্তি নেই, জীবনে সে পায় প্রচুর আলো হাওয়া, ঝড়-রৌদ্র, খোলা প্রান্তর আর বিরাট শূন্যতা। বলা বাহুল্য, এতে মানব-শ্রমের কোন লক্ষণ নেই। ওদের প্রকৃতি অনুর্বর, উপরে শুধু আকাশ, নীচে অকলঙ্ক মাটি। এ অবস্থায় অজ্ঞাতেই সে আল্লার নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ্ তার কাছে নররূপী নয় (অর্থাৎ তার পক্ষে আল্লায় নরত্বারোপ সম্ভব হয় না) সাকারও নয়, নৈতিকও নয়। বিশ্ব বা তার সঙ্গেও আল্লাহ্ সম্পর্কহীন এমনকি প্রাকৃতিকও নয়, শুধু এক সত্তা যা অনাবৃত নয়—বরং আবৃত থাকা বা রাখায় যার অভিষেক। এ এক সর্বব্যাপক সত্তা, সব কর্মের উৎস-মুখ, আয়নার মত যার প্রতি-ফলন প্রকৃতি আর বস্তুতে।

বেদুইন ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে অক্ষম, সে নিজেই ঈশ্বরে বিরাজমান—এ ধারণাই তার বদ্ধমূল। ঈশ্বরই তার কাছে সব চেয়ে বিরাট, ঈশ্বর আর তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত ছাড়া অন্য কোন ধারণাই স্থান পায় না তার মনে। আবার এ মরুবাসীদের ঈশ্বরে ঘরোয়া ভাবও আছে, ওদের খাওয়া-দাওয়া, যুদ্ধ-বিগ্রহ দৈহিক

কামনারও এ অংশ। তাদের তুচ্ছতম চিন্তারও কেন্দ্র তিনি, তাদের সব কর্মেরই যেন তিনি সাথী। ঈশ্বরকে তাদের তুচ্ছতম ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর দৈহিক কামনার সাথে যুক্ত করতেও ওরা বোধ করে না কিছুমাত্র সংকোচ। ওদের সবচেয়ে পরিচিত শব্দ : আল্লাহ্। তুচ্ছ আর কুৎসিত ব্যাপারেও অনবরত ব্যবহারের ফলে এ শব্দ তাদের কাছে সব আবেদন হারিয়ে বসেছে।

মরুভূমির যে ধর্ম বিশ্বাস বা creed তা ভাষায় বা ভাবে প্রকাশ করা যায় না। দিগন্তপ্রসারী শূন্যতায় থাকতে থাকতে মানুষকে অনিবার্যভাবেই ঈশ্বর-চেতনার দিকে নিয়ে যায়—মনে হয় জীবনের এ একমাত্র দ্বন্দ্ব আর একমাত্র আশ্রয়। তাই যাযাবর মাত্রেই একটা প্রেরিত ধর্ম-বিশ্বাসের উপলব্ধি দেখা যায় আর মনে হয় সেটা যেন তার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই আহৃত। প্রতিটি সেমেটিক বিশ্বাসেই জোর দেওয়া হয় পৃথিবীর শূন্যগর্ভতায় আর ঈশ্বরের পূর্ণতায়। আর যার যেমন ক্ষমতা আর সুযোগ-সুবিধা তার মধ্যে এ সবের প্রকাশও ঘটে সেভাবে।

মরুবাসী তার ধর্ম বিশ্বাসের জন্য কিছুমাত্র কৃতিত্ব দাবী করতে পারে না কারণ তার ধর্ম বিশ্বাস তার নিজস্ব কোন মননের ফল নয়। জীবনের সব রকম সুপ্ত জটিল সম্ভাবনা আর পৃথিবী থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েও নিজেকে শুধু ঈশ্বরেই সংহত আর সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে। সম্পদ আর প্রলোভনের সংস্পর্শে এলেই তার ঐ সব শক্তি নিশ্চয়ই বিকাশের সুযোগ পেত। একটি সুনিশ্চিত ও শক্তিশালী আশ্রয় যে সে খুঁজে পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু সে আশ্রয় কত সংকীর্ণ!

জীবনের বন্ধ্যা অভিজ্ঞতা তাকে সত্যিকার করুণা থেকেও রাখে বঞ্চিত। নিষ্ফলতা প্রতিমূর্তিতে গা ঢাকা দিতে চায় বলে তার মানবীয় সহানুভূতিও অনেক সময় নিয়ে থাকে বিকৃত রূপ।

স্বেচ্ছাকৃত সংযমের আনন্দ থেকে মরুভূর আরব থাকে বঞ্চিত—তাই সে ত্যাগ আর নিজেকে বঞ্চিত করার মধ্যে খোঁজে বিলাসিতা। মরুভূমি যেন তার এক আধ্যাত্মিক তুহীন-গৃহ—আল্লার তৌহিদ চিন্তা তাতে অবিকৃত থাকে বটে কিন্তু যুগযুগান্তর ধরে তার কোন উন্নতি কি অগ্রগতি সাধিত হয় না।

মরুভূর এ বিশ্বাস নগর জীবনে অচল।

দড়ির মতো যে কোন একটা ভাবের সুতোয় আরবদের অতি সহজে আন্দোলিত করা যায়—যে কোন একটা ভাব বা Idea-ই ওদের জন্য যথাসর্বস্ব। প্রয়োজন হলে তার জন্যে তারা জান দিতে আর নিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি কি যুক্তির সাহায্যে তা বিচার করে দেখে না মোটেও। ফলে বার বারই তাকে দুঃখ পেতে হয়, হতে হয় পরাজিত।

(এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে ইসরাইলের সঙ্গে তার সংগ্রামের শোচনীয় পরিণতির একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।)

লরেন্স আরবদের এ তিনটা যুদ্ধনীতির কথাও উল্লেখ করেছেন : প্রথম নীতি—মেয়েদের আঘাত হানা নিষেধ। দ্বিতীয় যে সব শিশু আর কিশোরের যুদ্ধ করার বয়স হয়নি তাদের দিতে হবে রেহাই আর তৃতীয় নীতি—যে সব সম্পদ হস্তান্তর করা যায় না তা ত্যাগ করতে হবে অক্ষত অবস্থায়। এত সব মহত্ত্ব সত্ত্বেও দুঃখের বিষয় আরব আজ সব জাতির পেছনে পড়ে আছে আর জীবন-যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে পদে পদে। মনে হয় যুগ জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানে ব্যর্থ হলে মহৎ গুণও কোন কাজে আসে না। বরং উপহাসের মত শোনায়। আরবদের বেলায় তাই হয়েছে।

১৮. ৫. ৬৭

বৈচিত্র জীবনী-শক্তির পরিচায়ক। মানুষের ক্রিয়াকর্মের এ বৈচিত্র না থাকলে ধীরে ধীরে তা জড়-অভ্যস্ততায় পরিণত হয়।

ফলে শুধু যে মনের সৃষ্টি-ধর্মিতা কমে আসে তা নয়, গোটা সমাজও হয়ে প'ড়ে নির্জীব, হারিয়ে বসে জীবনের সব স্পন্দন। তাই সাহিত্যে বৈচিত্র অপরিহার্য—কারণ সাহিত্যই জাতীয় মানসকে সজীব আর সচেতন রাখে, জোগায় সজীব আর সচেতন থাকার খোরাক: সভ্যতা শুধুমাত্র কয়েকটি সরল নীতি-বাক্যের উপর নির্ভর করে না, যেমন সত্য কথন কিম্বা চারিত্রিক সততায়। সভ্যতাও বিচিত্র আর বহুমুখী। সভ্যতার প্রধান বাহন সাহিত্য বলে তাই সাহিত্যকেও বৈচিত্র-সন্ধানী হতে হয়। সাহিত্যের এক বড় কাজ মানুষের আবেগকে জাগানো। আবেগ মানব চরিত্রকে দিয়ে থাকে মাহাত্ম্য আর মহৎ-কর্মের প্রেরণা।

Anaesthetics তথা অবেদনকের আবিষ্কর্তা সিমসনের (James Young Simpson) সারা বাল্যকাল কেটেছে শেক্সপিয়র আর বাইবেল পড়ে। তিনি যখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র তখন অস্ত্রোপচারের সময় এক হাইলেণ্ড রমণীর আর্ত চীৎকার তাঁকে এমন অভিভূত আর দিশেহারা করে তুলেছিল যে তিনি তক্ষুণি ক্লাস ছেড়ে এক দৌড়ে পার্লিয়ামেণ্ট ভবনে গিয়ে হাজির হন আর সরকারের কাছে দাবী জানান তাঁকে অন্তত একটা কেরাণীর চাকুরি দিয়ে অমন নির্মম ডাক্তারী পড়ার হাতে থেকে যেন রেহাই দেওয়া হয়। সব দেশের মানুষের জন্য পরম সৌভাগ্যের কথা—কেরাণীর চাকুরি তাঁর হয়নি। অগত্যা বাধ্য হয়ে তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয়েছিল চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নে।

ফিরে এসে সিমসন সে রাত্রেই ডায়রিতে লিখেছিলেন: Can anything be done to make operations less painful? সাহিত্য-পাঠ সিমসনের মনে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিকে তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছিল। তার ফলেই বেদনার্তের আর্ত চীৎকার তাঁকে করে তুলেছিল অমন উতলা আর মনে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল এক

প্রবল জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসারই উত্তর এনেসথেটিক্‌সের আবিষ্কার। আবেগ এভাবে নিত্য নতুন জ্ঞান আর সভ্যতার পথ রচনায় করে থাকে সহায়তা।

১৯. ৫. ৬৭

বলাবাহুল্য, আবেগের একটা ক্ষতির দিকও আছে—আবেগ অনেক সময় এক-রোখা আর এক-চোখা হয়ে বহু ক্ষতির কারণ হয়েও দাঁড়ায়। তাই আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় বুদ্ধি আর যুক্তির সাহায্যে—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি এর সহায়ক। অনিয়ন্ত্রিত আবেগ মানুষকে যে শুধু অন্ধ করে তোলে তা নয়, বরং এর ফলেও মনে করে সব সত্যের একচেটিয়া মালিকানা তারই দখলে। বিশেষ করে ধর্ম আর ধর্ম-বিশ্বাসের বেলায় মানুষ এত বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে যে, সে বিনা দ্বিধায় মনে করে তার নিজের ধর্মই পৃথিবীর সেরা আর তার ধর্ম মতই অভ্রান্ত। এর পরিণাম সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নিম্নলিখিত মন্তব্য স্মরণ রাখার মতো :

"খ্রীষ্টান মনে করে একমাত্র তাদের ধর্ম-মতই (faith) কল্যাণ সাধনে সক্ষম, অন্যসব ধর্মমত ক্ষতিকর। অন্তত কমিউনিষ্ট বিশ্বাস সম্বন্ধে এ তাদের বদ্ধমূল ধারণা। আমার মতে সব 'বিশ্বাস'-ই ক্ষতিকর আর বিশ্বাসের সংজ্ঞা দিই আমি এভাবে এমন কিছুতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যার কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ থাকলে তাকে কেউ আর 'বিশ্বাস' বলে অভিহিত করে না। দু'য়ে দু'য়ে চার বা পৃথিবী গোলাকার এসব ধারণাকে আমরা কখনো 'বিশ্বাস' বলিনা। প্রমাণের বদলে যখন আবেগকে স্থান দিতে চাই তখনই শুধু আমরা 'বিশ্বাস' বা faith-এর কথা বলে থাকি।"

২০. ৫. ৬৭

বাংলা কবিতার মূল সুর গীতি-ধর্মিতা। আদিতে তা পড়ার চেয়ে গাওয়াই হতো বেশী। আধুনিক বাংলা কবিতা মনে হয়

সেই মূল সুর থেকে অনেকখানি দুরে সরে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের সব প্রধান কবিই, যেমন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্র নজরুল পর্যন্ত সবাই মূলত গীতি কবি। আধুনিক কবিতা যে গীতি-ধর্মিতা বিসর্জন দিয়ে গদ্য দিয়ে গদ্য-ভংগির অনুসারী হয়েছে তাও আত্ম-প্রেরণায় যতখানি তার চেয়ে ইংরেজি তথা বিদেশী বর্তমান কবিদের অনুকরণে অনেক বেশী। আধুনিক বাংলা কবিতার দুর্বলতাও বোধ করি এখানে। নিজেকে যেন খুঁজে পাচ্ছে না এ কবিতা।

৩০. ৫. ৬৭

গতকাল ডাকে একখানা চিঠি পেলাম। চিঠির লেখক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, নাম না জানা, লিখেছেন রাজশাহী, নওগাঁ থেকে। তিনি সাহিত্য-টাহিত্য করেন না, সাহিত্য ব্যাপারে তেমন অভিজ্ঞও নন, ভাষাও তাঁর নয় নির্ভুল। নিজের পরিচয় হিসেবে লিখেছেন: "আমি বাণিজ্য বিভাগের ব্যচিলার এবং কর্মক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নই।"

কাজেই মনে হয় তিনি বি. কম. পাশ, চাকুরি করেন ঐ বিদ্যার প্রয়োজন যে সব ক্ষেত্রে তার কোন এক বিভাগে। চিঠির নীচে নাম সইয়ের আগে লিখেছেন: "আপনার একনিষ্ঠ পাঠক"।

যে কোন লেখকের পক্ষে একনিষ্ঠ পাঠক পাওয়া ভাগ্যের কথা। তিনি অভিজ্ঞ সমালোচক নন, চিঠিখানিতে তাঁর সরল মনেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে, পড়ার পর এ আমার মনে হয়েছে। তাঁর চিঠিখানির কয়েকটি ছত্র উধৃত হলো:

'গত মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষার্ধ থেকে অবধি আপনার "সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন" বইখানি পড়লাম।' এরপর নিজের অযোগ্যতার দীর্ঘ সাফাই দিয়ে লিখেছেন: 'ঐতিহাসিক দেন ঘটনাপ্রবাহ সাহিত্য দেয় সব কিছু। দেয় তার অন্তর আত্মার খবরাখবর। সেই সাহিত্যের

মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে এ বইতে প্রকাশ পেয়েছে আত্মার তথা হৃদয়ের খবরাখবর। ধর্ম ও মানবতার যে পথ নির্দেশ রয়েছে সেটা সর্বকালের মনীষীদের গ্রহণযোগ্য।

'তাই আমার মনে হয় বছরের সেরা গ্রন্থ হিসেবে পুরস্কৃত হলে বোধ হয় এর সাহিত্যমূল্যকে ন্যায্য স্বীকৃতি দেওয়া হতো। বলা বাহুল্য, এ পুস্তক আদৌ কোন পুরস্কার না পেলেও পাঠকের স্বীকৃতিরূপ পুরস্কার পাবেই, পেতই।......

'সংস্কৃতিপর্বের বিভিন্ন রচনা: রুচিশীল ভাবধারার অপূর্ব ব্যাখ্যা পূর্ব বাংলার মন-মানসকে নতুন আলোকের পরশ দিবে এই আমার একান্ত বিশ্বাস। এতে পাবে চিন্তাশীল পাঠক তার ধর্মের গোঁড়ামিকে পরিহার করতে এবং মানবতাকে সকলের ঊর্ধে স্থান দিতে' ইত্যাদি ২৩শে মে, ১৯৬৭।

অপরিচিত পাঠকের কাছ থেকে এ ধরণের চিঠি আমি আরো অনেক পেয়েছি, এখনো মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি। তার অনেকগুলিই রক্ষা করিনি, কয়েকটা আমার 'রেখা-চিত্রে' ব্যবহার করেছি। নিন্দা প্রশংসা দুই-ই লেখকের ভাগ্যে জোটে। আমি ব্যতিক্রম নই। মনে হয় আমাদের জীবনও চাঁদের মতো-এরও দু'পিঠের চেহারা দু'রকম আর দু'রকম বলেই হয়তো জীবনটা শুধু সহনীয় নয় মনোরমও।

১৭. ৬. ৬৭

মনটা আমার কিছুটা বেয়াড়া। অনেক সময় তুচ্ছতম কারণেও বিচলিত আর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। ফলে প্রায় বিঘ্নিত হয় আমার রাতের ঘুম আর দিনের শান্তি। আমার নিজের জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন বাইরের ঘটনাও আমাকে বিষণ্ন করে তোলে— সুদূরের ব্যাপারও ক্ষণে হানা দেয় আমার মনে। তাই প্রায় বিমনা হয়ে পড়ি. বসাতে পারিনা মন কাজে। এবারকার আরব-ইস্রাইল সংঘর্ষ আমার জন্য তেমন এক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভেবে দেখলে এর পেছনে কোন যুক্তি নেই, তবুও সংঘর্ষ থেমে যাওয়ার পরও আমি হতে পারছিনা দুশ্চিন্তামুক্ত। ফিরে ফিরে হতভাগ্য মরুভূর চির-শিশু আরবদের দুঃখে মনটা আলোড়িত হতে থাকে। অন্য শিশুরাও আবেগে চলে, আবেগে মরে। অর্থ-সম্পদ কি কর্ম-দক্ষতার যে এদের অভাব আছে তা নয়. কিন্তু বুদ্ধিহীন আবেগে চালিত হয় বলে এরা আজো সংঘবদ্ধ হতে পারেনি, সংঘবদ্ধ হয়ে যেমন পারেনি শিল্প বাণিজ্য কি কলকারখানা গড়ে তুলতে, তেমনি পারেনি শত্রুর মোকাবেলা করতেও।

আজকের দিনে সব ক্ষমতার মূলে যন্ত্র, যান্ত্রিক নৈপুণ্য আর যান্ত্রিক অস্ত্র। এসব যেন আরবদের ধাতের বাইরে, এ বিদ্যায় আজো তারা না-বালক। ফলে ক্ষুদ্র ইসরাইলের কাছে গত কুড়ি বছরে তারা তিন তিনবার হেরেছে, ডেকে এনেছে নিজেদের ভাগ্যে অশেষ দুঃখ, তার চেয়েও বেশী লাঞ্ছনা। ইসরাইল ক্ষুদ্র হলেও. যন্ত্র বিদ্যায় নিপুণ, অগ্রসরমান ও সুদক্ষ। যুদ্ধের ফলাফলের সঙ্গে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নও জড়িত বলে সংকল্পে তারা মরিয়া। তদুপরি আধুনিক যন্ত্র-শক্তিতে আগুয়ান পৃথিবীর দু'টা বৃহৎ শক্তি বৃটিশ আর আমেরিকা রয়েছে তার পেছনে। এসব আরব আর আরব নেতাদের না জানার কথা নয়। তবুও নিজেরা কিছুমাত্র প্রস্তুত না হয়ে তারা তিন তিনবার যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে পর্যুদস্ত হয়েছে। বুদ্ধিহীন আবেগের এ পরিণতি!

যুদ্ধ কিম্বা শান্তি সব সময় জাতিকে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যেমন সচেতন থাকতে হয় তেমনি সচেতন থাকতে হয় নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধেও এবং তারও বেশী শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে। অন্ধ আবেগ এ সব প্রাথমিক শর্তগুলির প্রতিও যেন আরবদের অন্ধকারে রেখেছে। তাদের পরাজয়ের মনে হয় এ সবই বড় কারণ। এ কয় বছর ধরে তারা যত বড় বড় বুলি আউড়েছে তার সিকি পরিমাণ কাজও করেনি।

আরব বিরাট দেশ, বিরাট জাতি—সুবুদ্ধি আর সুনিয়ন্ত্রিত আবেগকে যদি তারা আয়ত্ত করতে পারতো, ধর্মীয় উচ্ছ্বাস উদ্দীপনাকে বাদ দিয়ে যদি পারতো আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে, তা হলে পৃথিবীতে আবারও অসাধ্য সাধন করা তাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব হতো না। এখন তারা যে অকারণে শুধু দুঃখ ভোগ করছে তা নয় নিজেদের সীমিত শক্তির ও করছে অপচয়। প্রকৃতি-প্রদত্ত সম্পদের বিপুল আয়কে তারা আজো কোন জাতীয় কিম্বা সার্বিক ফলপ্রসূ কর্মে নিয়োগ করেনি বা করতে পারেনি। ফলে বিপুল ধনৈশ্বর্যের মাঝে বিপুল নিরক্ষরতা আর দারিদ্রই সারা আরব দেশ ব্যাপী ছড়িয়ে আছে। ক্ষুদ্র ইসরাইল যেখানে স্বল্পকালের মধ্যে সবুজে শ্যামলে শোভিত হয়ে উঠেছে, সেখানে তার বাইরে শতাব্দীকালের মরুভূমি আজো তেমনি মরুভূমিই রয়ে গেছে। কে জানি একবার বলেছিলো আরবেরা মরুভূর সন্তান নয়, বরং মরুভূর জনক। কথাটা বোধ করি সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।

জন্ম যার ঠেকানো যায়নি, বেড়ে বড় আর শক্ত হয়ে ওঠার পর তাকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে এ ভাবা যায় না, ভাবা মানে আবেগের শিকার হয়ে বোকামির পরিচয় দেওয়া। এবারও আরবেরা সে বোকামিরই পরিচয় দিয়েছে। যত অন্যায় ভাবেই হোক, যা প্রতিষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বেঁচে রয়েছে, শুধু বেঁচে নয় বেড়ে পূর্ণ যৌবনে পৌঁচেছে তাকে মেরে ফেলা কিম্বা সমূলে উৎপাটিত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। স্বভাবের নিয়মও এর বিপরীত। তার চেয়েও বড় কথা বিশ্ব রাজনীতি এখন এমন একটা শক্তিশালী বিশ্ব সংস্থাকে কেন্দ্র করে রূপ নিয়েছে যে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিয়ে এখন আর মাৎসায়ন নীতি চলবে বলে মনে হয় না। এখন কোন বড় রাষ্ট্রই স্রেফ গায়ের জোরে আর একটা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকেও নিশ্চিহ্ন করে

দিতে পারবে না। বিশেষ করে যখন এমন দুই বৃহৎ শক্তি জোটের উৎপত্তি হয়েছে যে যার এক একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে নানা স্বার্থে এভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে তারা কিছুতেই তাদের নিজ নিজ জোট ভুক্ত কোন রাষ্ট্রকেই ধ্বংস হতে দেবে না। আর এও সত্য যে বৃহৎ শক্তি জোট দু'টি সব সময় দুই বিপরীত দিকেই থাকবে।

এংলো-আমেরিকার সৃষ্ট সন্তানকে এংলো-আমেরিকা যে কোন মূল্যে বাঁচিয়ে রাখবেই, আরব রাজনীতিবিদদের এ সত্য উপলব্ধি করা উচিত। আর উপলব্ধি করা উচিত এংলো-আমেরিকার যৌথ শক্তিকে পরাভূত করার অবস্থায় পৌঁছতে তাদের আরো শত শত বৎসর লাগবে। তাও সম্ভব হতে পারে যদি তারা মনে-প্রাণে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে করে গ্রহণ। তবে ততদিনে আমার বিশ্বাস সংঘর্ষ তথা যুদ্ধের প্রয়োজনই যাবে ফুরিয়ে। তখন মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা যাবে অনেক বেড়ে, ধর্ম, বর্ণ আর রাষ্ট্রীয় বিভেদ একেবারে দূর না হলেও অনেকখানি কমে আসবে—য়ুহুদী-খ্রীষ্টান, হিন্দু-মুসলমান এ সব কৃত্রিম ব্যবধানের ঘটবে অবসান। মাঝখানে স্রেফ ধর্মীয় কারণে অগণিত মানুষের জীবনে, তারা যে ধর্মাবলম্বীই হোক, এমন অশেষ দুঃখ-লাঞ্ছনা ডেকে আনার কোন মানে হয় না। এ ক'দিনের যুদ্ধে যে লোকক্ষয় আর ধনসম্পদের যে বিনাশ ঘটেছে তা স্মরণ করলে রীতিমতো আতঙ্কিত হতে হয়। এ যুদ্ধে কি লাভ হয়েছে আরবদের? ক্ষতির ঘরে বিরাট সংখ্যা আর লাভের ঘরে বিরাট এক শূন্য ছাড়া আমি তো কিছুই দেখতে পাই না। নির্বুদ্ধিতার খেসারত হয়তো এ ভাবেই দিতে হয়।

এংলো-আমেরিকা ত দ্ব্যর্থ কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছে—ইসরাইলের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে তারা কিছুতেই দেবে না। তাদের সামরিক নৌ-বহর তো সূচনা থেকেই সরজমিনের আশে পাশে মহড়া দিয়ে ফিরছিল। নাসের বা আরব নেতাদের এটুকু দূরদর্শিতা থাকা উচিত ছিল যে,

ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ মানে এংলো-আমেরিকার সঙ্গেও যুদ্ধ, প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ ত বটে! আর তেমন যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়ার সামর্থ তাদের নেই, নেই একক কিম্বা সম্মিলিত ভাবেও। সোভিয়েট রাশিয়ার এমন কোন স্বার্থ বিপন্ন হয়নি যে যার জন্য তারা সাক্ষাৎ ভাবে জড়িয়ে পড়তে চাইবে এ যুদ্ধে। তাদের পক্ষে যতটুকু নৈতিক চাপ দেওয়া বা ধমকানো সম্ভব তা তারা যথাসাধ্য করে দেখেছে। এর বেশী অগ্রসর হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হতো। অন্য একটি দেশের জন্য, যে দেশ তাদের সর্বপ্রধান নীতি বা রাজনৈতিক দর্শনকে শুধু যে মানে না তা নয় বরং সে দর্শনে বিশ্বাসীদের অহরহ করে চলেছে নির্যাতন, তেমন দেশের জন্য অত বড় ঝুঁকি কেন নেবে তারা? তেমন যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া মানে নিজের দেশের অগণিত মানুষকে পরের জন্য বলি দেয়া, নিজের দেশের সম্পদ আর রণ-সম্ভারকে অন্য দেশ আর জাতির জন্য ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দেয়া। আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের কথা না হয় বাদ দিলাম।

অন্যদিকে এংলো-আমেরিকা যে রাজনৈতিক দর্শন আর নীতিতে বিশ্বাসী, যা তাদের দেশে চালু আর প্রশংসিত, ইসরাইলও তেমন দর্শন আর নীতিতেই বিশ্বাসী ও সে নীতিরই অনুসারী। এ সাদৃশ্য আর মতৈক্যের ফলে, এংলো-আমেরিকার জনগণের নৈতিক সমর্থনও রয়েছে ইসরাইলের পক্ষে, গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ওদের সরকারী নীতিতেও এর প্রতিফলন না ঘটে পারে না। পক্ষান্তরে আরব দেশগুলি আর তার জনসাধারণ কমিউনিজম-বিরোধী বলে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র আর তার জনসাধারণের পুরোপুরি সমর্থন তারা আশা করতে পারে না, এখন যেটুকু সমর্থন তারা করছে তা করতে স্রেফ বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসম্য বজায় রাখা বা নিজেদের দল ভারী করার মতলবেই করা হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, রাজনীতিতে সে ঘরোয়া কি বিশ্ব যাই হোক,

কেউ বড় রকমের স্বার্থ ছাড়া পক্ষ সমর্থন করে না, নেয় না কোন বড় রকমের ঝুঁকি।

আরব রাষ্ট্রগুলি খণ্ড বিখণ্ড। কোথাও রাজতন্ত্র, কোথাও সামন্ততন্ত্র কোথাও এক নায়কত্ব, কোথাও নকল গণতন্ত্র, কোথাও বা তার ছিটেফোঁটা—এতো ওদের রাজনৈতিক চেহারা। এ অবস্থায় একটা ঐক্যবদ্ধ সংহত শক্তির উদ্ভব আশা করা যায় না; সবাই দুর্বল—গোষ্ঠী আর বংশগত গৃহ বিবাদে আরো শক্তিহীন। এক গাদা দুর্বল এক সঙ্গে মিল্লে একটা সবল মানুষ হ'য়ে ওঠে না। সোহরওয়ার্দী নাকি একবার বলেছিলেন: ০+০+০+০=০ অর্থাৎ শূন্যের সঙ্গে শূন্য যোগ করলে যোগফল শূন্যই হয়। মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব দেশগুলি সম্বন্ধেই নাকি তিনি একবার এ নিদারুণ সত্য মন্তব্যটি করেছিলেন। তিন তিনটি যুদ্ধে দেখা গেছে তাঁর এ মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ডিক্টেটারেরা চিরকালই কিছুটা অপরিণামদর্শী হয়ে থাকে আর করে বসে এক ভাবে না একভাবে চরম ভুল। ফলে নিজেরা পরাজিত হয়, পর্যুদস্ত হয় আর দেশের নিরপরাধ মানুষের জীবনে নিয়ে আসে অশেষ দুঃখকষ্ট। অসাধারণ যোগ্যতা সত্ত্বেও হিটলার জার্মানীর অসীম দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে। সোকার্ণোও নিজের আর ইন্দোনেশিয়ার ভাগ্যে কম দুঃখ ডেকে আনেননি। এদের একগুয়েমি আর এক দেশদর্শিতার ফলে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, নষ্ট হয়েছে দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ। নাসেরও কম যোগ্যতা আর কৃতিত্বের পরিচয় দেননি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও শুধু মিসরের নয় সারা আরব জাঁহানের উপর সীমাহীন দুঃখ দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনেছেন।

একনায়কত্ব একচক্ষু হরিণের মতো। শুধু একদিকই দেখে, দশদিক দেখে না বলে বিবেচনায়ও আনে না। আশ্চর্য সামরিক

লোক হয়েও নাসের শত্রু কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করবে তা পর্যন্ত অনুমান করতে পারেন নি। শত্রু কি আগাম বলে কয়ে আক্রমণ করবে? দেশের দশ দিক সামলাবার দায়িত্ব ত দেশ-নায়কের তথা রাষ্ট্র পরিচালকদের। যুদ্ধের আগ্‌খানে নাসের ঘোষণা করেছিলেন ইসরাইলের সব সামরিক কেন্দ্র আর ঘাঁটি তাঁর জানা কিন্তু যুদ্ধের সময় দেখা গেল অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত—মিসরের সব ঘাঁটির খবর ছিল ইসরাইলের নখদর্পণে। জানা থাকলেও কোন দূরদর্শী সেনাপতি কি প্রকাশ্যে তা জানিয়ে দেন? জানিয়ে দেওয়া মানে শত্রুকে সতর্ক করে দেওয়া। আত্মম্ভরিতা আর অকারণ দম্ভ কোন কালেই যুদ্ধজয়ের সহায়ক নয়।

নিরক্ষরতা আর দারিদ্র দূর করে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন-মানের উন্নতি না ঘটালে আর তাদের রাষ্ট্রের অংশীদার করে না নিলে, সে জাতি বা রাষ্ট্র কিছুতেই শক্তিশালী হতে পারে না। সংকটের কালে তারা শক্তি তো জোগায়-ই না, বরং উল্টো বোঝা হয়ে ওঠে। গভীর কোন স্বাজাত্যবোধ ওদের মনে জন্ম নেয় না বলে তারা সংকটকালে 'চাচা আপন জান বাঁচা' এ নীতিরই করে অনুসরণ। ফলে তারা পলাতক, মোহাজের আর যুদ্ধবন্দীর সংখ্যাই শুধু বৃদ্ধি করে। ইসরাইল আর আরবদের বাস্তুহারা যুদ্ধবন্দীর সংখ্যানুপাতের দিকে তাকালেই এ কথার সত্যতা সহজেই বোঝা যাবে। এসব লোক বিপদের দিনে মোটেও রাষ্ট্রের এসেট্ হয় না।

হায়দরাবাদের নিজাম নাকি পৃথিবীর অন্যতম বিত্তশালী লোক ছিলেন, নিজের দেশে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু তাঁর রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা ছিল নিরক্ষর ও দরিদ্র—ওদের জীবনের মান ছিল নিম্নতম। পাক-ভারতের বৃহত্তম ষ্টেট হওয়া সত্ত্বেও সংকটের সময় তিনি তাঁর দেশের জনসমষ্টির কাছ থেকে কোন সহায়তাই পাননি। যাদেরে নিয়ে দেশ, রাষ্ট্র

তাদেরে অবহেলা করলে, তাদেরে অনুন্নত রেখে দিলে অবস্থা এমনই হয়ে থাকে।

আমার বিশ্বাস, আরব দেশগুলিরও দুর্গতির এ কারণ। ওখানে দেশের বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ সাধারণ মানুষ দরিদ্র নিরক্ষর, জীবন মান ওদের অত্যন্ত নীচু আর বাস করে ওরা চরম হীন অবস্থায়। এমন মানুষ কিছুতেই সংকট ত্রাণের হাতিয়ার হতে পারে না। এমন জনসমষ্টির নাম জনশক্তি নয়।

মধ্য প্রাচ্যের দিকে তাকালে এ সব কথাই আমার মনে পড়ে। আর মানবীয় দুঃখ লাঞ্ছনা দেখে মনটা খামাখাই বিগড়ে যায়।

১৯. ৬. ৬৭

ব্যক্তিকে যেমন তেমন রাষ্ট্রকেও শুধু বর্তমানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে চলে না, সব কিছুর পরিকল্পনা করতে হয় ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখেই। মানুষ কখনো স্রেফ বর্তমানে সীমিত নয়। তার মানস-দৃষ্টি সব সময় সামনের পানে। মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিরও আয়ত্ত করতে হবে এ সম্মুখ-দৃষ্টি—সেখানকার মানুষেরও আশা-আকাঙ্খা আর আদর্শের পরিকল্পনার লক্ষ্য হওয়া চাই ভবিষ্যৎ আর সে ভৌগলিক এলাকার সব মানুষের কল্যাণ। এ লক্ষ্যে পৌছার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। দূর অতীতের নজির টেনে এনে মুসলমান-য়ুহুদী-খৃষ্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি ব্যবধান আর তার থেকে উদ্ভূত বিদ্বেষ আজো জিইয়ে রাখার কোন মানে হয় না। দুনিয়ার বর্তমান ভাবধারার সঙ্গে এ চেতনা সম্পূর্ণ বেমানান, এতে ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কারো কোন ফায়দা নেই।

আরব রাষ্ট্রগুলির আজ সব চেয়ে বড় সমস্যা অগুণতি মোহাজেরের পুনর্বাসন আর জনগণের জীবনের সার্বিক মানোন্নয়ন। দেশের বিপুল সম্পদকে স্বল্পসংখ্যকে সীমিত না রেখে দেশ আর জাতিকে সর্বতোভাবে আধুনিকীকরণে প্রয়োগ করা। সব সময় পরস্পর আর

পাশাপাশি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রেষারেষি, যুদ্ধবিগ্রহ আর বিদ্বেষে ডুবে থাকলে এর কোনটাই হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যে কোন রকম উন্নয়নের জন্য শান্তি অপরিহার্য। ইসরাইল আর আরব রাষ্ট্রগুলি সত্যিই যদি শান্তি আর সমৃদ্ধি কামনা করে তাহলে সর্বাগ্রে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা তাদের নিতেই হবে। মানবতার দিক থেকেও এটিই প্রথম কর্ত্তব্য। অতগুলি অসন্তুষ্ট মানুষকে অনির্দিষ্টকাল স্রেফ শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হলে শান্তি সেখানে কিছুতেই আসতে পারে না। এতগুলি মানব-সন্তানকে, সে যে জাতের, যে ধর্মের হোক না, এ যুগে এমন লাঞ্ছনার জীবনে রেখে দেওয়া আর এমন বিরাট মানব শক্তিকে এভাবে অপচয় হতে দেওয়া, এতো তাবৎ বিশ্বের মানব-বুদ্ধির প্রতি-ই এক স্থায়ী ধিক্কার! অসন্তুষ্ট দরিদ্র-সর্বহারারা সব সময় বিপজ্জনক। তাদের কোন দায়িত্ব নেই, মহৎ কোন ভবিষ্যৎও নেই ব'লে তাদের পক্ষে মুহূর্তে বেপরওয়া হতে বাধে না। জীবন মৃত্যু দুই-ই তাদের কাছে সমান। এ সত্য ইসরাইল আর আরবদের এতদিনেও না বোঝার কথা নয়। শুধু মানবতার খাতিরে নয়, নিজেদের স্বার্থেও মোহাজের পুনর্বাসনের প্রশ্নে উভয় পক্ষকে একটা সমঝোতায় আসা উচিত। মধ্যপ্রাচ্যে সূচনায় ইতিহাসের সবচেয়ে যে বড় অবিচার ঘটেছে, যার থেকে এত সব দুঃখ আর সমস্যার উদ্ভব তা হচ্ছে অন্য দেশের একটা অংশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্নতর সংস্কৃতির মানুষকে স্রেফ গায়ের জোরে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া, তাও কয়েকটি এলাকা বহির্ভূত রাষ্ট্রের সহায়তায়। এর চেয়ে নিদারুণ অন্যায়, অস্বাভাবিক আর জবরদস্তিমূলক কাণ্ড কল্পনা করা যায় না। যার ফলে লাখ লাখ মানুষ নিজের ঘর-বাড়ী বাস্তুভিটা আর পেশা থেকে হয়েছে বিতাড়িত। এ পটভূমিতে আরবদের পক্ষে আপোষ করা, সমঝোতায় আসা বা মনে সান্ত্বনা পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। এ

নির্মম সত্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। আবার এও এক নির্মম সত্য যে, দীর্ঘ কুড়ি বছরে আরবেরা ইসরাইলের অস্তিত্বকে কিছুমাত্র দুর্বল ও নড়বড়ে করে তুলতে পারেনি। বরং আরব রাষ্ট্রগুলির তুলনায় শিশু ইসরাইলের উন্নতি ঘটেছে অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত। সেখানেও স্বদেশ-বিতাড়িত অসংখ্য য়ুহুদী এসে আশ্রয় নিয়েছে, প্যালেষ্টাইনের মাটিতে ওদের অস্তিত্ব আজ এক রূঢ় বাস্তব। ঐ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের লোক-সংখ্যা এখন ত্রিশ লাখের উপর। এ ত্রিশ লক্ষ লোককে নিশ্চিহ্ন বা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করতে হলে আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপের মালিক হতে হয়। এ আশ্চর্য প্রদীপের কাহিনীকার আরবেরা বটে কিন্তু সে প্রদীপের মালিক এখন তারা নয়, বরং ইসরাইলের মুরুব্বি আমেরিকা। বিজ্ঞজনেরা সব হারাবার ভয় থাকলে অর্ধেক ছেড়ে বাকি অর্ধেক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধংত্যজতি পণ্ডিতঃ প্রাচীন যুগের কথা হলেও এতে যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় রয়েছে। আরবদের অর্ধেক তো নয়, বিরাট ভূখণ্ডের সামান্য ভগ্নাংশের মায়াই শুধু ছাড়তে হয়েছে। বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে আরবেরা যদি এ সময় কিছু বিজ্ঞতার পরিচয় দেন ঐ ভূখণ্ডে শান্তি ফিরে আসা সহজ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। অবশ্য, যে কোন শান্তি সম্মানের শান্তি হওয়া চাই। সহিষ্ণুতায় কিছুমাত্র অসম্মান নেই।

শান্তি ফিরে এলে পারস্পরিক সহযোগিতা হবে সহজতর। সহযোগিতার ফলে আরবেরাও কম লাভবান হবে না। নিঃসন্দেহে আধুনিক-বিদ্যা আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় ইসরাইল আরবদের তুলনায় অনেক অগ্রগামী ও উন্নত। এ সবের আদান-প্রদান ঘটলে আরবদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আর জীবনমান উন্নয়নে যুগান্তর আসা সম্ভব আর সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনও এর ফলে হতে পারে ত্বরান্বিত। তখন সারা মধ্যপ্রাচ্যের

সমাজ জীবনে আর জীবন দর্শনেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন না এসে পারে না। যার লক্ষ্য হবে বুদ্ধি চর্চা, জ্ঞান আর মননশীলতার কর্ষণা, জীবন-জিজ্ঞাসার অনুশীলন আর সার্বিক মানব কল্যাণ। যা এক সময় আদর্শ ছিল মধ্যপ্রাচ্য থেকে উদ্ভূত সব ধর্মের আর ধর্মবিদ্‌দের। বলা বাহুল্য, এ ভূখণ্ড বিশ্বের তিনটি বৃহৎ ধর্মেরই সূতিকা-গৃহ।

২০. ৬. ৬৭.

কোরআনে বার বারই মানুষকে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কোরআন নাজেল হয়েছে আরব দেশে আর আরবদের মাতৃভাষায়। কাজেই কোরআনের শিক্ষা আর মর্মবাণী তাদের পক্ষে উপলব্ধি করতে না পারার কথা নয়। পার্থিব লাভ-লোকসান কিম্বা বিবেচনা-অবিবেচনার কথা বাদ দিলেও, অন্তত ধর্মীয় নির্দেশের দিকে আরব নেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সে নির্দেশের প্রতিও তাঁরা কিছু মাত্র শ্রদ্ধা দেখাননি, আরব-ইসরাইল সংঘর্ষের সূচনায় আরব নেতারা যথেষ্ট বাড়াবাড়ির পরিচয় দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এ বাড়াবাড়ির ফলে তাঁরাই হয়েছেন সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। বাড়াবাড়িও এক অন্ধতা, এতে সুবুদ্ধি আর বাস্তব-চেতনা পায় লোপ। দুঃখের বিষয়, এ সংকটকালে আরবেরা কিছুমাত্র বাস্তববোধের পরিচয় দিতে পারেনি। তাদের নেতাদের নির্বুদ্ধিতা আর বাস্তব-চেতনার অভাবের ফলে সারা আরবভূমিতে আজ নেমে এসেছে অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সারা মুসলিম জাহানও এ কারণে হয়ে পড়েছে ওদের দুঃখ-গ্লানিতে ম্রিয়মান। আমার নিজের মনকেও এ অকারণ দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা থেকে কিছুতেই মুক্ত রাখতে পারি না, মনে হয় আমি নিজেও এ দুঃখ-গ্লানির অংশীদার। এ কয়দিনের রোজনামচায় একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটার এও কারণ। দুঃখী নিপীড়িত মানুষের প্রতি বেদনাবোধ ত আছেই, সমধর্মিতার জন্য

৬—

আরবদের প্রতি এ বেদনাবোধ যেন আরো তীব্র ও গভীর হয়েই মনে বার বার হানা দেয়। যদিও যুক্তির দিক দিয়ে এর কোন সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। দুঃখী-নিপীড়িত য়ুহুদীদের প্রতি কি আমি এতখানি সমবেদনা বোধ করেছি? ওরাও তো একদিন অশেষ নিপীড়নের শিকার হয়েছিল, সেদিন কি আমি এতখানি বিচলিত বোধ করেছিলাম?

অন্তরের গভীরতম উপলব্ধি বলে: না।

কেন এমন হয়? কেন এ তফাত?

আমার যুক্তিবাদী মন বলে মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার করতে ও গ্রহণ করতে। তেমন চেষ্টাও যে আমি করি না তা নয় কিন্তু সফল হই কই? বার বার ব্যর্থ হয়ে নিজের মনকে নিজে ধিক্কার দিয়েছি কতবার। এ ব্যাপারে মন আমার আজো কুকুরের লেজ। মনে হয় ধর্মীয় আর সামাজিক সংস্কার অত্যন্ত দৃঢ়-মূল—বংশ পরম্পরায় তা রক্তের সঙ্গে, হাড় মাংসের সাথে এমনভাবে মিশে যায় যে তাকে সমূলে মুছে ফেলা, উৎখাত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। হিন্দু মুসলমান বিরোধের দিনেও এ দেখেছি। মনের ভারসাম্য রক্ষা করে কখনো নিরপেক্ষ হতে পারিনি। আরব-য়ুহুদীর বেলায়ও এ ঘটেছে সত্যাসত্য ও ন্যায়-অন্যায় বিচার বিবেচনার মধ্যে না এনেই মুহূর্তে মন স্বসমাজ ও স্বধর্মাবলম্বীদের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। দেখছি উচ্চতম শিক্ষা, এমন কি গভীরতম সংস্কৃতি বোধও এতে হালে পানি পায় না।

কতদিন মনে হয়েছে এখানে আমি অর্থাৎ আমার অন্তরতম সত্তা পরাজিত। মানুষকে আজো আমি মানুষ হিসেবে ভাবতে পারিনি। সামাজিক আর ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে সেও আমার মতো মানুষ, তারও সুখ-দুঃখ বোধ আর প্রেম-বিরহ-চেতনা অবিকল আমার মত, স্রেফ মানুষ হিসেবে তারও বিচার হওয়া উচিত। আশ্চর্য, এমন যুক্তির পথও যুক্তিবাদী মন অনুসরণ করে না,

তারও গতি যুক্তিহীন আবেগের পথেই। সংস্কারই কি যোগায় এ আবেগ? যুক্তির চেয়ে সংস্কার এমন প্রবল হয়ে ওঠে কি করে? অথচ এর পেছনে বৃহত্তর কোন সত্যের উপলব্ধি আছে বলেও মনে হয় না। অন্তত তেমন কোন উপলব্ধি আমি আমার অন্তরে খুঁজে পাই না। তাই এমনতরো সমস্যায় আমার মন মাঝে মাঝে বিব্রত, বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। হিন্দু মুসলমান কিম্বা পাক-ভারতের বিরোধের দিনে যেমন এখন আরব-য়ুহুদী সংঘর্ষের দিনেও আমার মনটা আবার এ অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। প্রতিকারের সামর্থ আমার নাগালের বাইরে বলে আমি হয়ে পড়ি আরো দিশেহারা, সময় সময় মনটা ভেঙ্গে পড়ে একটা অসহনীয় হতাশা আর নৈরাশ্যে। মাঝে মাঝে ভাবি সংবাদপত্র পড়া ছেড়ে দিই, তাহলে ত এ সব দুঃসংবাদ প্রতিনিয়ত আমাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু আমি ত এ যুগের মানুষ, তার মানে আমি এখন সারা বিশ্বের অংশীদার · সুখের যেমন তেমনি দুঃখেরও। এ যুগে কুপমণ্ডুকদের জীবন কি কারো পক্ষে সম্ভব? বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র মাধ্যম ত এখন সংবাদপত্র। তাই যত সংকল্পই করি না কেন সংবাদপত্র পড়া ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে আর হয় না। ফলে মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকেও পাই না নিষ্কৃতি। হয়তো এ যুগের সব বুদ্ধিজীবীরই এ নিয়তি। আমি কোন ব্যতিক্রম নই।

২৩. ৬. ৬৭

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার হিন্দু সমাজ যে সব সংস্কারক আর ধর্ম-জিজ্ঞাসুর আবির্ভাব ঘটেছিল দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তাঁরা আশ্চর্য ভাবে উদার ছিলেন। সব ধর্মকেই তাঁরা জানতে চেয়েছেন, অন্য ধর্ম বা শাস্ত্রকে ভ্রান্ত বলে দেন নি উড়িয়ে। নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সাথে বুঝতে চেয়েছেন সব ধর্ম আর সব শাস্ত্র। রামমোহন আরবী ফার্সী-দু'য়েতেই পণ্ডিত ছিলেন। কোরআন পড়েছেন গভীর মনোযোগ

দিয়ে, বই লিখেছেন, পত্রিকা চালিয়েছেন ঐ দুই বিদেশী ভাষাতেই। ফার্সী সাহিত্য আর হাফেজ ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের অত্যন্ত প্রিয়। কেশব সেনের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল সর্ব ধর্মপ্রীতি। নিজেও গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন করেছেন সব ধর্ম আর ধর্মশাস্ত্র। চেয়েছেন সত্যকে খুঁজে পেতে যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে করতে গ্রহণ। এ ব্যাপারে কোন রকম সংকীর্ণতা আর গোঁড়ামিকে তিনি দেননি কোন প্রশ্রয়।

কেশব সেন তাঁর চার প্রিয় শিষ্যকে পৃথিবীর চার বড় ধর্ম অধ্যয়নে নিয়োগ করেছিলেন: (১) উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়কে ভার দিয়েছিলেন হিন্দু ধর্ম অধ্যয়নের, যে অধ্যয়নের ফলে লেখা হয়েছে সংস্কৃতে গীতার এক বিরাট ভাষ্য আর শ্রীকৃষ্ণ জীবন-চরিত। (২) সাধু অঘোর নাথের উপর দেওয়া হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়নের ভার, যার ফলে লেখা হয়েছে প্রামাণ্য এক বুদ্ধ-জীবনী। তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে এ বিষয়ে গবেষণা আর অধ্যয়ন বেশী দূর এগুতে পারেনি। (৩) গিরিশ সেনকে দিয়েছিলেন ইসলাম আর মুসলমান শাস্ত্র-ইতিহাস ইত্যাদি অধ্যয়নের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব তিনি এতখানি গভীর আন্তরিকতা আর যোগ্যতার সাথে পালন করেছেন যে অচিরে তিনি 'ভাই মৌলানা গিরিশ সেন' নামে হয়ে পড়েছিলেন পরিচিত। বাংলা ভাষায় তিনিই কোরআনের আদি অনুবাদক। হযরত মোহাম্মদের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী আর মুসলিম তাপসদের কাহিনীও তিনি বাংলায় সবার আগে লিখেছেন, এমন কি হাদিসের অনুবাদেও হাত দিয়েছিলেন। এ জন্য কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের সাথে তিনি আরবী ফার্সী ভাষা দুটিও আয়ত্ত করেছিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে ভার দেওয়া হয়েছিল খ্রীষ্ট ধর্ম অধ্যয়ন আর আয়ত্তের। যার ফলে লেখা হয়েছে: 'The Oriental'।

আজ কয়দিন ধরে রোমা রেঁালার লেখা রামকৃষ্ণ জীবনী

পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে সে যুগের এ সব জিজ্ঞাসুদের সর্ব-ধর্ম-প্রীতি দেখে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। ভাই গিরিশ সেনের বইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল কিন্তু তিনি যে ঐ সব কেশব সেনের নির্দেশে আর পৃষ্ঠপোষকতায় লিখেছেন তা আমার জানা ছিল না।

এ সব জিজ্ঞাসুদের দিকে তাকালে আমাদের ত্রুটী সহজেই নজরে পড়ে। আমরা সত্যকে জানতে এভাবে কখনো চেষ্টা করিনি। উত্তরাধিকারসূত্রে যে সত্যকে আমরা পেয়েছি তাকে যাচাই বা অন্য শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজন বোধ করিনি কোনদিন। ধর্ম ব্যাপারে সহনশীলতার অভাব বা প্রতিকূল পরিবেশের জন্যও হয়তো এ সম্ভব হয়নি। বোধ করি এ কারণে আমাদের সমাজে জিজ্ঞাসুর সংখ্যা এত নগণ্য।

২৫. ৬. ৬৭

মধ্য এশিয়ায় এমন কিছু মুসলিম মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা ভিন্ন দেশ-ধর্ম-সংস্কৃতি সম্বন্ধেও কৌতূহলী আর জিজ্ঞাসু ছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার দুস্তর ব্যবধান আর অশেষ প্রতিকূলতাও তাঁদের পথে কিছুমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তেমন একজন জ্ঞানান্বেষী ছিলেন আল-বেরুনী—সে যুগের ভারত সম্বন্ধে তাঁর বই আজো নাকি অদ্বিতীয়। তাঁর সম্বন্ধে ডক্টর এডোওয়ার্ড সি, সাচৌ (Dr. Edward C. Sachau) লিখেছেন:

পৌত্তলিক ভাবজগতের অধ্যয়নে মুসলিম সাহিত্যে আন্তরিক প্রচেষ্টার এক অদ্বিতীয় নিদর্শন আল্-বেরুনীর লেখা—তাঁর লেখার পেছনে আক্রমণ বা ভুল প্রমাণের কোন উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিলনা। সব সময় তিনি ন্যায়নীতি আর নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন—এমনকি বিপক্ষের মতামত অগ্রাহ্য ঘোষিত হলেও।...তাতে বুঝা যায় হিন্দু মন্দির আর দেব মূর্তির বিখ্যাত ধ্বংসকারী সোলতান মাহমুদের ধর্ম-নীতি যার পৃষ্ঠপোষকতায় থেকে আল্-বেরুনী লিখেছেন, তখানি উদার

ছিল যে, ইসলামের ইতিহাসে তেমন উদারতা কদাচিৎ লক্ষ্যগোচর।

১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সোলতান মাহমুদের মৃত্যু ঘটে, কাজেই আল্-বেরুনী যে তাঁর ভারতভ্রমণ তার আগেই লিখে শেষ করেছেন তা সহজেই অনুমেয়। গভীর অধ্যয়ন আর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা—এ দু'য়েরই ফল তাঁর ইণ্ডিয়া। এ দেশের ধর্ম দর্শন আর লোকাচার সব কিছুরই এক নিখুঁত দর্পণ তাঁর এ বই। বইটির বিশেষ মূল্যও একারণে। আল-বেরুনীর পর রশীদ উদ্দীন নামে আর একজন ভারত বিশেষজ্ঞের নাম পাওয়া যায়। তিনি একই সঙ্গে আরবী আর ফার্সী দুই ভাষাতেই লিখতেন। মনে হয় তখন ইরান আর মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে যুগপৎ এ দুই ভাষাই বুদ্ধিজীবীদের সংস্কৃতিচর্চা আর সব রকম মননশীলতার বাহন ছিল। সে যুগে ঐ সব এলেকায় বৌদ্ধ প্রভাব ছিল ব্যাপক। কাশ্মীর এমন কি আমাদের সাবেক সীমান্ত প্রদেশও ছিল তখন ঐ এলেকাধীন। কাশ্মীরের লদক প্রভৃতি কয়েকটি জায়গা আছে বৌদ্ধ অধ্যুষিত, মঙ্গোলিয়ায়ও নাকি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রচুর। মনে হয় ঐ গোটা এলাকার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল তখন পশ্চিম পাকিস্তানের তক্ষশীলা।

রশীদউদ্দীনও ভারতের ইতিহাস লিখেছেন, তার সঙ্গে বুদ্ধের জীবন আর শিক্ষা সম্বন্ধে একটা অংশও তিনি যোগ করেছেন—এর একটা অধ্যায় আরবীতে লেখা হলে পরবর্তী অধ্যায় লেখা হয়েছে ফার্সীতে। এভাবে আগাগোড়া এ দুই ভাষাতেই লেখা হয়েছে তাঁর গ্রন্থের এ অংশটা। তাঁর এ গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তিনি কমলশ্রী নামক এক কাশ্মীরী ভিক্ষুর কাছ থেকে। ভিক্ষু মুখে মুখে বলে গেছেন আর রশীদউদ্দীন সে সবকে করেছেন ভাষায়িত। রশীদউদ্দীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক হতে পারেন। কারণ বিশেষজ্ঞরা তাঁর পাণ্ডুলিপির কাল নির্ণয় করেছেন ১৩০২-৩ খৃীষ্টাব্দ আর হিজরি ৭০২।

বুদ্ধের জন্ম আর জন্মান্তর সম্বন্ধে তাঁর বইতে বহু আজগুবী আর

অলৌকিক কথাও স্থান পেয়েছে, অবশ্য তার সব কিছুই কমলশ্রীর জবানীতে শুনেই তিনি লিখেছেন। তাঁর নিজের বিশ্বাস অবিশ্বাস কিম্বা মতামত তিনি কোথাও প্রকাশ করেননি। কমলশ্রী এমন দাবীও করেছেন যে মঙ্গোলদের (মোগল নয়) শাসনকালে সারা তার্কেস্তান বৌদ্ধ ছিল, এমন কি ইসলামের আবির্ভাবের আগে মক্কা মদিনায়ও বৌদ্ধধর্মই ছিল প্রচলিত। কা'বায় যে ৩৬০টা মূর্তির কথা বলা হয় কমলশ্রীর মতে তা সবই ছিল বুদ্ধমূর্তি আর সে সবেরই হতো তখন পূজা। এমনি বহু রহস্যময় কথা তাঁর পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত হয়েছে। অন্য ধর্মের একজন ভক্ত তাঁর ধর্ম আর ধর্মপ্রবর্তককে যে ভাবে দেখে থাকেন আর যে ভাবে লেখকের সামনে করেছেন পরিবেশন, রশীদউদ্দীন হুবহু সেভাবেই করে গেছেন লিপিবদ্ধ। অন্য ধর্মকে সে ধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিতেই দেখানো হয়েছে, পাঠকদের কাছে পরিবেশনও করা হয়েছে সেভাবে। এখানে তাঁর কৃতিত্ব। রশীদ উদ্দীনের এ পাণ্ডুলিপির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর কার্ল জহন Karl Jahn) Central Asiatic Journal- (Vol, II No,2)

সে যুগের আরব পারস্য আর মধ্য এশিয়ার অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস-ভূগোল ধর্মদর্শন ইত্যাদির চর্চা করেছেন গভীর নিঠা আর অধ্যবসায়ের সাথে। ঐ সবের বহু মূল্যবান তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করে রেখে গেছেন। তাঁদের অবদান সম্বন্ধে ডক্টর কার্ল জহনের এ মন্তব্য স্মরণীয়।

য়ুরোপিয়ান মহাদেশের ইতিহাস আর সংস্কৃতির উপাদানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে আরব আর পারস্য ঐতিহাসিক আর ভূগোলবিদদের রচনা সুবিদিত। একথা বিশেষভাবে সত্য যে মধ্য, পূর্ব আর দক্ষিণ এশীয় কতিপয় জাতি সমন্ধে—যাদের অস্তিত্ব আর খবরাখবর ইতিপূর্বে কারো জানাই ছিল না, থাকলেও তা ছিল অতি

যৎ-সামান্য, মুসলমান লেখকদের বর্ণনা না হলে ঐ সব জাতির অনেকেরই অতীত আর আচার-আচরণ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞই থেকে যেতাম। (Central Asiatic Journal Vol. II)

২৫. ৬. ৬৭.

একবার তরুণ নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন অন্য ধর্মসম্প্রদায়কে খুব তীব্র ভাষায় নিন্দা করছিলেন তাদের কোন কোন আচার-আচরণের কথা উল্লেখ করে তখন গুরু রামকৃষ্ণ নাকি ক্রুদ্ধ শিষ্যের মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে বলেছিলেন: 'বৎস, সব ঘরেরই একটা করে পেছন দরজা থাকে, কেউ যদি সে দরজা দিয়ে ঢুকতে চায় তার সে স্বাধীনতা থাকবে না কেন? অবশ্য তোমার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে একমত যে সদর দরজা দিয়ে ঢোকাই উত্তম।' এ কথা শোনার পর নরেন্দ্রের উত্তপ্ত মেজাজ নাকি মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি: যত মত তত পথ—স্মরণীয়। এযুগে কোন ধর্মগুরুর ভক্ত বা শিষ্য না হলেও মানুষের কিছু এসে যায় না কিন্তু পরমতসহিষ্ণুতা সব যুগেই সভ্য-জীবনের এক অপরিহার্য শর্ত।

২৬. ৬. ৬৭

য়ুরোপীয় সভ্যতার শুধু খোলসটা গ্রহণ করলে চলবে না, ফায়দা পেতে হলে তার অন্তরটাও গ্রহণ করতে হবে। অন্তরে ঐ সভ্যতা চলিষ্ণু আর জঙ্গম—রূপ থেকে রূপান্তরে বিচরণ আর উত্তরণই তার ধর্ম। অন্তরের দিক দিয়ে আমরা আর আমাদের সমাজ তার বিপরীত। আমরা খোলস বদলাই, মন বদলাইনা। আমাদের পোশাক আসাকে রাতারাতি রদ-বদল ঘটে কিন্তু মনের চেহারা-চরিত্র থেকে যায় সাবেকি আর পেছনমুখো। তাই য়ুরোপীয় সভ্যতা য়ুরোপে যেমন শক্তির উৎস হয়েছে আমাদের বেলায় তা হয়নি। অধিকন্তু সাবেকি জীবন-ধারার যেটুক সৌন্দর্য আর মহত্ব ছিল তা থেকেও আমরা বঞ্চিত।

য়ুরোপীয় সভ্যতা সবটাই বস্তুতান্ত্রিক এ স্রেফ নিন্দুকের কথা। সভ্যতা আর ধর্মের বিচারেও গুণগ্রাহীর দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে তাকালেই আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার শক্তি মূলের সন্ধান পাবো।

বলাবাহুল্য, সে শক্তির ফল্গুস্রোত তার অন্তর-ধর্মেই নিহিত। তা আবিষ্কারের জন্য শ্রদ্ধা আর অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সত্য-জিজ্ঞাসুও হতে হয়। বিভিন্ন ধর্মের ব্যাপারেও এ দৃষ্টিভংগিরই প্রাধান্য অত্যাবশ্যক।

আমি ছাড়া আর সবাই বোকা, আমার ধর্মই জগতের সেরা—মনটাকে একটুখানি বিচারমুখী করে নিতে পারলে এ যে স্রেফ ফাঁকা দম্ভোক্তি তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। স্রেফ দম্ভোক্তি দ্বারা নিজের কিম্বা নিজের সমাজধর্ম কিছুরই কোন ফায়দা হয় না। এও এক রকম কুয়াসা—বাইরের কুয়াসা যেমন সূর্য-কিরণে বিলীন হয়ে যায়, মনের কুয়াসাও তেমনি সত্যের আলোয় একদিন না একদিন তিরোহিত হবেই। সত্য জিনিসটাও সূর্যের মতই—তবে ধর্মের ব্যাপারে মোহভঙ্গ হতে অনেক সময় লাগে এ যা।

১৭. ৬. ৬৭

আজ আমার জন্মদিন। আজ থেকে আমার জীবনের পঁয়ষট্টি বছর শুরু হলো। সংস্কৃতিসংসদ—এখানকার ছাত্রদেরই এক প্রতিষ্ঠান, সকালে আমার ঘরেই সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিল। প্রায় আশি-জনের মতো ছাত্র-ছাত্রী এসে জমায়েত হয়েছিল। তারা অনেক ফুলের মালা আর তোড়া দিলে আমাকে উপহার, গান করলে ঘণ্টা দুই ধরে। আমার রচনা থেকেও পাঠ করলে কিছু অংশ। সবাই স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী—ছাত্রীর সংখ্যা ডজন খানেক বাদ বাকি সব ছাত্র, তবে কেউ-ই আমার নয়। আমি অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়েছি প্রায় ন' বছর আগে। কাজেই আমার ছাত্ররা এতদিন ছাত্র থাকার কথা নয়।

গোটা দুই অভিনন্দনপত্রও পাঠ করলে তারা, একটি চিত্রিত কুলায় আমার নাম আর জন্ম তারিখ লিখে সেটাও আমাকে দিল উপহার। খুব ভালো লাগলো ওদের কিশোর মনের আন্তরিকতায়। অভিনন্দনের উত্তরে বল্লাম: আমার বয়সের মানুষের কাছ থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি পাওয়া আমার জন্য খুব বড় কথা নয়, তোমাদের মতো আগামী দিনের পাঠকদের কাছ থেকে, যারা বয়সে প্রায় পুত্র-কন্যা তুল্য, শ্রদ্ধা পাওয়া তাদের কাছেও প্রিয় হতে পারায় একটা বিশেষ আনন্দ আছে। এটা যে কোন লেখকের জন্য একটা বড় রমমের সাফল্য বলেও আমি মনে করি। আমার যুগের আর আগের বয়সের পাঠকেরাই শুধু আমার লেখা পড়ে খুশী হবে, অন্য যুগ আর বয়সের, বিশেষ করে ভাবীকালের পাঠকেরা যদি তাতে গ্রহণযোগ্য কিছু খুঁজে না পায় তা হলে তা লেখা আর লেখক কারো পক্ষে তেমন শ্লাঘার বিষয় নয়।

শিল্প-কর্ম সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে মনে পড়ছে শিল্প সত্য, সুন্দর আর মঙ্গলের যেমন বাণীবাহক তেমনি অন্যদিকে শিল্প মানুষের শান্তি-বিনাশকারী অর্থাৎ disturber of Peaceও বটে। সত্যিকার শিল্প গতানুগতিকতার শত্রু বলে, গতানুগতিক মনের শান্তি সাহিত্য-শিল্পের দ্বারা বিঘ্নিত না হয়ে পারে না। তেমনি শিল্প অনেকের চক্ষুশূল—বিশেষ করে যারা 'যেমন আছে চিরকাল তেমন থাকার' পক্ষপাতী তাদের কাছে ত বটেই। আমার কোন কোন লেখার তেমন একটা প্রচ্ছদ ভূমিকা আছে বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন। এ কারণে নিন্দা প্রশংসা দুই-ই আমার প্রচুর জুটেছে। মনে হয় মনের শান্তিভঙ্গের ভয়ে তোমরা কিছুমাত্র ভীত নও। সব ব্যাপারে আরো বেশী নির্ভয় হও। যে সাহিত্য মানুষকে অভয় বাণী শোনায়, সে সাহিত্যই সত্যিকার সাহিত্য। তোমরা তেমন সাহিত্যের অনুশীলন করো, নিজেদের তৈরী করো তেমন সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী করে।

আমার এবার জন্মদিন উপলক্ষে বেগম সুফিয়া কামাল এ ছোট্ট কবিতাটি লিখে পাঠিয়েছিলেন:

যেদিন চলিয়া গেছে
সে ফিরে না আর
সম্মুখে নতুন দিন
অনন্ত সম্ভার
হাতে লয়ে আসে
প্রীতি-শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল
জন্মের লগন করি
স্নিগ্ধ সুনির্মল।

১১. ৭. ৬৮

সাদৎ আলী আখন্দের উল্লেখ আমার 'রেখাচিত্রে' আছে। সম্প্রতি তাঁর লেখা 'তের নম্বরে পাঁচ বছর' বইটি পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার। তিনি পুলিসের আই, বি. বিভাগে কাজ করতেন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে কলকাতার লর্ড সিংহ রোডের তের নম্বর ছিল আই. বি.র প্রধান কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের দায়িত্ব ছিল সন্ত্রাসবাদীদের নাড়ী নক্ষত্রের খবরাখবর নেওয়া আর রাখা। আখন্দ সাহেব পাঁচ বছর ধরে সেখানে চাকুরি করেছেন সে অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি 'তের নম্বরে পাঁচ বছর'। ঐ অফিসের কার্যকলাপ ভিতর থেকে দেখায় সুযোগ তিনি পেয়েছেন, নিজেও তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন বলে সাক্ষাৎ ভাবে সব খুঁটিনাটিই তিনি লক্ষ্য করেছেন। শোনা কথা বা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি তাঁকে কোন ব্যাপারেই। তিনি নিজে সুলেখক, সাহিত্য-মনা দেশপ্রেমিক আর সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি অনেকখানি সহানুভূতিশীলও।

সন্ত্রাসবাদ এদেশে রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর একটা দিকের ছবি আমরা সন্ত্রাসবাদীদের জবানীতে কিছু কিছু

পেয়েছি। বলাবাহুল্য, স্বভাবতই তা কিছুটা এক-তরফা হতে বাধ্য। নিজেদের দোষত্রুটি দুর্বলতার কথা তাঁরা তেমন খুলে বলেননি। আখন্দ সাহেব ভিতর থেকে চিত্রের দু'দিকই দেখেছেন আর তাঁর চোখ আর মন দুই-ই ছিল খোলা। শিল্পী জনোচিত নির্লিপ্তভাবও তিনি কখনো বিসর্জন দেননি। সরকারী চাকুরে ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর বইটিতে কোথাও সরকারী দৃষ্টি ভংগি প্রতিফলিত হয়নি। ফলে সর্বত্র একটা নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয়েছে। এ কারণে সুখপাঠ্যও হয়েছে বইটি।

সন্ত্রাসবাদীরা সবাই বীর, মহৎ আর মহত্বের প্রতীক ছিলেন এমন একটা ধারণা আমাদের সবাইর মনে ছিল। তাঁদের কেউ কেউ যে চরম কাপুরুষ, স্বার্থপর আর সুবিধাবাদী ছিলেন এ বইটি না পড়লে তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানাই থেকে যেতো। সন্ত্রাসবাদীরাও আমাদের মতই দোষেগুণে, সবলতা দুর্বলতায় মানুষ। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁদের অনেকেই অকাতরে প্রাণের মায়া ত্যাগ করেছেন এমন নজির বহু। আবার স্রেফ নিজের প্রাণটুকু বাঁচাবার জন্য কেউ কেউ যে গোপনে আই. বি.র সাথে হাতও মিলিয়েছেন এ তথ্য আমাদের অজানা ছিল। কেউ কেউ বাইরে সন্ত্রাসবাদী ভূমিকা অভিনয় করেছেন আবার তলে তলে সন্ত্রাসবাদী সহকর্মীদের খবর আই. বি.কে নিয়মিত সরবরাহ করে নিয়েছেন মোটা দক্ষিণাও। এমন বহু কৌতুককর ঘটনাও এ বইটিতে বিবৃত হয়েছে। ইন্‌ফরমারদের বিয়োগান্ত পরিণতির সাথে সাথে অবসরপ্রাপ্ত জাঁদরেল আই. বি. অফিসারদের সশস্ত্র প্রহরী-পাহারায় নিঃসঙ্গ জীবন কেমন দুর্বিসহ অবস্থায় কাটছে তারও ছবি বইটিতে ধরা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এসবই সত্যিকার বাস্তব ঘটনা, কাল্পনিক নয় কোনটাই। বশংবদ নৌকরদের প্রাণ রক্ষার জন্য ইংরেজ সরকারের অর্থ ব্যয়ের বহর দেখলেও বিস্মিত হতে হয়। বইটি পড়ে কিছু কিছু চেনামুখকেও যেন ভালো করে চেনা গেলো।

বইটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের এক অন্ধকার দিকের দলিল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।

১৪. ৭. ৬৭

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা লিখিত 'সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল' বইটির দু'কপি গতকাল, বইটির প্রকাশক 'বই ঘরের' সৈয়দ মোহাম্মদ শফি দিয়ে গেলেন। আমার সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে এটিই প্রথম বিস্তৃত আলোচনা। বইটির ছাপা আর চেহারা দেখে খুশী হওয়া যায়। মনে হলো বইটি সুলিখিত, লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগি ত্যাগ করে ভাবাবেগে বিগলিত হননি কোথাও। সব চেয়ে বড় কথা সর্বত্র একটা আন্তরিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। আনোয়ার পাশার মতো সমঝদার পাঠক পাওয়া সত্যই সৌভাগ্যের কথা।

বইটি আমার জন্মদিন ১লা জুলাই বের হওয়ার কথা ছিল, ছাপাও শেষ হয়েছিল সেভাবে। টাইটেলেও সে তারিখটাই হয়েছে মুদ্রিত। মনে হয় এ ক'দিন বাঁধাই ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কাজেই দেরী হয়ে গেছে।

বিদেশে মাইনর তথা অপ্রধান লেখকদের সম্বন্ধেও প্রচুর বই লেখা হয়। আমাদের দেশে এখনো সে রেওয়াজ চালু হয়নি। সেদিক থেকেও আনোয়ার পাশার বইটি দুঃসাহসের একটি স্বাক্ষর হয়ে থাকবে। অপ্রধান লেখকরাই সংখ্যায় বেশী তাঁরাই সাহিত্যের ধারাকে নানাভাবে চালু রাখেন। অনেক সময় তাঁদের এ অবদান ভুলে থাকা হয়। অন্যদের সম্বন্ধেও এ ধরনের আরও বই লেখা হলে আমাদের সাহিত্যের মূল্যায়ন সহজ হবে।

১৭. ৭. ৬৭

গতকাল (১৬. ৭. ৬৭) সেন্ট্ প্লাসিড্ স্কুল হলে 'উদয়াচল' নামক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাকে এক সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। আমার এ বছর আদমজী সাহিত্য পুরস্কার পাওয়ার কথাটা উপলক্ষ বলে তাঁরা অভিনন্দনপত্রে উল্লেখ করেছেন। সভাপতিত্ব করলেন উক্ত

সংস্থার সভাপতি স্থানীয় জে. এম. সেন হাই স্কুলের হেড মাষ্টার চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আমার সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা করলেন কমার্স কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক আবু তাহের আর নিজামপুর কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক হরিসাধন দাশ। মানপত্র ছাড়া শিল্পী আহমদ হোসেনের ছেলে আখতার হোসেনের আঁকা আমার একটি স্কেচ্ ছবিও আমাকে উপহার দেওয়া হলো। উপস্থিত প্রবীণ আর তরুণ ছাত্র সমাজের আমার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখে আমি রীতিমতো অবাক হলাম। কারণ বিচার করে দেখলে দেখা যাবে আমার সাহিত্যকীর্তি অতি নগণ্য। এতখানি ভক্তি-শ্রদ্ধার যোগ্য কি আমি? এ ধরনের সভায় গেলে এ প্রশ্নটাই বার বার আমার মনে জাগে। কিন্তু প্রশংসা পাওয়ার আর শোনার এক অদ্ভুত মোহ আছে মানুষের মনে—বোধ করি সে মোহই আমাকে এ ধরনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে টেনে নিয়ে যায় বারংবার।

১৮. ৭. ৬৭

গতকাল স্থানীয় মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের অভিষেক উৎসবে আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল প্রধান অতিথি হিসেবে। দিতে হয়েছিল নাতিদীর্ঘ একটি ভাষণও। অকাল মৃত্যু আর দেহের ক্ষয়ক্ষতি নিবারণই চিকিৎসকদের কাজ আর সাহিত্যিকদের কাজ মনের অকাল মৃত্যু আর মানুষের আত্মার ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ। চিকিৎসকরা মানুষকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখেন আর সাহিত্যিকরা মানুষের মানস-চেতনাকে রাখেন জাগিয়ে। মানব-দেহকে সুস্থ আর সজীব রাখাই চিকিৎসাবিজ্ঞানীর কাজ আর সাহিত্যিকদের কাজ মানবাত্মাকে সুস্থ আর সজীব রাখা। কাজেই চিকিৎসক আর সাহিত্যিক পরস্পরের পরিপূরক। দেহ আর মন নিয়েই মানুষ, দেহের দায়িত্ব চিকিৎসকের আর মনের দায়িত্ব শিল্পী-সাহিত্যিকের। মোটামুটি এ কথাগুলোই বলেছিলাম ছাত্র-চিকিৎসকদের সামনে এ দিন।

১. ৮. ৬৭

মাঝে মাঝে যে রাষ্ট্রীয় উপাসনা বা প্রার্থনার আবেদন জানানো হয় তাতে যে একটা প্রচণ্ড রকমের গোঁজামিল থেকে যায় মনে হয় তা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। সংকটের দিনে রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ উপাসনা-গৃহে প্রার্থনা করার যে নির্দেশ দেওয়া হয় তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশ্বাস থাকলে একাধিক অলৌকিক শক্তি তথা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতেই হয়। যা ইসলাম-বিশ্বাসীদের মানা কিছুতেই সম্ভব নয়। আবার অবস্থার হেরফেরে একই রাষ্ট্রের নাগরিক হলেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সবাই যে সর্বান্তকরণে নিজ রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করেন তাও নয়। আরব দেশগুলিতেও য়ুহুদী কম নেই—আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় প্রার্থনা করতে বসে তারা যে আরবদের জয় আর ইসরাইলের পরাজয় কামনা করছে এ কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। পাক-ভারতের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সব ধর্ম সম্প্রদায় পাকিস্তানের জয় আর ভারতের সব ধর্মসম্প্রদায় স্ব স্ব আরাধ্যের কাছে জয় কামনা করেছে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে বিপরীত প্রার্থনায় বিপরীত ফল হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য এসব ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হয়ে থাকেন আর ভক্তের সব ইচ্ছাপূরণে যদি তাঁর তেমন আগ্রহ থাকে! তা যদি না হন তা হলে ঘটা করে মন্দিরে মসজিদে গীর্জা আর মঠে এত প্রার্থনারই বা কি মূল্য?

যদি বলা হয় নাম ভিন্ন বটে আসলে ঈশ্বর এক—যিনি ঈশ্বর তিনিই আল্লাহ তিনিই গড, তিনিই তথাগত, তা হলেও বিপদের অবসান ঘটে না। বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসী বিপরীতমুখী বিভিন্ন ভক্তের প্রার্থনায় তিনি সাড়া দিবেন কি করে? সবাই তো তাঁতে বিশ্বাসী, তাঁরই ভক্ত ও উপাসক, কার কথা ফেলে কার কথা রাখেন তিনি? যদি বলা হয় তিনি যখন ন্যায়বান

তখন নিশ্চয়ই ন্যায়পক্ষকেই তিনি জিতিয়ে দেবেন। তা হলে প্রার্থনা করে ন্যায়-অন্যায় তাঁকে বলে দেওয়ারও ত কোন মানে হয় না। কারণ কোন্ পক্ষ ন্যায় পথে আছে তা তো তাঁরই সবচেয়ে ভালো জানা। ভক্তের কথা শুনতে হলে ত ন্যায় রক্ষা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় কারণ ভক্ত সব সময় যে নিজের পক্ষ টেনেই বলবে তাতে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যত বড় ভক্ত আর ধর্মপ্রাণই হোক কেউই নিজ পক্ষের অন্যায় স্বীকার করে নিজেদের পরাজয় আর শত্রু পক্ষের জয় কামনা করে যে প্রার্থনা করবে না এ প্রায় স্থির নিশ্চিত। অমন প্রার্থনা যদি কেউ প্রকাশ্যে করে তাহলে শত্রুর আগে তার স্বধর্মাবলম্বীরাই তাকে খতম করে দিবে! হয়তো উপাসনা-ঘর থেকে বের হওয়ার সুযোগও পাবে না সে।

আবার সব যুদ্ধে যে ন্যায়পক্ষই জিতে তাও তো নয়। এতে ঈশ্বরের হাত থাকলে তাঁর ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে পরাজিত পক্ষের বিশ্বাসে ফাটল না ধরে পারে না।

আমার বিশ্বাস জাগতিক ব্যাপারে ধর্ম বা ঈশ্বরকে টেনে আনলে এ ধরনের গোঁজামিল অনিবার্য। বিশেষত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে—রাষ্ট্র সর্বতোভাবে এক জাগতিক ব্যাপার, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে তার আগে যে বিশেষণই জুড়ে দেওয়া হোক না কেন, রাষ্ট্র চিরকালই ঐহিক, পরলোকের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্কও নেই।

২. ৮. ৬৭

অভ্যাস মতো সকালে লেখাপড়ায় বসেছি এমন সময় তিন ভদ্রলোক এসে হাজির। বল্লেন তাঁরা স্থানীয় ওয়াসার কর্মচারী, তাঁদের এসেসর চাকুরি থেকে অবসর নিচ্ছেন, তাঁরা অর্থাৎ বিদায়ী অফিসারের সহকর্মীরা এ উপলক্ষে তাঁকে একটি মানপত্র দেবেন।

ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলাম: আমার কাছে কেন?

: আমাদের মানপত্রটা আপনাকে দিয়ে লেখাতে চাই।

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল মুহূর্তে। লেখক হওয়ার জন্য নিজেকেই নিজে মনে মনে একবার অভিসম্পাত দিলাম। এমন দুর্ভোগ ইতিপূর্বেও বহুবার সইতে হয়েছে আমাকে। প্রেসিডেন্ট গভর্ণর মন্ত্রী উচ্চ রাজকর্মচারী কতজনের কত শুভাগমন কিংবা বিদায় উপলক্ষে কতবার যে মানপত্র লিখে দিয়েছি, লিখে দিতে বাধ্য হয়েছি তার হিসেব রাখলে ফিরিস্তি বেশ দীর্ঘই হতো। অন্য কোন দেশের লেখকদের এমন অকাজে এ ভাবে সময় আর শক্তি ক্ষয় করতে হয় বলে শুনিনি। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদেরও কাণ্ডজ্ঞানের এমন অভাব দেখে অত্যন্ত অবাক হতে হয়। অবাক হওয়াই সার, প্রতিকার আমাদের সাধ্যের বাইরে। আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি। লেখক হিসাবে কিছু নাম-খ্যাতিও আছে। বোধ করি ঐ খ্যাতিটাই কাল হয়েছে—আমার বয়স আর অবসরের উপর এমন নির্দয় হামলার ঐ কারণ। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ একদা সুখের থাকলেও এখন রীতিমতো শোকের, অন্তত তাই মনে করা হয়। কারো পক্ষে শোকের না হলেও মানপত্রে প্রচুর শোক প্রকাশ করার একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে। আমি যখন লেখক বলে পরিচিত তখন ওয়াসার কি ওয়াপদার বিদায়ী এসেসরের জন্য আমারও শোকাভিভূত না হয়ে উপায় নেই। কথায় চিড়া না ভিজলেও কথায় অশ্রু বিসর্জন করে কাগজ ভিজানো যায় সহজে। আগন্তুক ভদ্রলোকেরা তাঁদের হয়ে আমাকে দিয়েই তা করিয়ে নিতে চাচ্ছেন অর্থাৎ তাঁদের কান্নাটা আমাকে দিয়েই নিতে চান কাঁদিয়ে অবশ্য কাগজে কলমে।

শুনেছি কোন কোন দেশে পেশাদার কাঁদিয়ে আছে, তারা ফি নিয়ে এক পশলা কেঁদে যায় লাশের পাশে দাঁড়িয়ে। আত্মীয় বিয়োগে কাঁদতে হয় এ স্বাভাবিক মানবীয় কর্তব্যটা ওরা ভাড়াটে লোক দিয়েই

সেরে নেয়। ভাড়াটেরা তাদের হয়ে কিছু নকল কান্না কেঁদে ফিটা পকেটস্থ করে, চোখ না ভিজলেও রুমাল দিয়ে চোখ মুছে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বিদায় নেয় মৃতের ঘর থেকে! নকল কান্নারও দাম আছে ওসব দেশে। আর আমাদের দেশে একটি লেখারও দাম নেই। অধিকন্তু কাগজ আর কালিটা লেখক হওয়ার খেসারত হিসাবে ফাও দিতে হয় লেখককেই।

সাপই শুধু বদনামের ভাগী, আসলে মানুষের চেয়ে কপট প্রাণী আজো সৃষ্টি হতে বাকি।

যে কোন লাশের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু কাঁদা বা হা হুতাশ হয়তো করা যায়। কিন্তু যে কর-নির্ধারক সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা চেহারাও দেখিনি কোনদিন, যিনি পয়লা নম্বরের ঘুষ-খোরও যদি হন অথবা মানুষ হিসাবে যদি হন নেহাৎ পাষণ্ডও তবুও লিখতে হবে তাঁর মতো সাধু সজ্জন ও আদর্শ মানুষ আজো জন্মাননি। এ লেখা যে লেখকের পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক তা কেউ বুঝতে চায় না। বুঝতে চায় না লেখকেরও সময়ের দাম আছে। আসলে দেখা যায় বিদায়ী কর্মচারীর শূন্য আসনে পদোন্নতির সম্ভাবনা যাদের রয়েছে তারাই প্রচুর আগ্রহ নিয়ে এমনতরো বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করে থাকে, বেশ ঘটা করে সভায় দাঁড়িয়ে শোক বিহ্বল কণ্ঠে মানপত্রটাও তারাই পাঠ করে।

এদেরেও বলতে চেয়েছিলাম এর পর যিনি এসেসর হবেন তাঁরইত এ মানপত্র রচনা করা উচিত। তিনি যেমন গদ গদ হয়ে লিখতে পারবেন তা তো অপরের পক্ষে পারা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরা তিন জনই যে সে পদপ্রার্থী নয় তা ওঁদের অন্তর্যামী ছাড়া আমার জানার কথা নয়। তাই এমন মূল্যবান পরামর্শটা দিতে সাহস পেলাম না।

এ মাত্র যে জাতকে আমি সৃষ্টির সেরা কপট বলে ইংগিত করেছি,

আসলে আমিও তার অন্তর্গত। তাই পারলামনা মনের কথা খুলে বলতে। তার মানে আমি নিজেও হতে পারলাম না অকপট।

৩. ৮. ৬৭

ধর্ম পরকাল স্বর্গ নরক—ইত্যাদি ব্যাপারে কোন প্রশ্নই করা যায়না, করলেও তার এমন কোন সদুত্তর নেই যা যুক্তি-গ্রাহ্য। এ সব নিয়ে কোন রকম যুক্তিতর্ক কি প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার সুযোগ না থাকাটাই এক মারাত্মক ব্যাপার। মানুষকে আল্লাহ্ বুদ্ধি দিয়েছেন, দিয়েছেন যুক্তি আর বিবেচনা শক্তি। মানুষ মননশীল। এ মনন-শীলতাই তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। এ সব যদি ব্যবহার করা না হয় বা না যায়—তা হলে এ সব দেওয়ার ত কোন মানেই থাকে না। সঙ্গত হলেও ধর্মীয় ব্যাপারে বা ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন তোলার কোন উপায় নেই, বিশেষতঃ আমাদের সমাজে। জিজ্ঞাসার স্থান সংকুচিত হলে অন্ধবিশ্বাস প্রশ্রয় না পেয়ে পারে না। যার নজির আমরা চারদিকে সমাজে দেখতে পাচ্ছি।

এরিখ্ মেরিয়া রেমার্ক তাঁর একটি নায়কের মুখ দিয়ে একথাটাই হয়তো বলতে চেয়েছেন : 'লোকের ধারণা, শুধুমাত্র বিশ্বাসই মানুষকে ঈশ্বরের অনুগৃহীত করে—যদিও এ সম্বন্ধে কেউ কোনদিন কোন প্রমাণ পায়নি। তাহলে মানুষকে কেন যুক্তি বিচার করে দেখার শক্তি আর প্রমাণ সন্ধানের আকাঙ্খা বা অনুসন্ধিৎসা দেওয়া হয়েছে? কোন রকম ব্যবহার না করার জন্যই কি? তা হলে মহান অজ্ঞাত-শক্তির এ এক চমৎকার খেলা!...

উত্তর যখন নেই তখন আমরা প্রশ্নই বা করতে যাই কেন?
(The Black Obelisk-P114)

যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অন্যায় বা পাপ তেমন প্রশ্ন করার ক্ষমতাই বা কেন দেওয়া হয়েছে মানুষকে? যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া একটি ধূলি কণারও নড়বার শক্তি নেই তখন তাঁর ইচ্ছা

ছাড়া মানুষের মনে জিজ্ঞাসার ইচ্ছাটাই বা এল কি করে ? তা হলে এ ইচ্ছাটাও ঈশ্বরেরই দান। তাঁর দানের সৎব্যবহার করাইত সব চেয়ে বড় পুণ্য আর তাঁর প্রতি আনুগত্যেরও এক বড় নিদর্শন। তা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ।

১৩. ৮.৬৭

গতকাল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সদ্য-পাশকরা ডাক্তারদের 'হিপ্পোক্রেটিক শপথ অনুষ্ঠানে' (Hippocratic Oath Taking) অন্যতম অতিথি-বক্তা হিসেবে আমাকেও ডাকা হয়েছিল। নাতিদীর্ঘ একটি ভাষণ দিয়ে দিলাম। হিপ্পোক্রেটিক ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীসে তাঁর জন্ম। তিনি প্লেটোর সমসাময়িক—তার মানে গ্রীসের স্বর্ণযুগে তাঁরও আবির্ভাব।

তাঁর শপথ নামার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

"চিকিৎসা-পেশায় প্রবেশের মুহূর্তে আমি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে শপথ নিচ্ছি যে মানবতার সেবায় আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো। আমার শিক্ষকদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি কখনো হব না কুণ্ঠিত। পেশাগত কাজে আমি কখনো আমার বিবেক আর মর্যাদাকে দেবনা বিসর্জন। আমার প্রথম দায়িত্ব আমার রোগীর স্বাস্থ্য। যে গোপনীয়তা আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে তার মর্যাদা আমি রক্ষা করবো। আমার সর্বশক্তি দিয়ে চিকিৎসা-ব্যবসার বৃহৎ আর মহৎ ঐতিহ্য আমি রাখবো বাঁচিয়ে। আমার সহকর্মীদের আমি মনে করবো আমার ভাই - ধর্ম, জাতি, বংশ, দলীয় রাজনীতি বা সামাজিক মান-মর্যাদাকে আমি আমার কর্তব্য আর আমার রোগীর মাঝখানে দেব না কোন রকম বাধা হয়ে দাঁড়াতে। ভ্রূণাবস্থা থেকেই আমি মানব-জীবনকে পরম শ্রদ্ধেয় বলে জানবো। বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও আমি আমার চিকিৎসাজ্ঞানকে মানবীয় বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে কখনো করবো না

ব্যবহার। আন্তরিকতার সাথে স্বাধীনভাবে আর আমার আত্মমর্যাদার নামে এ সব প্রতিজ্ঞা আমি গ্রহণ করছি।” ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জিনেভা ঘোষণায়ও এ শপথ-নামা স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চিকিৎসক প্রতিনিধিদের দ্বারা। হিপ্পোক্রেটিসের সব চেয়ে বড় অবদান -চিকিৎসাকে তিনিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানে পরিণত করেন আর দাঁড় করান বিজ্ঞানের উপর। তাঁর আগে অনেক রোগকে অপ্রাকৃত বলে মনে করা হতো আর চিকিৎসাও হতো আধিদৈবিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক আর তন্ত্র-মন্ত্রের ছিল তখন প্রাধান্য। এমন কি মৃগী রোগকে বলা হতো ‘Sacred disease’-পবিত্র ব্যারাম অর্থাৎ দৈবজাত বলে! হিপ্পোক্রেটিসই প্রমাণ আর ব্যাখ্যা করে দেখান—ঐ স্রেফ এক ভুয়া কথা। অন্য রোগের মতো মৃগীও এক রকম দেহজাত আর সম্পূর্ণ আধিভৌতিক রোগ। সেভাবে চিকিৎসা করে তিনি ফলও পেয়েছেন। এ ভাবে সব রোগ আর তার চিকিৎসাকে তিনি কার্যকরণ তথা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার এলেকায় নিয়ে আসেন।

খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতকের পক্ষে এ সত্যই অভাবনীয়। একমাত্র স্বাধীন মণীষাই বহু অভাবনীয়কে এভাবে বাস্তবায়িত করে তুলতে সক্ষম। তাই আমি স্বাধীন মননশীলতায় বিশ্বাসী।

৩. ৯. ৬৭

আজ কাগজে দেখলাম তাঁদের দাবী দাওয়া পূরণের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা একটা মুনাজাত অভিযান চালিয়েছেন। কোন বড় মাঠ-ময়দানে উপস্থিত হয়ে তাঁরা প্রকাশ্যে নিম্নলিখিত রূপ মুনাজাত করছেন: “এয়া এলাহী, পাকিস্তানের তরক্কী দাও, এর বুনিয়াদকে মজবুত করে দাও। এয়া রহমাতুল-লীল্ আলামিন, পাকিস্তানীদের সুখ ও সমৃদ্ধি দাও। হে পরওয়ারদেগার, আমাদের উপর সদয় হওয়ার জন্য, আমাদের বাল বাচ্চা নিয়ে যাতে কোন রকমে বেঁচে থাকতে পারি তার জন্যে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা

বিবেচনা করার জন্যে আমাদের কর্ম-কর্তাদের মনে রহমত নাজেল কর।"

তাঁরা ক'জনে মিলে কাতারবন্দী হয়ে যে মুনাজাত বা আল্লার দরবারে প্রার্থনা করেছেন ঘটা করে তার ছবিও তোলা হয়েছে আর তা ছাপাও হয়েছে কোন কোন কাগজে। মুনাজাত যদি করতে হয় মসজিদইত তার উপযুক্ত স্থান। সেখানে না করে মাঠে ময়দানে করার কি অর্থ? কাগজে তার ছবি ছাপানোরই বা কি তাৎপর্য, মনে হয় পৃথিবীব্যাপী বহু দেশে, মুসলমানের বহু দুঃখ-দুর্গতির মূল কারণ এ মনো-ভংগী—যা নিষ্ক্রিয়তার শুধু নয় আত্মবঞ্চনারও এক নিদর্শন। মুনাজাত বা প্রার্থনার মতো সহজ কাজ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই—এতে শারীরিক কি মানসিক কোন রকম শ্রমের প্রয়োজন হয় না। অধিকন্তু অতি সহজে নিজেকে ধার্মিক বলেও দেওয়া যায় পরিচয়। এ সব লোক আল্লাহ, মুনাজাত বা ধর্মের ভূমিকা আর মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ইত্যাদির কোন তাৎপর্যই যেন বুঝতে পারে না—বুঝতে চায়ও না। টোকিও অলিম্পিকে হকীতে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর এক প্রবীণ সম্পাদক তাঁর কাগজে লিখেছিলেন ঃ "আল্লাহ পাকিস্তানী হকিকে রহমৎ করুন।" এও সে-ই একই মনোভাবের অভিব্যক্তি। শুনা যায় ইসলামের শৈশবে কোন এক যুদ্ধে ফেরেস্তারা এসে মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করে কাফেরদের হারিয়ে দিয়েছিলেন! যে কোন অলৌকিক কথায় বিশ্বাস করতে বুদ্ধি খরচ করতে হয় না আর সাধারণ মানুষের রয়েছে বুদ্ধির প্রতি এক মজ্জাগত অনীহা। তাই অলৌকিকতায় বিশ্বাস দুনিয়া থেকে মরেও মরে না। ফেরেস্তারা এসে আমাদের হয়ে হকি খেলুন, খেলে ভারতকে হারিয়ে দিন—এ বোধ করি উক্ত সম্পাদকীয় কথারও তাৎপর্য! মনে হয় এ বিশ্বাস আজো অনেক মুসলমানের মনে সক্রিয়—তাই মুনাজাত অভিযানের এ প্রহসন! জেরুজালেম বা বায়তুল মকাদ্দাসের লড়াইয়ে আরবেরা ইস্রাইলের হাতে শোচনীয় ভাবে হেরে গেছে—ইসলামের এমন পবিত্র স্থান

রক্ষার বেলায়ও ফেরেস্তারা এসে আরবের পক্ষে যুদ্ধ করেননি অথচ ফেরেস্তাদের পক্ষে হস্তক্ষেপের এটাই ছিল উপযুক্ততম ক্ষেত্র! এসব চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেও, আশ্চর্য, আমাদের অনেকের মোহভঙ্গ হয় না।

ইসলামের নবী নিজে বদর, ওহোদ, খন্দক ইত্যাদি প্রতিটি যুদ্ধে শরিক হয়েছেন, শত্রুকে আঘাত হেনেছেন, শত্রুর আঘাত অকুতোভয়ে নিজে গ্রহণ করেছেন, সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন একাধিকবার, নগর রক্ষার জন্য পরিখা খনন করেছেন নিজের হাতে। শুধু মুনাজাত করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেননি বা বলেননি, 'এ আল্লাহ্‌ শত্রুর মন আমার প্রতি সহানুভূতিশীল করে দাও'! হজরত শুধু মুনাজাতের উপর কোনদিন নির্ভর করেননি, কারো মুনাজাত কবুল হওয়ার হলে সর্বাগ্রে তাঁরটাই কবুল হওয়ার কথা। তা সত্ত্বেও মাঠে ময়দানে গিয়ে তিনি স্রেফ মুনাজাত করেননি চরম বিপদের দিনেও। সর্বতোভাবে তৈরি হয়েছেন শত্রুর মুকাবেলার জন্য। কাফেরদের মনে রহমত নাজেলের জন্য তিনিও ত মুনাজাত করতে পারতেন। তা না করে বরং যখন যে বিপদ এসেছে অমীত সাহস আর বুদ্ধিমত্তার সাথে তিনি সে সবের হয়েছেন সম্মুখীন। যখন আত্মরক্ষার জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করার প্রয়োজন হয়েছে তখন তা থেকে হিজরৎ করতে তিনি পেছপা হননি। যখন হাতিয়ার ধরার প্রয়োজন হয়েছে তখন হাতিয়ার ধরেছেন, যখন যুক্তি তর্কের আশ্রয় নেওয়া দরকার মনে করেছেন তখন তাই করেছেন, যখন সন্ধি করা উচিত ভেবেছেন তখন সন্ধি করেছেন।

আশ্চর্য, এসব মোমেন মুসলমানরা যাঁরা শুধু মুনাজাত করেই নিজেদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার পেতে চান তাঁরা নবী জীবনের এ ইতিহাস বেমালুম ভুলে থাকেন। এঁরাই উচ্চ স্বরে দরুদ পড়ে থাকেন প্রতিটি মিলাদ মহফিলে অথবা হযরতের নাম উচ্চারিত হলেই। বলা বাহুল্য, ধর্মের তোতা পাখীও তোতা পাখীই। ঈগল বা বাজ নয়।

২১. ১০. ৬৭

মালার্মে নাকি বলেছেন ‘poetry is not written with ideas, it is written with words’ কথাটা কি পুরোপুরি সত্য ? আমার বিশ্বাস কথাটাকে বড় জোর অর্ধ-সত্যের মর্যাদা দেওয়া যায়, তার বেশী নয়। যার মনে কোন কথা বা ভাবের দোলা লাগেনি তার পক্ষে কবিতা কি গদ্য কোন কিছু লেখাই সম্ভব নয়—যে লেখাকে সাহিত্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এমন কোন লেখা কিম্বা সফল কবিতা আমার জানা নেই যাতে কোন না কোন ভাবের স্পর্শ লাগেনি। শুধু শব্দের কিম্বা ছন্দের কারসাজি দিয়ে ভালো কবিতা আদৌ লেখা হয় বলেও আমার মনে হয় না। সুনির্বাচিত আর সুন্দর সুন্দর শব্দের সঙ্গে গাঁথার পেছনে যদি ভাবের কোন প্রেরণা বা আবেদনই না থাকে তবে তা রচনা হবে কিনা, হলেও পাঠযোগ্য হবে কিনা সন্দেহ। মালার্মের নিজের কবিতায় কি কোন ভাব বা আইডিয়া নেই ? যে কোন রচনার জন্য কোন একটা অনুভূতি অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, অনুভূতি মাত্রই কোন না কোন আইডিয়া আশ্রয়ী। ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় যুগের এক বিরাট কাব্য সংকলন আমার সামনে রয়েছে — তাতে আইডিয়া বা বক্তব্যহীন কোন কবিতাই খুঁজে পেলাম না। ইংলণ্ডের কাব্য-সম্পদ যে অদ্বিতীয় তা বোধ করি বলার প্রয়োজন রাখে না।

আমার বিশ্বাস শুধু আগুন দিয়ে যেমন রান্না হয় না তেমনি শুধু শব্দ দিয়েও কবিতা হয় না, কিছুটা ভাবগত উপকরণ অত্যাবশ্যক।

২২. ১০. ৬৭

কোন একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে বুদ্ধ সম্বন্ধে আর একবার কিছু লেখার অনুরোধ এসেছে। আজ এ কথা কয়টি লিখে পাঠালাম :

এককালে ধর্মই মানুষের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতো। এখন যে

দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ আর বিজ্ঞান গ্রহণ করেছে। সব ধর্মকেই আজ এ ত্রয়ীর মুকাবেলা না করে উপায় নেই—এ মুকাবেলায় যে ধর্ম টিকে থাকতে পারবে না তার অস্তিত্ব কোন না কোন রকমে বিপন্ন হবেই, অন্তত সচেতন মানুষের কাছে তা আবেদন না হারিয়ে পারে না। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাস্তব-চেতনা আর ঐহিক বোধ, আগের তুলনায় অনেক বেশী বেড়ে গেছে। শুধু পারলৌকিক ভালোমন্দের আবেদনে আজ মানুষের মন কিছুমাত্র সাড়া দেয় না। যে জীবনটা তার হাতের মুঠোয়, ওটার হিতাহিত নিয়েই তার এখন ভাবনা-চিন্তা, কঠিন বাস্তব তথা জীবনের দাবী তাকে দিচ্ছে না এখন আকাশচারী হতে। পরলোকে মুক্তির কথা ভেবে সে মোটেও বিচলিত নয় আজ, মানুষ এখন মুক্তি চায় ইহলোকের দুঃখ-দুর্গতি আর তার অভাব-অনটনের কবল থেকে। এখন মানুষ মানুষকে যতখানি ভয় করে তার সিকির সিকিও ভয় করে না ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বরের দণ্ডকে। তাই পরলোকের ভয়-ভীতি আর সুখ-সুবিধার প্রলোভন এখন মানুষের জীবনে অনেকখানি অবান্তর। মনে হয় এখন ধর্মের প্রতি নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে হবে, ধর্ম তথা ধর্মের বিধি-বিধানকেও আজ বিচার করে দেখতে হবে ঐহিক মাপকাঠি দিয়েই।

বুদ্ধের জীবন আর শিক্ষা পুরোপুরি ঐহিক-ভিত্তিক বলে এ মাপকাঠি দিয়ে তার মূল্যায়ন অধিকতর সহজ—এর ফলাফলও চাক্ষুষ আর প্রত্যক্ষ। বুদ্ধ নিজেও কাল্পনিক ফলশ্রুতির উপর নির্ভর করেন নি, দেননি তেমন প্রতিশ্রুতিও। প্রতিদিন বাস্তব জীবনে যে সব সমস্যায় মানুষের অস্তিত্ব জর্জরিত তার অপনোদনের পথ আর উপায় তিনি বাৎলাতে চেয়েছেন—যা মানুষের আয়ত্তাধীন। কোন রকম অলৌকিক শক্তির দোহাই বুদ্ধ দেননি, জানাননি তেমন কিছুর প্রতি স্বীকৃতিও। সর্বতোভাবে এ জীবনকে নিয়েই তাঁর ধ্যান-ধারণা, বোধ করেননি

এর বৃত্ত-রেখা ছাড়িয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন। এ প্রত্যক্ষ জীবনকে ডিঙিয়ে অন্য কোন অপ্রত্যক্ষ জীবনের স্বপ্ন তাঁর কল্পনায় পায়নি স্থান। তাঁর শিক্ষা, তাঁর ধর্ম-সাধনা ও তাঁর আবেদন এ জীবনের জন্যই। সমস্ত অবৈধ বাসনা-কামনার হাত থেকে মুক্ত করে এ জীবনকেই চেয়েছেন তিনি সুন্দর আর সুস্থ করে গড়ে তুলতে, চেয়েছেন মানুষকে অসূয়ামুক্ত করতে, তা হলে ব্যক্তি-জীবন আর সমাজ-জীবনে সব দ্বন্দ্বের হবে অবসান তাঁর জীবন-দর্শনের এ বোধ করি মূল ভিৎ।

মানুষের অন্তরেই মানুষের সব দুঃখের বীজ নিহিত, এ মহাসত্যের তিনি উদ্‌গাতা। তার মূলউৎপাটনই তাঁর সব শিক্ষার মূল লক্ষ্য। পরলোকে স্বর্গ নরক থাকলেও এ জীবনে তার কোন মূল্য নেই। কাজেই সে সম্বন্ধে ভেবে শঙ্কিত কি উচ্ছ্বসিত হওয়া বা তার উপর অনাবশ্যক জোর দেওয়ার কোন মানে হয় না। তাই সে সম্বন্ধে মহামানব বুদ্ধ মোটেও মাথা ঘামাননি। তিনি মানুষ, রক্ত-মাংসের মানুষ—তাঁর সব চিন্তা-ভাবনাও মানুষের জীবন সীমায় সীমিত। মানুষের এ জীবনের কল্যাণ আর এ জীবনের মুক্তিই তিনি চেয়েছেন। এ উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেছেন তাঁর জীবন আর জীবনের সব কিছু। সিদ্ধি খুঁজেছেন এ জীবনের পরিমণ্ডলেই।

অন্য সব ধর্মে ঈশ্বর আর পরকালের সম্ভাব্য জীবন এক বড় স্থান জুড়ে রয়েছে—একমাত্র বুদ্ধের শিক্ষায় মানুষই বড় আর একক হয়ে দিয়েছে দেখা। যে মানুষ সমাজ, রাষ্ট্র আর বিজ্ঞানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। কোন রকম অলৌকিকতা এ জীবনে হালে পানি পায় না; তাই বোধ করি বুদ্ধের শিক্ষা আর আবেদনে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মই একমাত্র ধর্ম যা মানুষের তৈয়ারি আর তা মানুষের জন্য এবং মানুষকে নিয়েই। এ দিক দিয়ে একে সর্বতোভাবে মানব-ধর্মই বলা যায় আর এ ধর্মের প্রবর্তককেও সত্যার্থেই বলা

যায় মহামানব। মহামান্য বুদ্ধের জয় হোক, জয় হোক তাঁর অহিংসা মন্ত্রের আর সার্বিক জীবন-চেতনার।

২৫. ১১. ৬৭.

বহুকাল আগে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে, নেহাৎ কৌতূহল বশে বাহাই ধর্ম সম্বন্ধে আমি কিছু পড়াশোনা করেছিলাম। পরে এ পড়াশোনাটা কাজে লাগিয়েছিলাম একটা প্রবন্ধে, প্রবন্ধটা সে যুগের মুসলিম সাহিত্য সমাজের এক অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল এবং ছাপা হয়েছিল কলকাতার সুবিখ্যাত মাসিক 'ভারতবর্ষে।' প্রবন্ধটি আমার প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'বিচিত্র কথা'য় পুর্নমুদ্রিত হয়েছে।

'বাহাই ধর্ম' সম্বন্ধে এ মোটেও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়—আহৃত সব তথ্যও হয়তো নয় পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য। তবে মনে হয় এর আগে বাহাই ধর্ম সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোন আলোচনা হয় নি—লেখাটির প্রতি কারো কারো কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার ঐ হয়তো কারণ। আমাদের দেশেও যে দু'চারজন বাহাই আছেন তা তখন আমার জানা ছিল না। অনেক কাল পরে যখন পুরোদস্তুর শিক্ষক আমি, তখন একদিন চট্টগ্রামের প্রবীণ হেড্মাষ্টার সফদার হোসেন সাহেব এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। দেখলাম তাঁর হাতে এক কপি 'বিচিত্র কথা'—দেখালেন তাঁরা আমার বাহাই ধর্ম প্রবন্ধটি দাগ দিয়ে দিয়ে পড়েছেন। আমার লেখাটাতে যে কিছু কিছু তথ্যগত ভুল আছে দাগ দিয়ে তাই নির্দেশ করেছেন। সে থেকে বিদেশ থেকে কোন বাহাই নেতা চাটগাঁ এলে তাঁরা আমাকেও ডাকেন। আলাপ পরিচয় করিয়ে দেন। একবার ওঁদের এক সভায় আমাকে সভাপতিত্বও করতে হয়েছিল। মনে হয় তাঁরা আমাকে সম্ভাব্য কনভার্ট হিসেবেই ধরে নিয়েছেন। একবার কিছুটা পীড়াপীড়ি করায় তাঁদের এক বিদেশাগত নেতাকে স্পষ্ট বলেও ছিলাম: আমি সাহিত্যিক, মনের কৌতূহলকে সবদিকে জাগ্রত রাখা আমার সাহিত্য ধর্মের অঙ্গ। তাই

বলে কোন কিছুতে আটকা পড়া আমার স্বভাব-বিরোধী। কারণ সেটা হবে আমার সাহিত্য কর্মের অন্তরায়।

সফদার হোসেন সাহেব সে যুগের বি, এল, পাশ করা কিন্তু ওকালতী করেননি জীবনে। জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়েছেন শিক্ষকতায়। দীর্ঘকাল হেডমাষ্টার ছিলেন পটিয়া রাহাত আলী হাই স্কুলের। অত্যন্ত অমায়িক, বিনয়ী নিষ্ঠাবান সরলমনা জ্ঞানান্বেষী সজ্জন হিসেবে তিনি সর্বত্র পরিচিত। বাহাই ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অটল বিশ্বাস আর নিষ্ঠা বিস্ময়কর। আমাদের দেশে বাহাই বিশ্বাসীর সংখ্যা অতি নগণ্য, গণাগুণতিতে আধ ডজনও হবে কিনা সন্দেহ। তবুও সফদার হোসেন সাহেবকে কখনো হতাশ কিম্বা বিচলিত হতে দেখিনি। নিজের মত বিশ্বাস সম্বন্ধে শত দুর্যোগেও এতটুকু শৈথিল্য দেখা দেয়নি তাঁর মনে—থাকেনও দিন রাত ঐ নিয়ে পড়াশোনা আর আলোচনায় মশগুল। আত্মীয়-স্বজন আর পরিবার-পরিজনও মনে হয় তাঁর মনের সাথী নন, নন তাঁর বিশ্বাসে বিশ্বাসী। এযুগে এমন নিঃসঙ্গ বিশ্বাসী দুর্লভ।

এখন তিনি বৃদ্ধ, বয়স সত্তরের উপর। হাঁটতে চলতে কষ্ট হয়। হঠাৎ এক তরুণ আত্মীয়কে সঙ্গে করে আজ সকালে আমার বাসায় এসে হাজির। ইরান থেকে দু'জন বাহাই নেতা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে চান, এ না করে তিনি যেন কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছেন না। আমি নিজে বাহাই না হলেও, এ বৃদ্ধ ধর্ম-প্রাণ বিশ্বাসীকে কিছুতেই নিরাশ করতে পারলাম না। ইরানী নেতারা উঠেছেন মিসেস জামশেদ ইরানীর বাসায়, আমার বাসা থেকে বেশ দূর। ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হলো। সাহেবী পোশাক পরা, গায়ের রংও প্রায় সাহেবদের মতো—স্বাস্থ্যবান আর প্রাণোচ্ছল। যদিও বয়স দু' জনেরই পঞ্চাশোর্ধে। নেতার নাম মুহম্মদ আলী ফৈজী, পার্শী ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না। তাঁর সঙ্গীটি কিছু কিছু ইংরেজি আর

ভালো উর্দু বলতে পারেন। তিনিই দোভাষীর কাজ করলেন।

মানব জাতির ঐক্যে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব আর বিশ্বরাষ্ট্রে ওদের মতো আমিও বিশ্বাস করি। তাই আলাপ-আলোচনা বেশ ভালোভাবেই চল্লো। আলাপ করে আমি যেমন খুশী হয়েছি মনে হলো তাঁরাও আমার সঙ্গে আলাপ করে তেমনি খুশী হয়েছেন! দুখানা বই উপহার দিলেন পার্শীতে লিখে। এর একটি আরবী 'ছুদুহুল মুলুক' অন্যটি ইংরেজী, নাম Paris Talks by Abdul Baha.

এবার আমাদের এ পরিচয়ের স্মারক হিসেবে, আমাকে নিয়ে ফটো তোলার অনুরোধ জানালেন। রাজি হলাম সানন্দে। যন্ত্রটা হাত বদল করে আমার সঙ্গে এক একজন করে দাঁড়িয়ে দু'বারে দু'টা স্নেফ তাঁরাই নিলেন। ক্যামেরাটাও ওদের। নতুন ভাব ও চিন্তা-ধারার মতো নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয়েরও একটা স্বাদ আছে—সে স্বাদটা মনের কোণে বয়ে নিয়ে বাসায় যখন ফিরলাম তখন সূর্য প্রায় মাথার উপর।

৩১. ১২. ৬৭

সংসারে আজব-বুদ্ধি লোকের এ যুগেও অভাব নেই। অনেক সময় তাঁরা অসম্ভব আর আজগুবী কাণ্ডও করে বসেন। তাতে অপরকে হাসির খোরাক যেমন তাঁরা জোগান তেমনি নিজেরাও হয়ে পড়েন হাসির উপলক্ষ। সম্প্রতি তেমন এক দুর্ঘটনা আমার বেলাও ঘটেছে—ঘটিয়েছেন দু'জন আজব-বুদ্ধি লোক। তাঁরা আমার পাঠকই হবেন। কিছুদিন আগে আমাদের এক দৈনিক, পৃথিবীর সেরা লেখক, সেরা দার্শনিক, সেরা রাজনীতিবিদ, ইত্যাদি কে বা কারা এ সম্বন্ধে নির্বাচিত পাঠকদের মতামত নিয়েছিল। আশ্চর্য, দেখলাম সেরা লেখক হিসেবে আমিও দু'ভোট পেয়ে গেছি! পৃথিবীর সেরা লেখক! ভেবে রোমাঞ্চিত হওয়ার মতই কথা।

এ সম্পর্কে অন্য এক দৈনিক, আমাদের খরচেই, কিছুটা টিপ্পনিও কেটেছিল! খুব সঙ্গত বলেই এ টিপ্পনি আমি নিজেই খুব উপভোগ করেছি, এ নিয়ে বহু হেসেছি প্রাণ খুলে।

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে দেশে আমারও দু'জন ভক্ত অর্থাৎ অন্ধ ভক্ত আছে। আমার মতো লেখকের পক্ষে এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। ভুল করা মানবিক, এ এক পরীক্ষিত সত্য হলেও ভুলের দৌড় যে এতখানি হতে পারে, এর আগে আমি তা কল্পনাই করতে পারিনি। তবুও যত হাস্যাস্পদই হোক, বাংলা ভাষার অন্তত দু'জন পাঠক যে আমাকে অত বড় সম্মান দিয়েছেন তার জন্য ভিতরে ভিতরে আমি কিছুমাত্র পুলকিত হইনি বল্লে মানব-স্বভাব আর তার দুর্বলতাকেই অস্বীকার করা হবে। আমি তা করতে চাই না। অতএব অজানা, অচেনা, নাম না জানা ভোটারদ্বয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ!

২. ১. ৬৮

কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে অপরিচিত এক ভদ্রলোক আমাকে এক পোষ্ট কার্ডে নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন:

"আমি একজন নেশাখোর পাঠক। নেশার বস্তু যেমন কোন এক বিশেষ সময়ে বা কিছু সময় পর পর প্রয়োজন হয়, আমারও তেমনি রোজ রাতে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য সাহিত্য-চর্চার নেশা পেয়ে বসে। ভব সংসারে পিছুটান নেই বলে আজকাল নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।... সাহিত্য-চর্চা করার ইচ্ছা বহু দিনের, কিন্তু Part-time হিসবে নয়। তবে এ বিষয়ে আমার অজ্ঞতা রয়েছে। আপনার সংস্পর্শে থেকে Full time সাহিত্যের তালিম নিতে চাই। মতামত জানতে পারলে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আপনার এখানে যাবো।" চিঠিটা পেয়ে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। সাহিত্যের নেশাও অবশ্য বড় রকমের নেশা, অন্য নেশায় তালিমের প্রয়োজন হয় কিনা জানি না, সাহিত্যের বেলায় তালিম তেমন কাজে আসে বলে আমার বিশ্বাস নয়। অন্ততঃ তেমন তালিম দানে আমি অক্ষম। আমার বিশ্বাস সাহিত্য ব্যক্তিগত সাধনার বস্তু। তালিম দিয়ে কেউ কাকেও সাহিত্যিক বানাতে পারে না। বাপ ছেলেকে যে সাহিত্যিক বানাতে পারেনি তার দেদার নজির চোখের সামনে রয়েছে। আমি বেশী

করে শঙ্কিত হয়েছি পত্র-লেখক না হঠাৎ নেশার ঘোরে, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে চাকুরীটাই ছেড়ে দেন। সবার উপরে মানুষ যেমন সত্য তেমনি সব নেশার উপরে চাকরী তথা জীবিকাই সত্য। সাহিত্যের প্রতি যত নেশাই থাক জীবিকার সংস্থান না থাকলে কারো পক্ষেই সাহিত্য করা সম্ভব নয়। ভাত-কাপড় আর মাথা গোঁজার সংস্থান ছাড়া অত্যন্ত দুর্দমনীয় নেশারও অকালমৃত্যু ঠেকানো যায় না।

তাই অবিলম্বে ভদ্রলোককে লিখেছিলাম : জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা না করে আপাতত চাকুরীটা ছাড়বেন না। সাহিত্য অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু জীবিকা বদ্ মেজাজী বৌয়ের চেয়েও অবাধ্য—একদিনও অপেক্ষা করতে রাজি নয়।

৩-১-৬৮

ডিউক অব উইণ্ডসরের স্মৃতি কথা—A King's Story পড়লাম। বইটি সহজ আর চমৎকার ইংরেজিতে লেখা—আন্তরিকতার একটা ফল্গুস্রোত আগাগোড়া বয়ে চলেছে বলে রচনা হয়েছে মর্মস্পর্শী। এ যুগের ইংরেজি সাহিত্যে এটি উল্লেখযোগ্য বই, বিষয়বস্তু বইটিকে করেছে অধিকতর আকর্ষণীয় তথা জনপ্রিয়। প্রেমের জন্য ডিউক সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। তখনকার দিনে বৃটিশ সিংহাসন সোজা ব্যাপার ছিল না, এমন কি তখন বলা হতো ঐ সাম্রাজ্যে সূর্যও অস্ত যায় না। এক গভীর আর তীব্র আবেগ অনুভূতির পটভূমিতে এ বই লেখা হয়েছে সত্য কিন্তু ডিউক কোথাও বিসর্জন দেননি নিজের এতটুকু আত্মমর্যাদা। পরিমিতি বোধ, শালীনতা আর অপূর্ব আত্মসংযম তিনি বজায় রেখেছেন কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাঁর ভালোবাসার পাত্রী মিসেস ওয়ালিস সিমসন তালাক দেওয়া মহিলা। এ কারণে বৃটিশ সরকার এ বিয়েতে সম্মতি দেয়নি। রাজ পরিবারের, বিশেষ করে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর বিয়ে ঐ দেশে একটা বিশেষ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এমন বিয়েতে সে আইনের অনুমোদন নেই।

তাই প্রশ্ন দাঁড়ালো প্রেম না সিংহাসন, ডিউক কোনটি রাখবেন?

শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো ডিউক প্রেমকেই স্থান দিলেন সবার উর্ধ্বে। মানব হৃদয় তথা মানব সত্যের জয় হলো আবার নতুন করে। সে সত্যের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল অপরিমিত ঐশ্বর্য, পার্থিব সুখ-সম্পদ, রাজ সম্মান, আর গৌরব। এমন কি মা-বোন ভ্রাতাদের অশ্রুও পারেনি ডিউকের মর্যাদাবোধকে এতটুকু টলাতে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছামতো, নিজের পছন্দমতো বিয়ে করা ও ভালোবাসার স্বাধিকার রয়েছে—ডিউক এ সত্য থেকে কিছুতেই নড়তে রাজি হন নি। চার্চিলের মতো বন্ধুর পরামর্শেও তিনি দেননি কান।

ব্যক্তি মানুষের এ এক মস্ত বড় অধিকার, এ অধিকার, ত্যাগ করা মানে স্বার্থের কাছে নিজের ব্যক্তি সত্তাকে বলি দেওয়া। ব্যক্তি মর্যাদায় বিশ্বাসী ডিউক তা করেন নি। নর-নারীর সত্যিকার মিলন এ এক চিরন্তন সত্য, এ সত্যের এক অপূর্ব ইতিবৃত্ত A King's Story।

বিচ্ছেদ বিষাদ আর আবেগের উত্তাল আলোড়নে ক্ষত বিক্ষত মুহূর্তেও ডিউক সংযত-চিত্ত ও সংযত-বাক। বইটি সুখপাঠ্য হওয়ার এও এক বড় কারণ। কাহিনী শেষ করেছেন তিনি একথা কয়টি বলে:

Though it has proved my fate to sacrifice my cherished British heritage along with all the years in its service, I today draw comfort from the knowledge that time has long since sanctified a true and faithful Union.

৮. ১. ৬৭

অপরাধ, অপরাধের বিচার আর দণ্ড এ তিন এক সূত্রে গাঁথা এবং এ সব সামাজিক জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। কালক্রমে দেশভেদে অপরাধ নির্ণয়ের পদ্ধতি আর বিচারের নানা নিয়মকানুন

হয়েছে আবিষ্কৃত। নিরাপরাধ যাতে দণ্ড না পায় আর অপরাধীও যেন না পায় অপরাধের তুলনায় বেশী শাস্তি বা না পায় রেহাই, সব রকম আইন আর বিচারের এই লক্ষ্য। আইনের আবিষ্কার সভ্যতার পথে মানুষের এক বিরাট পদক্ষেপ। আইন আর বিচার যেখানে নির্যাতন-মুক্ত আর মানবিক, আইন বা আইনের শাসন সেখানেই অধিকতর সার্থক। নির্যাতন কখনো শাসন নয়। অধিকন্তু তা আইন আর বিচারকে করে কলুষিত এবং তাতে আইনের উদ্দেশ্য হয় ব্যর্থ। বলা বাহুল্য, আইনের শাসন সব সভ্যতারই বুনিয়াদ। যে দেশে আইনের শাসনের প্রতি শাসক আর শাসিতের আনুগত্য যত বেশী, বুঝতে হবে সভ্যতাও সেখানেই তত বেশী দৃঢ়মূল। আইনের শাসন ছাড়া সভ্যতা কিম্বা সভ্য-জীবন ভাবাই যায় না। কিন্তু ক্ষমতা জিনিসটা কিছুটা অন্ধ—অন্ধ ক্ষমতা সভ্যতা আর সভ্য-জীবনের এ মর্ম বুঝতে অক্ষম। অথবা ইচ্ছা করেই চায় না বুঝতে। ফলে শাসন হয়ে ওঠে এদের হাতে নির্যাতন। তাই অনেক সময় দেখা যায় শোনা যায়, বিনাবিচারে আটক বন্দীদের উপরও চলে অকথ্য নির্যাতন। উদ্দেশ্য স্বীকার-উক্তি আদায়। এ ধরণের আটক বন্দীদের অনেকে হয়তো নির্দোষ, অনেকে হয়তো শিক্ষিত ও সম্মানিত। এমন ক্ষেত্রেও নাকি নির্যাতনের আশ্রয় নিয়ে থাকে অন্ধ ক্ষমতা! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ারও বিধান আছে আইনে, আর তেমন আইন প্রায় সব দেশেই স্বীকৃত। এমন দণ্ডে ঘৃণায় ধিক্কারে মানুষের আত্মা শিউরে ওঠে না কিন্তু নির্যাতনে তা তখন নিসম্পর্কিত মানুষও ক্রুদ্ধ ও বিচলিত না হয়ে থাকতে পারে না আর পারে না নির্যাতিতের প্রতি একটা সহজাতসহানুভূতি বোধ না করে। শারীরিক আর মানসিক নির্যাতন সব রকম মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। নির্যাতন, সব রকম যুগেই দেখা গেছে মানুষের অন্তরে দাবানলের কাজ করে।

এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার ফল কখনো শুভ হয় না, বিশেষ করে নির্যাতনকারীর পক্ষে। অনেক দেশে শাসন আর বিচারের ক্ষেত্রে এমন নির্যাতনের কথা প্রায় শোনা যায়। শুনে, আমরা যারা আইনের শাসনের পক্ষপাতী তারা বিচলিত বোধ না করে পারি না।

২০. ১. ৬৮

দিন কয়েক আগে হঠাৎ শিল্পী জয়নুল আবেদিন এসে হাজির। বসে বসে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে অনেক আলাপ হলো। তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও শোনালেন। অল্প কয়দিন আগে কলেজের অধ্যক্ষপদ, নিজে ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর এ সংকল্পের কথা আমার আগে থেকেই জানা ছিল—এ সম্পর্কে তিনি একাধিকবার আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তের প্রতি আমার পুরোপুরি সমর্থন ছিল সব সময়।

আমাদের দেশে শিল্পী আর শিল্পীরা উপেক্ষিত বলেই জয়নুল আবেদিনের মতো শিল্পীকেও নেহাৎ পেটের দায়ে চাকুরি করতে হয়েছে।

চাকরি থেকে তিনি অকালে অবসর নিয়েছেন শুনে আমি তাই খুব খুশী হলাম। শিল্পী জয়নুল আবেদিন বাংলা দেশের প্রকৃতির সন্তান, তাঁর শিল্পী-মানস তাতেই লালিত। এ কারণে, শিল্প বিদ্যালয়ের বাঁধা পাঠ গ্রহণ করেও তিনি হতে পেরেছেন এদেশের সাধারণ জীবন আর প্রকৃতির অংকনকুশলী। শিল্পী-জীবনের শুরুতে দেশের যে ঐতিহ্য চেতনার উপর তাঁর শিল্পী-সত্তা উন্মুলিত, বিদেশের বহু শিল্প-কেন্দ্র দেখে আসার পরও তা কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের মাটি জল-জীবন তাঁর সব শিল্পকর্মের ভিত্তি-ভূমি—তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আর সাফল্যের কারণও এখানে। তাঁর শিল্পের উৎস-মূল দেশ আর যা কিছু দেশজ তাই। তাঁর মতো এমন দেশ-প্রেমিক শিল্পী এ যুগে খুব কমই দেখা যায়। এশিয়া ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্যে তাঁর নির্বাচিত ছবির একটি এলবাম প্রকাশিত হচ্ছে

শুনে আমি খুব আনন্দিত হলাম। বল্লেন, এতে দুর্ভিক্ষেরও কয়েকটি সুপরিচিত ছবি থাকবে। জমিতে মই দেওয়া আর গুণটানা ছবি দু'টার কথাও জিজ্ঞাসা করলাম। বল্লেন, ঐ দুটাও থাকবে। তাঁর এ সব ছবিতে পূর্ব পাকিস্তানের রূপ শুধু নয়, শক্তি ও পরিচিত প্রকরণে রূপায়িত। আমাদের বৃত্তি-জীবীরাও তাঁর ছবিতে জীবন্ত আর শাশ্বতরূপে দিয়েছে দেখা। এ কারণে তাঁর শিল্প হতে পেরেছে সার্বজনীন আর একান্তভাবে মানবিক। যে কোন শিল্প খাঁটি অর্থে দেশজ হলেই হতে পারে খাঁটি অর্থে মানবিক বা আন্তর্জাতিক। ডষ্টয়ভস্কি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ফরাসীদের লেখক আন্দ্রে জিদও এ কথাটাই বলেছেন। নদীর ধারে নৌকা বেঁধে দাড়ি-মাঝিরা খেতে বসেছে, ছোট্ট একটি মেয়ে, হয়তো মাঝিরই মেয়ে, সর্বাঙ্গ ঢেকে ঘোমটা টেনে পরিবেশন করছে। জলের মৃদু তরঙ্গে নৌকা দুলছে, পানি কাঁপছে ক্ষুদে পরিবেশনরতার দিকে চেয়ে চেয়ে বলিষ্ঠ দেহ ভোজনরতদের মনও খুশীতে হচ্ছে হিল্লোলিত। এ ছবি জয়নুল আবেদিন তাঁর স্বাভাবিক আবেগ দিয়ে বলে গেলেন। পরে মন্তব্য করলেন: এখনকার শিল্পীরা এ সব ছবি যেন দেখতে পায় না। বলা বাহুল্য, এমন ছবির নিপুণ তুলিকার স্বয়ং জয়নুল। এ ধরণের ছবিতে তিনি ঢেলে দেন নিজেকে, উজার করে দেন তাঁর মনের সব প্রেম আর আবেগ। ফলে গ্রাম বাংলার অনেক রূপ-কল্প ধরা পড়েছে তাঁর চিত্রে।

শুধু নামের আদ্য অক্ষরে নয়, মনে হয় শিল্প-চেতনার দিক দিয়েও জয়নুল আর জসীমউদ্দীনের সাদৃশ্য রয়েছে। তবে অবলম্বন এক হলেও, প্রকাশের মাধ্যম আলাদা বলেই হয়তো রস-বোধের সূক্ষ্মতা আর জীবনের সৌন্দর্য-উদ্ঘাটনে উভয়ের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। মাঝে মাঝে জসীমের কলম কিছুটা স্থূল আর অতিমাত্রায় ফটোগ্রাফী হয়ে পড়ে জয়নুলের তুলি এখনো তার সূক্ষ্মতা হারায়নি। জসীম বাহিরকে যতখানি প্রকাশ করেন ভিতরকে ততখানি নয়।

জয়নুল তার বিপরীত—তাঁর আলম্ব যাই হোক তাঁর তুলির আঁচড়ে জড় বস্তুটাও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তুলির অমন জোরালো পোঁছ খুব কম শিল্পীরই আয়ত্ত।

জয়নুল আর জসীম উভয়ে দুর্বোধ্যতা মুক্ত, এ দেশের জীবন আর প্রকৃতির মতোই উভয়ে সহজ সরল আর স্পষ্ট। তাই তাঁরা হতে পেরেছেন এ দেশের তুলিকার লিপিকার। উভয়ে আমাদের মানস-জীবনের দুটা দিক আজো পূর্ণ করে রেখেছেন। উভয়ের বন্ধুত্ব আমার জীবনের এক সম্পদ।

২৩. ১. ৬৮

সম্প্রতি অন্যান্য কাগজে যেমন, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত কাগজেও বেরিয়েছে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সর্বাসাকুল্যে যে আটজন অধ্যাপক আছেন তাঁরা সবাই এক জোটে পদত্যাগ করেছেন। একটি ইঞ্জিনিয়ানিং কলেজে যে শুধু আটজন অধ্যাপক থাকতে পারে অর্থাৎ মাত্র আটজন অধ্যাপক দিয়ে যে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালানো যায়, এ প্রথম জানতে পারলাম। এ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কোন মনোগ্রাম আছে কিনা, থাকলে তাতে কি আপ্তবাক্য লেখা আছে তা আমার অজানা। কিন্তু সংবাদপত্রে এ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নামে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন বিষয়ে যে সব বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তার শিরোদেশে এ ফটোটা উল্লেখিত হতে দেখেছি: "ঐশী জ্যোতিই আমাদের পথ প্রদর্শক' আর ইংরাজি বিজ্ঞাপনে দেখেছি: 'Heaven's light is our guide'।

এ কলেজের অধ্যাপকরা যে সবাই এক জোটে পদত্যাগ করেছেন তাও এ 'পথপ্রদর্শনের' ফল কিনা জানা যায়নি—পদত্যাগপত্রে সে কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন বলেও প্রকাশিত হয়নি সংবাদপত্রে। না করলে মনে করতে হবে 'ঐশী জ্যোতির' প্রতি তাঁদের নিজেদের বিশ্বাসও তেমন আন্তরিক আর জোরালো নয়। ঐ স্রেফ বিজ্ঞাপন, লোক দেখানো ব্যাপার! যে সব কাজ ও দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে

মানুষের আর মানুষের পরিচালিত সরকারের সেখানে অকারণে ঐশী শক্তিকে টেনে আনলে এভাবেই হতে হয় বিড়ম্বিত। আমরা মুসলমানরা (হয়তো হিন্দুরাও) অতি ধার্মিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে যেভাবে নিজেদের মনকে চোখ ঠাউরিয়ে থাকি এ তারই এক সাম্প্রতিক নজির। ইচ্ছা করলে এসব পদত্যাগী অধ্যাপকদের সরকার সোজা মুখের উপর বলে দিতে পারে: বিজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলী, আপনারা ত আমাদের উপর ভরসা রাখেন নি, রেখেছেন 'ঐশী জ্যোতির' উপর। এখন সে 'ঐশী জ্যোতির' কাছে প্রতিকার দাবী না করে আমাদের কাছে করেছেন কোন দুঃখে? আপনাদের পদত্যাগপত্রটাও ওখানেই পাঠিয়ে দিন না!

দেখছি এঁদের মতো অদ্ভুত 'ঐশীভক্ত' অন্য দেশেও বিরল নয়। সেদিন কাগজে দেখলাম য়ুরোপে কে একজন গড্ বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করে বসেছে রোমের এক আদালতে। দেখা যাক, গড্ এরও কোন প্রতিকার করেন কিনা! করবে না যে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ এবং স্থিরনিশ্চিত। যদি কিছু করার থাকে তা করবে বা করতে পারে একমাত্র ওদের চার্চ অথবা সরকার অর্থাৎ মানুষ, যারা চার্চ আর সরকারের পরিচালক, ক্ষমতার চাবি-যাদের হাতে। (মামলাটার উৎপত্তি কোন এক গির্জার দেওয়াল ধসে পড়া নিয়ে)।

রাজশাহীর অধ্যাপকরাও হয়তো 'ঐশী জ্যোতির' কাছে ব্যর্থ হয়ে এবার মানুষ পরিচালিত সরকারেরই শরণাপন্ন হয়েছেন। এও মন্দের ভালো, এর ফলে কারো কারো মনের বিভ্রান্তি কিছুটা ঘুচলেও ঘুচতে পারে। আধ্যাত্মিক আর ব্যবহারিক জীবন দুটা আলাদা ব্যাপার। অনেকে এ সত্যটা বুঝতে চান না, ফলে তাল-গোল পাকিয়ে নিজেরা হয়ে পড়েন হাস্যাস্পদ ভূমিকার নায়ক বা নায়িকা। যে বিশ্বাস আর উপলব্ধি সম্পর্ক আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে, তাকে ব্যবহারিক জীবনেও অবলম্বন করতে গেলে পদে

পদে বিড়ম্বিত না হয়ে উপায় থাকে না আর ভুগতে হয় অকারণে আশাভঙ্গের বেদনা।

ইঞ্জিনিয়ারিং একটি বিজ্ঞান, তার কলেজ একটি ব্যবহারিক ক্ষেত্র। প্রমাণিত সূত্রের সাহায্যেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ, যে কোন ব্যবহারিক যন্ত্র ও প্রতিষ্ঠান কতকগুলি স্বীকৃত নিয়মকানুনের দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। আর তা পুরোপুরি মানুষের এক্তিয়ারমুক্ত। এ সব ব্যাপারে ঐশীশক্তিকে টেনে আনার কোন মানে হয় না— আনলে তা স্রেফ নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার একটা উপায় হয়ে দাঁড়ায়। যে সব দেশ বা জাতি এ করে না অর্থাৎ পার্থিব ব্যাপারেও ঐশী-শক্তিকে আনে না টেনে, তাদের সার্বিক উন্নতি আর বৈজ্ঞানিক কিম্বা অ-বৈজ্ঞানিক সব ক্ষেত্রে অকল্পনীয় অগ্রগতি দেখেও আমাদের শিক্ষিত সমাজের চোখ খোলে না এ বড় আশ্চর্য। কোন রকম ঐশী শক্তির দোহাই না দিয়েও ঐ সব দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি কি অধিকতর সুষ্ঠুভাবে আর যোগ্যতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে না ?

আধ্যাত্মিক চেতনা এক স্বতন্ত্র বস্তু, মনের এক গভীরতম উপলব্ধির ফল তা। কলেজ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ায় ঈশ্বরের মহিমা-ব্যঞ্জক বাণী খোদাই করে রাখলেই দর্শকদের মনে অধ্যাত্মিকভাব জেগে ওঠে তেমন নজির আজও দেখা যায়নি। আধ্যাত্মিকতা অত সহজলভ্য মোয়া নয় আর মোটেও নয় লোক রঞ্জক ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করতে লোভ হয়, রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে এ যাবৎ ক'টা আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ছেলে বেরিয়েছে যারা 'ঐশী জ্যোতির' পথ ধরে সংসারপথে দিয়েছে পাড়ি ? বলা বাহুল্য, ঐ না হলে আপত্তি নেই। যে কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ভালো আর সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার বের হলেই আমরা সন্তুষ্ট। তাতেই দেশের উন্নয়ন হবে ত্বরান্বিত, তাতেই জাতির পরম লাভ। মানুষকে ধার্মিক বানাবার দায়িত্ব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নয়—তার জন্য বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রয়েছে, মক্তব-মাদ্রাসা থেকে ইসলামিক একাডেমি পর্যন্ত সবাই ত

এ ব্যাপারে চালিয়ে যাচ্ছে দুর্দান্ত চেষ্টা। তার জন্য সরকারী তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের বেলায় করা হচ্ছে না কোন রকম কার্পণ্য। যার যা কাজ ঠিক ভাবে করা হলেই দেশের মঙ্গল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাজ ভালো ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করা, তার জন্য যদি কোন মটোর প্রয়োজন হয়, তা হওয়া উচিত প্রকৌশল বিদ্যার অনুকূল ও প্রেরণাদায়ক। দরগা আর ওরসের সংখ্যাবৃদ্ধিতে যেমন দেশ-ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি কিছুরই অগ্রগতি বুঝায় না, তেমনি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের শিরোদেশে অজস্র ধর্মবাণী বিজ্ঞাপিত হলেও সেখানকার শিক্ষার মান যে খুব উচ্চতা নির্দেশ করে না। বরং পার্থিব ব্যাপারে ঐশী শক্তিকে টেনে আনলে নিজেকে হতে হয় স্ববিরোধিতারই শিকার! এতে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অযোগ্যতা-অক্ষমতার সাফাই দেওয়ারও একটা অজুহাত মিলে যায় বটে কিন্তু তাতে, না নিজের, না দেশের, না রাষ্ট্রের কারো কোন ফয়দা হয় না। দেখা গেছে শেষকালে সব রকম মানবিক ব্যাপারে মানুষেরই দ্বারস্থ হতে হয়, যেমন রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'ঐশী'-ভক্ত অধ্যাপকরা হয়েছেন। সরকারের দ্বারস্থ হওয়া মানে মানুষেরই দ্বারস্থ হওয়া।

৩০. ১০. ৬৮

বিখ্যাত ভাস্কর রডিনকে (Rodin) যদি জিজ্ঞাসা করা হতো:

: জীবন তোমার কাছে কেমন মনে হয়?

তিনি উত্তর দিতেন: ভালো।

: তোমার কি শত্রু ছিল?

: তারা কিন্তু আমার কাজের বাধা হতে পারেনি।

: আর খ্যাতি?

: খ্যাতির ফলে কাজ আমার কাছে উঠেছে কর্তব্য হয়ে।

: তোমার বন্ধুরা?

: তারা আমার কাছ থেকে সব সময় কাজেরই প্রত্যাশা করেছে।

: আর মেয়ে মানুষ?

: আমার কাজ আমাকে শিখিয়েছে তাদের প্রশংসা করতে আর ভালোবাসতে।

: একদা তুমিও তো তরুণ ছিলে?

: তখন আমিও অন্যের মতই ছিলাম। তরুণ বয়সে তেমন বোধশক্তি থাকে না, পরে ধীরে ধীরে আর ক্রমশঃ তার উদ্ভব আর বিকাশ ঘটে।

রডিন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রিল্‌কে (Rilke) এ সংলাপটি উধৃত করেছেন। সংলাপটি অর্থপূর্ণ আর মনে হয় সব শিল্পীর পক্ষেই অনুধাবনযোগ্য।

৩১. ১. ৬৮

সম্প্রতি কাগজে একের পর এক দু'টি খবর পড়ে শুধ্ অবাক নয়, রীতিমতো হতাশ হতে হলো। পক্ষকাল আগে ঢাকা যাদুঘরের উদ্যোগে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা-মালার ব্যবস্থা করা হয়। বক্তা ছিলেন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর দানী। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি যে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ আর গুণী তা ঢাকায় অন্ততঃ কারো অজনা থাকার কথা নয়। ঢাকার সুধী সমাজে তিনি সুপরিচিত, দীর্ঘকাল ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, প্রামাণ্য বই লিখেছেন ঢাকা আর ঢাকার ইতিহাসের উপর। আর ঢাকা যে এখন পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক-কেন্দ্র তাও অনস্বীকার্য। তবুও এ তিনটি বক্তৃতায় নাকি অতি নগণ্য সংখ্যক শ্রোতাই উপস্থিত ছিলেন। উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মতো সারি সারি শূন্য চেয়ারের সামনেই নাকি ডক্টর দানীকে তাঁর সার-গর্ভ ভাষণ দিতে হয়েছে তিনদিন ধরে।

হিসাব থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বাদ দিয়ে রাখলেও ঢাকায় অন্তত হাজার খানেক অধ্যাপক-অধ্যাপিকা রয়েছেন বিভিন্ন কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় মিলে। কবি-সাহিত্যিক, লেখক-সংবাদিক প্রভৃতি বুদ্ধি-জীবীর সংখ্যাও এখন ঢাকায় নেহাৎ কম নয়। আশ্চর্য, এঁরাও আজ সব বিষয়ে কৌতূহল হারিয়ে বসেছেন। গৃহ কোণ বা তাসের আড্ডা

ছেড়ে আসতে কেউই এতটুকু আগ্রহ বোধ করেন না কোন রকম জ্ঞানের কথা শোনার জন্য। হয়তো প্রত্যেকে মনে করেন, তাঁরা বক্তার চেয়ে কম কিসে! শোনা যায় দেশের এখন সব দিকে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হচ্ছে—শিক্ষা যে সম্প্রসারিত হচ্ছে আর শিক্ষিতের সংখ্যা যে বহুগুণ বেড়েছে তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু মনের আগ্রহ, উৎসাহ, কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা—যা কিছু জ্ঞান আর সংস্কৃতি-চর্চার মৌল-উৎস তা কি বেড়েছে? অবস্থা দৃষ্টে কি মনে হয় না এ সব আমাদের জীবন থেকে বিদায় নিচ্ছে, বিদায় নিচ্ছে অবিশ্বাস্য রকম দ্রুতগতিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী, ছাত্র আর হলের সংখ্যাবৃদ্ধি, অধিকতর সংখ্যক ডক্টরেট আর বিদেশ-ফেরতা অধ্যাপক, নতুন মডেলের গাড়ী আর নতুন ডিজাইনের বাড়ী, এ সবই কি সভ্যতা-সংস্কৃতির একমাত্র মাপকাঠি? কিছুদিন পরে বোধ করি এ-ই হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের ছাত্র-জীবনে, দেশ তখনো স্বাধীন হয়নি, অত দালান-কোঠাও ওঠেনি ঢাকা শহরে কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়, ছাত্র আর অধ্যাপকের সংখ্যাও ছিল তখন অতি সামান্য। তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন অধ্যাপক যখন মাঝেসাজে দু'একটা পপুলার বক্তৃতা দিতেন তাতে ছাত্র অধ্যাপকে কার্জন হল যেতো ভরে। বাইরের কোন আগন্তুক বক্তা হলেত স্থান সংকুলানই হতো না। বলা বাহুল্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত সব সভা-সমিতি তখন কার্জন হলে হতো।

দ্বিতীয় খবরটি আরো শোচনীয় এ কারণে যে, এর সঙ্গে দু'জন খ্যাতনামা বিদেশীর সম্পর্ক রয়েছে। পরোক্ষভাবে অবহেলাটা তাঁদের প্রতি বলে অপমানটা তাঁদের গায়েই বেশী করে লাগার কথা। দু'জন রুশীয় লেখক সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় সফরে এসেছিলেন, শুনেছি দু'জনই প্রতিষ্ঠিত, নামকরা লেখক। এমনকি একজন নাকি লেনিন সাহিত্য পুরস্কার-প্রাপ্তও। এঁদের সম্মানার্থে যে সভা ডাকা হয়েছিল তাতে বাছা বাছা এক শ' জন

সাহিত্যিক শিল্পী সংস্কৃতিসেবীদেরই করা হয়েছিল নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রিতদের জন্য নাস্তা-পানিরও নাকি দরাজ ব্যবস্থা ছিল তবুও নিমন্ত্রিতদের মাত্র জনা দশেক নাকি দয়া করে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখান থেকে ওখান থেকে, রাস্তার পথচারী অনিমন্ত্রিত এমন কিছু লোককে অনুনয় বিনয় করে ডেকে আনার পরও সর্বসাকুল্যে উপস্থিতের সংখ্যা পঁচিশের বেশী নাকি বাড়ানো যায়নি। বিদেশী অতিথিদের প্রতি মান-অপমান কিম্বা সৌজন্যের প্রশ্ন ধর্তব্যের মধ্যে না এনেও কি বলা যায় না মনের দিক দিয়ে, চেতনার দিক দিয়ে, সার্বিক মূল্যবোধের দিক দিয়ে আমরা কত নিচে নেমে যাচ্ছি দিন দিন। মনে হয় এক রাজনীতি ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে আমরা হয়ে পড়েছি উদাসীন ও জড়তাগ্রস্ত। সংস্কৃতি চেতনা তথা আত্মার দিক দিয়ে আমরা যেন এখন মৃত্যুপথযাত্রী। বলা বাহুল্য, জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশ যৌথ-চেতনারই ফল! সে যৌথ চেতনারই মৃত্যু ঘটেছে বলেই দুঃখ।

যদি এ দুই অনুষ্ঠানে দেশী কি বিদেশী সিনেমা-তারকার আবির্ভাব ঘটতো তা হলে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো। নিঃসন্দেহে জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিতে হতো ট্রাফিক পুলিসের সাহায্য! বহু নিন্দিত পরাধীনতার যুগেও রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে জনতার অসম্ভব ভিড় আমরা দেখেছি—দেখেছি জায়গা মিলবে না আশঙ্কা করে অনেকে সভা আরম্ভের দু' ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা আগে গিয়েও বসে থাকতো। এমন কি অধিকতর অখ্যাত লেখকের সভায়ও জনসমাগম দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মাসিক সভাগুলিতেও এর চেয়ে বহুগুণ বেশী শ্রোতার সমাবেশ হতো। আমাদের সে 'অনুন্নত' কালে এমন দুরবস্থার কথা আমাদের কাছে অশ্রুতই ছিল।

তাই মনে বার বার প্রশ্ন জাগে আমরা কি এগুচ্ছি না পিছুচ্ছি? এগুচ্ছি নিশ্চয়ই, তবে তা যে মূল্যবোধের দিকে নয় তার অসন্দিগ্ধ নির্দেশক উপরে বর্ণিত ঘটনা দু'টি।

১২. ৪. ৬৮

গতকাল হঠাৎ বাসায় এক আই বি অফিসারের আবির্ভাব।

বললেন : কিছু খবর জানতে এলাম।

: বলুন।

পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে তার মাঝখান থেকে যে কটি কথা তিনি পড়ে শোনালেন আমাকে তার সারমর্ম : নিউ দিল্লী থেকে ভূপেন নামক এক ভদ্রলোক, নেলী সেনগুপ্তাকে (অসহযোগ-খেলাফৎ যুগের স্বনাম খ্যাত নেতা যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্তের বিধবা স্ত্রী) কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন আবুল ফজল সাহেবের সম্বন্ধে আমাকে কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন।

এইটুকুই শুধু পড়লেন। চিঠির উপর নিচের বাকি অংশ তিনি আর পড়ে শোনালেন না। আমিও দেখালাম না তেমন কোন আগ্রহ তা শুনতে।

এবার তিনি জানতে চাইলেন : এ কাজী আবদুল ওদুদ কে? তিনি কি করেন? আর আমার সম্বন্ধে তিনি উক্ত ভূপেনকে কি বলেছেন? কি বলতে পারেন?

সংক্ষেপে কাজী আবদুল ওদুদের পরিচয় দিলাম। তাঁর জামাতা-কন্যা ঢাকায় থাকেন শুনে জামাতার নাম ঠিকানাও ডায়রিতে টুকে নিলেন। আর আমার সম্বন্ধে বলা মানে আমার লেখা সম্বন্ধেই বলা। ইদানীং আমার যে বইটা সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সেটা আমার আত্মজীবনী, 'রেখাচিত্র'। সম্ভবত কাজী আবদুল ওদুদ ওটা সম্বন্ধে কিছু বলে থাকবেন তাঁর পরিচিত কোন এক ভূপেন বাবুকে। ভদ্রলোক 'রেখাচিত্র' নামটাও টুকে নিলেন আর অনুরোধ করলেন তাঁকে এক কপি বই দিতে। আমার কাছে অতিরিক্ত কপি ছিল না বলে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হল না। তবে বললাম সম্প্রতি হযরত আলী নামে আমার আর একটি নতুন বই বেরিয়েছে, চান যদি তার এক কপি দিতে পারি।

বললেন: তাই দিন।

যাওয়ার সময় কিন্তু বলে গেলেন: আপনার কাজ আপনি করে যান।

আরো একজন আই, বি, অফিসার ঠিক এমন কথাই আমাকে বলেছিলেন বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট-ভবনের ল'নে দাঁড়িয়ে ডিউটি-রত অবস্থায়। আজ তিনি পরলোকে।

মনে হয় সরকার যত সন্দেহের চোখেই আমাদের দেখুক না কেন সরকারের গোপন বিভাগগুলিতেও এমন সব বিশ্বস্ত কর্মচারী রয়েছেন যাঁরা আমাদের সাহিত্য-কর্মের অনুরাগী। একদিক দিয়ে আমাদের জন্য এ এক মস্ত বড় সাফল্যের কথা।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্তা নেলীসেনগুপ্তাকে তাঁর বিরাশিতম জন্মদিবস উপলক্ষে এক সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল চট্টগ্রাম প্রবর্তক সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে। সে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমাকে করা হয়েছিল সভাপতি। মনে হয় সে সংবাদ জানাতে গিয়ে নেলী সেনগুপ্তা তাঁর এক চিঠিতে উপরোক্ত ভূপেন বাবুকে আমার কথাও লিখেছিলেন। আর কলকাতাবাসী কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গেও হয়তো ভূপেন বাবুর পরিচয় ও জানাশোনা আছে, কথা প্রসঙ্গে কোন সময় ওদুদ সাহেবও হয়তো তাঁর কাছে আমার লেখা সম্বন্ধে সানুরাগ মন্তব্য করে থাকতে পারেন।

ওদুদ সাহেবের সঙ্গে আজো আমার পত্রালাপ ও নিজেদের লেখা বই-পত্র বিনিময় চলে। মনে হলো সব কিছুর মূল এখানে।

১৫. ৪. ৬৮

সেদিন এক প্রাক্তন জেলা জজের মুখে শুনলাম হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের সময় নাকি এখন বলে দেওয়া হয়: You are appointed by the Government and Government can terminate your service at any moment. So you are to look to the interests of the Government.

ইতিপূর্বে, এমনকি ইংরেজ শাসনামলেও এমন নির্দেশ কখনো বিচারক বা বিচারপতিদের প্রতি দেওয়া হতো তেমন কথা শোনা যায়নি। এমন নির্দেশ দিয়ে নিয়োগ করা হলে বিচারকদের কিছুতেই নিরপেক্ষ হতে পারার কথা নয়। বিশেষত যে সব মামলায় সরকার পক্ষ থাকে বাদী কিম্বা বিবাদী। সব রকম আইন আর বিচারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিধান। আইনের শাসন পুরোপুরি নির্ভর করে বিচারকদের এ নির্ভেজাল নিরপেক্ষতার উপর। ইংরেজ আমলেও বিচারকরা অনেক সময় সরকারের বিরুদ্ধে যে বহুবার রায় দিয়েছেন তেমন নজিরের অভাব নেই। তার জন্য তাঁদেরে কোন রকম জবাবদিহি করতে হয়েছে বলেও শোনা যায়নি। এখন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হতে পারার ও হওয়ার কথা। বিচারের বেলায় অধিকতর সুযোগ ও স্বাধীনতা তাঁদেরে দেওয়া উচিত; কারণ এখন কোন বিদেশী সরকারের বিশেষ কোন স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন নেই। ইংরেজ আমলে বিদেশী সরকারের স্বার্থের সঙ্গে এ দেশের স্বার্থের সংঘর্ষ ছিল পদে পদে। তবুও সে সরকারের নিযুক্ত বিচারকরা যতখানি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হতে পারতেন এখন নাকি তাও সম্ভব হচ্ছে না। মনে হয় সাম্প্রতিককালে একাধিক বিচারপতির পদত্যাগ তার এক অভ্রান্ত অঙ্গুলি-সংকেত। ন্যায় আর সুবিচারই সব বিচারের প্রাথমিক লক্ষ্য। যে সব নির্দেশের কথা উপরে উল্লেখিত হয়েছে সত্য সত্যই যদি তেমন নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে বিচারকদের কাছ থেকে কিছুতেই নিরপেক্ষতা ও সুবিচার আশা করা যায় না। আইনের শাসন ছাড়া রাষ্ট্রের উপর মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকার কথা নয়। দেশের সামনে এও এক নতুন বিপদ।

২. ৫. ৬৮

ঢাকার বিখ্যাত সংগীত বিদ্যায়তন 'ছায়ানটের' প্রথম সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। এবারও আমার বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ রক্তের চাপ বেড়ে গিয়ে একটা চরম বিপর্যয়ের

সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভাগ্যে মাথাঘোরা শুরু হতেই আমি তাড়াতাড়ি বসে পড়েছিলাম চেয়ারে, পাশে 'ছায়ানটের' সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল বসা ছিলেন। ভয়ে তিনি ত অস্থির ও সন্ত্রস্ত হয়ে পানি, পানি বলে ডাক হাঁক শুরু করে দিলেন। পানি এলে মুখমণ্ডলে পানির ছিঁটা দিয়ে আমাকে প্রায় আধ-ভেজা করে ছাড়লেন। অনেকে ছুটে এসে হাওয়া করতে লাগলেন চারদিক থেকে। টেবিল ফ্যানটা কাছে এনে গতি বাড়িয়ে দিয়ে বসানো হল আমার মাথা তাক্ করে। যাক্ মিনিট দশেকের মধ্যে ফাঁড়া কেটে গেল—বোধ করতে লাগলাম সুস্থ। বসে বসে আমার বক্তৃতার বাকি অংশটা পড়ে ফেল্লাম কোন রকমে। এবারকার বক্তৃতায় দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, আইন ইত্যাদি বহুতর বিষয়ে মন্তব্য করেছিলাম। সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য প্রকাশ অপরিহার্য, সে প্রকাশের সুযোগ দেশে এখন অত্যন্ত সংকোচিত হয়ে এসেছে এ কথাটার উপরই দিয়েছিলাম বেশী জোর।

এবার ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারন্যাশনাল হোষ্টেলে। ওখানে তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীও ছিলেন, তাঁর সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পরিবেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে একদিন অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হলো। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী আচার-আচরণে টিপটাপ ও নিখুঁত, আমাদের অন্যতম উদার-মনা স্বচ্ছ চিন্তাবিদ।

এক সকালে এসে নবীন লেখক মনসুর মুসা দেখা করলে। সাহিত্য নিয়ে ওর সঙ্গেও অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হলো। সাহিত্য সম্বন্ধে ওর লেখাপড়া ও উপলব্ধি বেশ গভীর, সমালোচনায় ওর তীক্ষ্ণ রসবোধ আর বিশ্লেষণী শক্তি আমাকে মাঝে মাঝে মুগ্ধ করে।

ঐ হোষ্টেলে আটজন চীনা ছাত্রও তখন ছিল, চীন সরকার বাংলা শেখার জন্য বৃত্তি দিয়ে ওদেরে এদেশে পাঠিয়েছে, বরাদ্দ পড়া ওরা বাংলা একাডেমিতেই পড়ে, তার বাইরে অতিরিক্ত পড়াশোনা যা করে

তা করে মনসুর মূসার কাছে। সম্ভবত ও তার জন্য কিছু পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। মূসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুনামের সাথে বাংলায় এম, এ, পাশ করে এখন গবেষণা কার্যে রত।

মূসা বললেঃ আমার চীনা ছাত্রদের নিয়ে আসি, ওরা আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হবে।

মূসা গিয়ে ওদেরে ডেকে নিয়ে এলো। ওরা এসে দু'একখানা চেয়ার যা ছিল তাতে আর আমার বিছানায় ঠাসাঠাসি হয়ে বসে আলাপ জুড়ে দিলে। ওরা দেশ থেকে এসেছে মাত্র মাস তিনেক আগে, দেখলাম এর মধ্যে বাংলা বেশ শিখে ফেলেছে আর বাংলায় ছাড়া অন্য ভাষায় কারো সঙ্গে কথাই বলে না। বেশ ভালো লাগলো —আমার সঙ্গেও সবাই বাংলায় কথা বলতে শুরু করলো। সবাই উৎফুল্ল আর হাসি হাসি মুখ, প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে শব্দ হাৎড়াতে হলেও ইংরেজি কিম্বা অন্য শব্দের আশ্রয় নেয় না।

আলাপ করে ওদের ঘরোয়া জীবনের অনেক খবর জানা গেল। জানা গেল ওদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থারও কিছু কিছু সংবাদ। সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্বন্ধেও দেখলাম ওরা বেশ স্পষ্টবাক আর ওদের প্রত্যয়ে নেই কোন রকম দ্বিধা দ্বন্দ্বের স্থান। আলাপ হলো অনেক বিষয়, বাদ গেল না পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্র। আমাকে ওদের একজন সোজা জিজ্ঞাসা করে বসলে পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রে বড় পার্থক্যটা কোথায়? এ সম্বন্ধে আপনার ধারণা আমরা শুনতে চাই।

বল্লামঃ এ দুই সম্পূর্ণ বিপরীত দর্শন। মোটা পার্থক্যটা এখানে যে পুঁজিবাদ বৃহত্তর সংখ্যার সুখসুবিধাকে অস্বীকার করে দেশের সব সম্পদ মুষ্টিমেয়র হাতে জমে ওঠার সুযোগ দেয়, যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়, সমাজতন্ত্রের প্রধানতম লক্ষ্যই বৃহত্তর সংখ্যার চাহিদা মেটানো। আর সমাজতন্ত্র অত্যাবশ্যককে অস্বীকার করে ফালতুকে দেয় না অগ্রাধিকার। উদাহরণতঃ উল্লেখ করলাম—

এই ত পাশেই প্রদেশের একমাত্র আর্ট কলেজটি রয়েছে, তোমরা বোধ হয় জানো তাতে এখন ধর্মঘট চলছে। কেন? কলেজের পাঠ্যসূচীতে যে সব বিষয় রয়েছে, যাতে ছাত্রদের পরীক্ষা করা হবে তার জন্য কোন শিক্ষক নেই, শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি, হচ্ছে না। এধরনের আরো কিছু দাবীদাওয়া রয়েছে যা সবই ছাত্রদের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। এর জন্য অনেক দেয়ান-দরবার করে ব্যর্থ হয়ে এখন ছাত্ররা ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়েছে।

অথচ তার পাশে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে তৈয়ের হয়েছে এক মসজিদ। সমাজতান্ত্রিক দেশে এ কখনো হতো না, হওয়া সম্ভব ছিল না। মানুষের জীবনে আগে ইহকাল তার পরেই আসে পরকাল বা পরকালের ভাবনা। তাই পরকালের কথা পরে, আগে ইহকালের প্রয়োজনের দিকে দিতে হয় নজর। সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থাভাব হলে মসজিদ মন্দির গির্জার জন্যই হয়, স্কুল কলেজ কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য হয় না। এ দুই বিপরীত প্রতিক্রিয়া দুই বিপরীত দর্শনেরই ফল। ফালতু লোক-দেখানো অপচয় সমাজতন্ত্রে চলে না যা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এখানে অপচয়টা আরো বেশী প্রকট এ কারণে যে এ মসজিদের ধারে কাছে কোন বস্তি কিম্বা মহল্লা নেই, অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটা হলে রয়েছে আলাদা আলাদা নামাজের ঘর। আর অন্য মসজিদেও এ স্থান থেকে তেমন দুরতিক্রম্য দূরে নয়। ফলে এ মসজিদে মোটেও নমাজির সংখ্যা আশানুরূপ হয় না। অন্যদিকে আর্ট কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও বিভাগের স্থান হচ্ছেনা, দেওয়া যাচ্ছে না থাকার বাসস্থান সব ছাত্র-ছাত্রীদের।

সমাজতান্ত্রিক দেশে অনিশ্চিত পরকালের জন্য সুনিশ্চিত ইহকালকে এ ভাবে উপেক্ষা কিম্বা অবহেলা করা চলতো না, চলে না। সমাজতন্ত্রের মূল সূত্র ঐহিক ভিত্তিক, ঐহিক জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণই তার লক্ষ্য। পুঁজিবাদও ঐহিকমুখীন যে নয় তা নয়, তবে

তা অতি অল্প সংখ্যকের জন্য, বাদ বাকি বৃহত্তর সংখ্যাকে তা ঝুলিয়ে রাখে ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়ে, যে ভবিষ্যৎ আসবে মৃত্যুর পরে।

আমার কথা শুনে ওদের হাসি মুখ আরো হাস্য-মুখর হয়ে উঠল।

ক্লাসের সময় হয়েছে বলে এবার ওরা সসম্ভ্রমে বিদায় নিলে।

৩ ৬. ৬৮

আমার বিশ্বাস পত্র পত্রিকা, সাহিত্য সংকলন, দৈয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা বিদ্যালয় তথা উচ্চতর শিক্ষা জীবনের একটি অঙ্গ। যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ রকম পত্র পত্রিকা যত বেশী বের হয়, বুঝা যায় সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মানস-চর্চার ক্ষেত্র তত বেশী দরাজ। এতে প্রমাণিত হয় ছাত্রদের মানস-ভূমি ওখানে বন্ধ্যা হয়ে নেই। ছাত্রদের দেহ আর মন চর্চায় অনুকূল পরিবেশ আর সে সবের কৃতিত্বের উপরই যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নির্ভর করে। আমাদের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্ণধারগণ এ সত্যটা অনেক সময় বুঝতে চান না। না চাওয়ার বড় কারণ ছাত্রদের প্রতি তাঁদের যে দায়িত্ব তার চেয়ে কর্তৃপক্ষের তথা যাঁরা তাঁদের এসব পদে নিয়োগ করেছেন তাঁদের প্রতি দায়িত্ব আর আনুগত্যকে তাঁরা দিয়ে থাকেন অগ্রাধিকার। কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক মানুষ বলে সব কিছুকে তাঁরা দেখেন রাজনৈতিক চশমার ভিতর দিয়ে। স্বভাবতঃই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর এর প্রভাব না পড়ে পারে না। এ অবস্থায় ইচ্ছা থাকলেও শিক্ষক, অধ্যাপক আর অধ্যক্ষরা ছাত্রদের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হন। এমন কি মনের স্বাভাবিক প্রবণতায় হতে চাইলেও হতে পারেন না একটুখানি সহানুভূতিশীলও। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা বাধ্য হন শিক্ষকের ভূমিকা ছেড়ে শাসকের ভূমিকায় নামতে। সাম্প্রতিক কালে আমাদের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোই এ এক দুঃসহ

ট্রেজেডির শিকারে পরিণত। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে মাঝে মাঝে তিলকে তাল করে চায়ের পেয়ালায় তুফান সৃষ্টি করা হয় তার মূল কারণ এখানেই নিহিত।

আমার নিজের বিশ্বাস, ছাত্রসমস্যা যে দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠেছে তার জন্য ছাত্ররা যত না দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী কর্তৃপক্ষ। ছাত্রদের বুঝতে চেষ্টা করা আর তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া শিক্ষকের এক পেশাগত ধর্ম। দুঃখের বিষয়, সে ধর্ম তাঁরা আর পালন করেন না, উপরোক্ত কারণে পালন করতে পারেন না। শোনা যায় ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখেন। কোন কোন অধ্যাপক তাঁদের এ শোচনীয় অবস্থার কথা অত্যন্ত বেদনার্ত কণ্ঠে বহুবার উল্লেখ করেছেন আমার কাছে। নিজে শিক্ষক ছিলাম বলে তাঁদের এ বেদনা আর আত্মিক যন্ত্রণা আমি নিজেও অনুভব না করে পারিনা।

৭. ৬. ৬৮

বৈদিক যুগে fine arts বা ললিত কলাকে বলা হতো দেবজন বিদ্যা। কথাটা অর্থপূর্ণ। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার উদ্যোগে পঞ্চাশখানি উপনিষদের অনুবাদ করা হয়েছিল ফার্সী ভাষায়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এ অনুবাদ হয় ল্যাটিন ভাষায়, যা পড়ে জার্মান দার্শনিক শোপেন হাওয়ার মন্তব্য করেছিলেন : In the whole world there is no study so benificial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life—it will be my solace of my death.

৮. ৬. ৬৮

গত পরশু কবিতাকারে লেখা একখানা পোষ্টকার্ড পেলাম। পোষ্টকার্ডখানা পরের পৃষ্ঠায় হুবহু উধৃত হলো :

'রেখাচিত্র : সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন' পাঠে :

সুধী,

শ্রদ্ধাবনত আমি আপনার সংস্কার-মুক্ত
মনের কাছে,
ধন্য আমার মাতৃভাষা তার বাণীর
আজো বাহক আছে!
বুদ্ধির সূর্য রাহুর গ্রাসে যখন
সমাচ্ছন্ন প্রায়,
গোঁড়ামী ও স্বার্থের দমকায় যখন
দীপেরা নিভিয়া যায়।
কম্বুকণ্ঠে নিঃসঙ্গ তখন আপনি
উন্নত শির—
বাজিয়ে চলেছেন দীপ্ত বীণা
সত্য সন্ধানীর।
প্রতিদান জানি যোগ্যতর নহে,
নহে উল্লেখযোগ্য,
কি আছে জাতের দিবে যে তোমায়
যোগ্যমানের অর্ঘ —
সত্যে সুন্দর উপলব্ধি
সত্যের পুরস্কার!
মূল্য দিয়ে কিনবে গোলাপ
এ কার অহঙ্কার?
মুগ্ধ ছিলাম কাশ গাছের
তৈলসমৃদ্ধ সবুজিমায়,
বিস্মিত আজ কাশফুলের
সমুজ্জ্বল শুভ্রতায়।
উড়ে যাবে জানি শরতের কাশ
আশ্বিনের ঝঞ্ঝায়,
দীপ্ততর হোক তব এই দান
মোদের তপস্যায়।

লেখক নাম সই করেছেন কলমদার শফী বলে। বুঝতেই পারা যাচ্ছে লেখকের এটি ছদ্মনাম। সাহিত্যের আবেদন সত্যাই বিস্ময়কর। কখন কার লেখা যে কার মনে শিহরণ জাগায় তা ভাবাই যায় না। লেখক চিঠির শিরোদেশে আমার দু'টি বইর উল্লেখ করেছেন, মনে হয় বই দু'টি তাঁর ভালো লেগেছে, হয়তো তাঁকে কিছুটা ভাবিয়েছেও।

১০. ৬. ৬৮

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত জার্মান লেখক হারমান হেসে (Hermann Hesse) তাঁর গোল্ডমাণ্ড্ (Goldmund) উপন্যাসে শিল্পের এক চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন যা সব শিল্পীরই মনোযোগের দাবী রাখে :

'আত্মা আর দেহের জগৎ, পিতা আর মাতার জগৎ—এ দুই জগৎ এক হয়ে মিশে যাওয়াই শিল্প। স্থূলতম ইন্দ্রিয়-গ্রামে শিকড় হলেও তা বর্ধিত হয় স্বচ্ছতম বিমূর্ত ভাব-লোকে অথবা উৎস যদি তার মননের দুর্লভতম বিদেহী জগৎও হয় তবুও সমাপ্তি তার স্থূল রক্ত-মাংসে! কামনাহীন স্বচ্ছতম মননের সাথে স্থূল বাসনার বিমিশ্রণে নর ও নারী উভয়ে একই সঙ্গে বসবাস করার যে গুণ—উদ্দেশ্য সাধনে সফল, খাঁটি আর সত্য-জাত সব শিল্পে তা-ই দেখা দেয় দ্বি-মুখী এক সংকটাকীর্ণ হাসি হয়েই'। শিল্পের এর চেয়ে অর্থ-গর্ভ সংজ্ঞা আমি আর কোথাও দেখিনি।

২৯. ৫.৬৮

এ বছর আমার দু'টি বই প্রকাশিত হলো। এর একটির নাম 'সংবাদিক মুজিবর রহমান', দ্বিতীয়টির নাম 'সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র' প্রকাশ করেছে যথাক্রমে বাঙলা একাডেমী আর 'নওরোজ কিতাবিস্তান'। দ্বিতীয়টি হালে লেখা আমার বায়ান্নটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথমটি মুসলিম সংবাদিকতার অন্যতম আদি পুরুষ ইংরেজি 'The Mussal-man' ও বাংলা 'খাদেমের' সম্পাদক মরহুম মুজিবর রহমানের সংক্ষিপ্ত

পরিচিতি। সংক্ষিপ্ত হলেও এ বইটির জন্য আমি মনে মনে কিছুটা আত্মপ্রসাদ বোধ করি। মুজিবর রহমান ছিলেন আদর্শ পুরুষ –Plain living and high thinking—এর এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সব যুগেই বিরল। সংবাদিকতার ক্ষেত্রে অতখানি নিষ্ঠা আর সততার পরিচয় আর কেউ দিয়েছেন বলেও আমার জানা নেই। নির্লোভ, আদর্শবাদী, দেশ ও সমাজ হিতৈষী এ মানুষটির প্রতি মনে মনে আমি একটা গভীর শ্রদ্ধা বোধ করতাম—আমার ছাত্রজীবন থেকেই। এ ক্ষুদ্র বইটি তারই নিদর্শন। সমাজে আজ সত্যিকার শ্রদ্ধেয় লোক দুর্লভ বললেই চলে। লেখকদের সামনে এও এক মস্ত বড় শূন্যতা। আমাদের চারপাশে আজ এমন কোন মহৎ চরিত্রবান লোক দেখা যায় না যাঁকে লেখকরা নিজেদের রচনার বিষয়-বস্তু করতে পারেন—যাঁদের চরিত্র থেকে তাঁরা পেতে পারেন মহৎ চরিত্র আঁকার প্রেরণা।

৩০. ৬. ৬৮

আমার সম্বন্ধে লেখা অধ্যাপক আনোয়ার পাশার 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল' বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান মন্তব্য করেছেন ঃ

আমাদের সাহিত্যে আবুল ফজল একটি সার্থক নাম। তাঁর মধ্যে এমন একটি শিল্পীসত্তাকে আমরা দেখি যা সৃষ্টির গৌরবে উজ্জ্বল, সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত এবং প্রত্যয়ের শক্তিতে শক্তিমান। আবুল ফজল আমাদের সাহিত্যের একটি অধ্যায়। তাঁর সাহিত্য আর সে সাহিত্যে প্রকাশিত চিন্তাধারা আমাদের হতাশাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত ও কুয়াশাচ্ছন্ন মনকে নাড়া দেয়। আমাদের ডাক দেয় জীবনের প্রশস্ত রাজপথে বেরিয়ে আসার যে পথ মুক্তির, যে পথ সমৃদ্ধির যে পথ 'সেরাতুল মুস্তাকিমে'র নূরের রোশনাইয়ে ভাস্বর। —মাহেনও, এপ্রিল, ১৯৬৮

একজন মানী পণ্ডিতের কথা হলেও নিঃসন্দেহে এ বেশ কিছুটা অতিরঞ্জিত উক্তি। আমার লেখা অতখানি প্রশংসার দাবী রাখে বলে

আমার নিজেরও বিশ্বাস নয়। তবে এটুকু বলা যায় আমরা দীর্ঘকাল ধরে, মুসলিম সাহিত্য সমাজের আমল থেকেই, যে কথা বলতে চেয়েছি, তা আজকের দিনের চিন্তাবিদদের মনেও সাড়া তুলছে এবং আমাদের কথা তাঁদেরও মনের কথা হয়ে যেন দেখা দিচ্ছে। এ দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে, মনে হয় আমাদের সাধনা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। যে কোন প্রশংসা, এমন কি মাত্রাধিক হলেও, তা লেখকদের কাছে প্রেরণা আর প্রত্যয়ের উৎস হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাও যে নেই তা নয়।

২৮. ৭, ৬৮

এ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব জেলাতেই ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল। আমাদের স্মরণকালে এমন বন্যা আর দেখা যায়নি। অগুণতি ঘর বাড়ী ধসে পড়েছে, বিশেষ করে মাটির ঘর একটিও নেই অক্ষত। সাধারণ মানুষের দুঃখের অন্ত নেই—আউস ধান ষোল আনাই নষ্ট, আমন ধানের চারা নিশ্চিহ্ন, অনেকের গোলার ধান গেছে ভেসে। হাঁস মুরগি গরু বাছুরের ত কথাই নেই। চারিদিকে অভাব, হাহাকার—গ্রামাঞ্চলে ভদ্র অভদ্র ধনী নির্ধন একাকার। সাময়িকভাবে সব যেন হয়ে গেছে এক দেহে লীন।

কিন্তু দেখে আনন্দ হয়, বুকে কিঞ্চিৎ সাহসও ফিরে আসে- এত দুঃখে দৈন্যেও দেশের সাধারণ মানুষ ভেঙ্গে পড়েনি, হারায়নি বিশ্বাস আর নিজের শক্তির উপর আস্থা। বন্যার পানি নামতে শুরু করতে না করতেই তারা আধ-পেটা খেয়ে বা না-খেয়ে নতুন উদ্যমে আবার চাষবাসের কাজে লেগে গেছে কোমর বেঁধে।

মনে হয় বৃষ্টির ভাণ্ডার এবার যেন ফুরিয়ে এসেছে। বহুদিন পরে রৌদ্র করোজ্জ্বল দিনের মুখ দেখা দিয়েছে, পথঘাট উঠেছে শুকিয়ে। চারদিকের সবুজ প্রকৃতি যেন আরো সবুজ ও নির্মল হয়ে দেখা দিয়েছে। বিস্তার করেছে সবুজের নয়ন মন ভোলানো সমারোহ সব দিকে

কিছুদিন আগেও দেখেছি সেগুন গাছগুলি পত্র-পল্লব রিক্ত নেড়া মাথায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। এখন তার ডাল পালাগুলি ঘন সবুজে নিবিড় হয়ে ধরেছে অপূর্ব শোভা, ঝিরি ঝিরি বাতাসে বড় বড় পাতাগুলো হচ্ছে আন্দোলিত। ষ্টেডিয়ামের সামনে কিশোর কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলি যে ভাবে ঘন শ্যামল রূপ নিয়েছে তা দেখে কিছুতেই ভাবা যায় না একদিন লালে লাল হয়ে জ্বলতে থাকবে এগুলি। কি সতেজ আর অদ্ভুত সবুজের মেলা বসেছে আমার প্রাতঃভ্রমণের পথের দু'পাশে! দেশের মাটি আর প্রকৃতির ঐশ্বর্য দেখে সত্যই মুগ্ধ হতে হয়। অথচ মাত্র কয়েকদিন আগেই তো প্রকৃতি কি এক ভয়াবহ প্রলয়ঙ্কর রূপ ধরে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা দেখিয়ে গেছে!

৫. ৯. ৬৮

আধুনিক সাহিত্য আর শিল্প, ধর্মের ধার ত ধারেই না, এমন কি বিজ্ঞান নিরপেক্ষও হতে চায়। চালায় বিনা দ্বিধায় এ দু'য়ের উপর বেপরওয়া আক্রমণ। অথচ এ দু'য়ের কাছ থেকেই সাহিত্য ও শিল্প পেয়েছে নিজের মন মেজাজ আর দৃষ্টিভংগী। ধর্ম যেমন চায় সাধারণ নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনকে ডিঙ্গিয়ে যেতে, পেতে চায় একটা অতিন্দ্রীয় লোকের ছোঁয়া, আধুনিক শিল্পেরও যেন তাই অভীপ্সা। বিজ্ঞান থেকে নিয়েছে এ শিল্প বস্তুনিরপেক্ষ জিজ্ঞাসায় অক্লান্ত শ্রমী মনোভাব, নিত্য নিরীক্ষা করে যাওয়া, সমবায়ী সহযোগিতা আর যৌথ আবিষ্কারের এষণা। মনের সব রকম বন্ধন মুক্তি এ শিল্পের লক্ষ্য। আবার এ লক্ষ্য সন্ধানের পথেই সে অজ্ঞাতে ঋণী হয়ে পড়ে ধর্ম আর বিজ্ঞানের কাছে—যা মন আর যুক্তির স্বায়ত্তশাসনেরই ফল। আধুনিক শিল্প মন আর যুক্তির দিক দিয়ে নৈরাজ্যিক—বিজ্ঞান আর ধর্ম তার বিপরীত। সুশৃঙ্খল মন আর সংযত মনন ছাড়া এ দুয়ের চর্চা চলে না। সব ব্যাপারে একটা নেতিবাচক ভংগির দিকেই আধুনিক শিল্পের গতি—এ যেন হতে চায় প্রকৃতি বিরোধী, মানবিকতা বিরোধী,

সমাজ-বিরোধী, যুক্তি-বিরোধী, এমন কি আবেগ-বিরোধীও।

মনে প্রশ্ন জাগে—মহৎ শিল্প কি স্রেফ নেতিবাদের উপর দাঁড়াতে পারে? আমার বিশ্বাস পারে না। এ প্রসঙ্গে কলিন উইলসনের একটি স্তবক স্মরণ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, উইলসন ইংলণ্ডের আধুনিকতমদের অন্যতম।—

Truly I live in a dark period.
To speak calmly is stupid.
A smooth forehead
Is a sign of insensitivity. The man who laughs
Has not yet been told
The terrible news.

এর বাংলায় অনুবাদ করলে হয়তো দাঁড়ায়ঃ

সত্যই আমি বাস করি এক অন্ধকার যুগে।
সংযত ভাবে কথা বলা স্রেফ বোকামী এখন।
রেখাহীন কপাল অনুভূতিহীনতারই স্মারক।
যে এখনো শোনেনি দারুণ দুঃসংবাদ
সে-ই শুধু পারে হাসতে।

যুগের এ দারুণ দুঃসংবাদ-ই কি আধুনিক শিল্পীদের এমন নেতিবাদী করে তুলেছে?

২০. ৯. ৬৮

গতকাল কবি-বন্ধু মতিউল ইসলাম তাঁর বাসায় আমার জন্য একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, উপস্থিত থেকে আমার সাহিত্য কর্মের উপর ভাষণ দিয়েছেন ডক্টর এনামুল হকও। যদিও অনুষ্ঠানটি ঘরোয়া ছিল তবুও স্থানীয় কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন, কেউ কেউ কবিতা পড়েছিলেন, কেউ কেউ অংশ নিয়েছিলেন

আলোচনায়। পড়া হয়েছিল আমার একটি প্রবন্ধও। চট্টগ্রাম্ বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের কেউ কেউ গান করে শুনিয়েছিলেন। একজন উর্দু কবি উর্দুতে রচনা করেছিলেন আমার প্রশস্তিমূলক এক কবিতাও যা বেশ সুললিত সুরে পড়ে শোনালে কবির নিজেরই এক কিশোর ছেলে। এ উপলক্ষে কবি মতিউল ইসলাম নিজে রচনা করেছিলেন দু'টি গান, উদ্বোধন আর বিদায় সঙ্গীত নাম দিয়ে তা ছেপে তিনি বিলিও করেছিলেন সভাস্থলে। স্থানীয় বেতার শিল্পীরা সুর দিয়ে গেয়েছিলেন গান দু'টি সভার শুরু আর সমাপ্তিতে। পরোক্ষে আত্মপ্রশংসার অভিযোগের পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উদ্বোধন সংগীতটি এখানে উধৃত করছি এ কারণে যে আমার জীবনের ঘটনাপঞ্জীতে বিশেষ করে 'রোজনামচায়' এর একটি বিশেষ স্বাক্ষর রয়েছে। অবশ্য গানের কথায় আমার নামটি উল্লেখিত না হলেই অধিকতর শোভন হতো আর তার আবেদনও হতো কিছুটা সার্বজনীন। গানটি এই :

আবুল ফজল আবুল ফজল
তুমি যে কীর্তিমান
তারকা বিহীন গগনে মোদের
(তুমি) জ্যোতিষ্ক অম্লান।
আলো ঝলমল তোমার বুকের বাণী
দেশের হৃদয়ে ছড়ায়ে পড়েছে জানি
লিখিলে তোমার নিজের জীবনে
জীবন জয়ের গান।
যখন আমরা ভাষাহারা হয়ে
আধমরা অচেতন
যখন মোদের মনের গহনে
শতবাধা বন্ধন

তখন তোমার বাণীর কমল দল
ছড়ায়ে ঝরায়ে সৌরভ পরিমল
দিয়েছে অশেষ ছলনার মাঝে
সত্যের সন্ধান।

যদিও মতিউল ইসলাম কবিতা লেখা এখন কমিয়ে ফেলেছেন অনেকদিন, তবুও মনে হয় তাঁর কবিতার এখনো মৃত্যু ঘটেনি। এক সময় দেদার কবিতা তিনি লিখতেন—প্রাক্ পাকিস্তান যুগে আমাদের প্রথম সারির কবিদের মধ্যে তাঁরও স্থান বেশ উঁচুতেই ছিল। তাঁর 'ফরিয়াদ' আর 'মাটির কন্যা' যে যুগের দুটি স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ—যা সে যুগের কাব্য রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেনি। পাকিস্তান যুগে তাঁর যে সব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'প্রিয়া ও পৃথিবী' উল্লেখযোগ্য। রূপ বর্ণনার আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন তিনি তাঁর 'সপ্ত কন্যায়।'

গত কালের অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্য এটুকু যে এতে ফুটে উঠেছে বন্ধুদের, সমবয়সী আর কনিষ্ঠদের প্রীতি ভালোবাসার এক নিঃসন্দেহ আন্তরিকতার অভিব্যক্তি। কে না জানে এ যুগে বন্ধুদের আন্তরিকতা এক দুর্লভ ধন। সে দুর্লভের স্বাদ গতকাল যা পেয়েছি তা আজো আমার মনে অনুরণিত হচ্ছে।

১০. ১০. ৬৮

মানুষ খাবার টেবিলে যতখানি ঐক্য বোধ করে, অন্যত্র বা অন্য সময় অতখানি করে না। দস্তরখানার সাম্য যে অতি সহজেই সখ্য ও ভ্রাতৃত্বের ভাব জাগায় তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। মনে হয় হিন্দু সমাজ বহু মহৎ চিন্তার অধিকারী হয়েও ঐক্যের এ আদি সূত্রটা ধরতে পারেনি—ফলে ঐ সমাজে ঐক্য অর্জন আজো এক রকম অসম্ভবই রয়ে গেছে। ভারতের বর্তমান দুর্গতির এও একটি কারণ। খাবার টেবিল থেকে ছুৎমার্গ নির্বাসিত হলে সহজেই ঐক্যের পথ রচিত

হয়। মানুষ আদতে জৈবিক—জৈবিক সূত্রে মিলন ঘটলে অন্যত্রও মিলন সহজ হয়।

*

জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণ চেহারা, আলুথালু বেশ, অর্থহীন প্রলাপ, ময়লা দেহ, জটাজুট, উদাসীন হাবভাব—এ সবই জনগণকে আকর্ষণ করে। এ জাতের সব রকম নির্বুদ্ধিতায় তারা সাধুতা দেখে আর তাতে পায় যেন একটা তৃপ্তি। এ সব কারণে দেখা যায় নিছক পাগলেরও ভক্তের অভাব হয় না আমাদের দেশে—তেমন লোককেও সাধারণ মানুষ পীর বানিয়ে ছাড়ে। আশ্চর্য, অত্যন্ত ধোপদুরস্ত কাপড় পরা শিক্ষিত লোককেও বদ্ধ পাগলের পা ধরে সালাম করতে দেখা যায়! এমন কি উদোম নেংটোদের পর্যন্ত!

* * *

আঁদ্রে জিদ বলেছেন: সাধু সন্তদের মধ্যে যেমন কেউ কোনদিন শিল্পী হয়নি তেমনি শিল্পীরাও কেউ কোনদিন হয়নি সাধু সন্ত। কথাটা অর্থপূর্ণ।

তাঁর এ কথাটাও মূল্যবান:

বিনয় খুলে দেয় বেহেস্তের দুয়ার আর

আত্ম-অবমাননা খুলে দেয় দোজখের দরজা।

মানুষ কিছু একটা আবিষ্কার করার চেয়ে সব কিছুর অনুকরণ করাকেই মনে করে সহজতর। এটিও আঁদ্রে জিদের উক্তি!

৮. ১১. ৬৮

আজকের ডাকে কাজী আবদুল ওদুদের কাছ থেকে এ চিঠিখানা পেলাম:

৩০. ১০. ৬৮

অশেষ প্রীতিভাজনেষু,

আপনার মেয়ের বিয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে, আমার শুভেচ্ছাটি সময়-মতো আপনার হাতে পৌঁছেছিল—জেনে খুশী হলাম। 'বুদ্ধির মুক্তির'

চাহিদা ও অঞ্চলে সহজভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে জেনে গভীর আনন্দ লাভ করলাম। ঐ বাণীটি যখন প্রথম চিত্তক্ষেত্রে জন্ম নিয়েছিল তখন আনন্দে যেন আত্মহারা হয়েছিলাম—যে পরিবেশে ঐ বাণীর জন্ম সে পরিবেশ সহজভাবে এটি গ্রহণ করতে পারবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলনা। কিন্তু সমাজের একজন চিন্তা-নেতা যখন ওটি বুঝতে পারলেন না, উল্টো তার কদর্থ করলেন তখন সহজ-ভাবেই সমাজ যেন মুষড়ে গিয়েছিল। সেদিন বন্ধুস্থানীয়দের অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এ কথাটি কি আমাদের সমাজ বুঝবে ?

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। বাণীটি বেঁচে থাকবে একথা বুঝেছিলাম, কিন্তু কতদিনে এ চিন্তা অনেকের চিন্তা হবে, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। তারপর আপনার উপন্যাসটি এক প্রবল ধাক্কা দিলে—সেদিনের আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে আপনাকে যে চিঠিখানি লিখেছিলাম তাতে।

এখানেও কিছু কিছু তরুণ কথাটির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, কেননা তাদের ধাক্কা দিয়েছে কমিউনিষ্ট চিন্তা। কিন্তু কোন চিন্তার পার্শ্বচর হলে ও বাণীটি কৌলিন্য হারায়। কিন্তু আপনাদের অঞ্চলে ও চিন্তাটা ধাক্কা দিচ্ছে জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ বাণী হিসাবেই—তার ফলে ও চিন্তা নিয়ে লাভবান আপনারাই হবেন। আপনি বুদ্ধির মুক্তি সম্বন্ধে ফলাও করে লিখুন—আপনার প্রতি এই এ-বাণীটির দাবী।”

আমি অন্যত্র বলেছি, ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের পেছনে ভাবযোগী ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ আর কর্মযোগী ছিলেন মরহুম আবুল হোসেন। বুদ্ধির মুক্তি কথাটি কাজী আবদুল ওদুদেরই অবদান। চিঠিতে সমাজের একজন চিন্তা-নেতা কথাটায় খুব সম্ভব তিনি মরহুম মওলানা আকরম খাঁকেই বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে মওলানা সাহেব তাঁর কাগজ মাসিক মোহম্মদীতে

কঠোর ভাষায় সুদীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন, এ নিয়ে তখন যথেষ্ট বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়। আমার যে উপন্যাসটির ইংগিত তিনি করেছেন সেটির নাম 'রাঙ্গা প্রভাত'।

কাজী আবদুল ওদুদ এখন বৃদ্ধ, বয়স সত্তরের উপর, তবে মন এখনো জড়তামুক্ত। এ চিঠিখানি নিজের হাতে লিখেছেন। মাঝখানে বেশ কিছুদিন অন্যকে দিয়ে লেখাতে হতো চিঠিপত্র—মনে হয় নিজে লিখতে পারতেন না তখন, মুখে মুখে বলে যেতেন আর কোন রকমে সইটা করতেন নীচে। ইদানিং, ক'মাস ধরে নিজের হাতেই চিঠি লিখছেন, অবশ্য লেখার ছাঁদ আগের মত নেই, অভ্যস্তরা ছাড়া অন্যের পক্ষে পড়া দুষ্কর। মনে হয় হাত কাঁপে, কলম যেন আর মানতে চায় না আঙ্গুলের শাসন।

তাঁর মতো এমন একজন চিন্তাবিদ সাহিত্যিক অবস্থার হেরফেরে পড়ে আজ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন, মনে হলে দুঃখ হয়। কিন্তু প্রতিকার তাঁর আত্মীয় ও অনুরাগীদের আয়ত্তাতীত। দুঃখটা এজন্য আরো বেশী।

১০. ১২. ৬৮

এর মধ্যে স্বল্পকালের ব্যবধানে যে ক'টা বই পড়ার সুযোগ পেয়েছি তার মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' অন্যতম। পুঁথি-সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কালেই আমার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না—ঐ সম্পর্কে তেমন অধ্যয়ন-অনুশীলনও করিনি আমি কোনদিন। কিন্তু এ বইটি সম্পাদনা গুণে আর হয়তো সৈয়দ আলী আহসানের পরিশীলিত ভাষার জন্য আমার কাছে খুবই সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। আকারে সুবৃহৎ কিন্তু পড়তে এতটুকুও ক্লান্তি বোধ করিনি। 'পদ্মাবতীর' এমন সুসম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ এর আগে আমি দেখিনি কোথাও। সম্পাদক এটির সম্পাদনায় যে নিষ্ঠা আর শ্রমের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই

অতুলনীয়। মালিক মুহাম্মদ জৈশীর মূল হিন্দীর সঙ্গে মিলিয়ে অনুবাদ আর সম্পাদনা করায় বইটির সাহিত্যিক আর গবেষণা-মূল্যও অনেক বেড়ে গেছে। আলাওলের রচনাবলীর মধ্যে ত বটেই, সমগ্র পুঁথি সাহিত্যেও 'পদ্মাবতী' এক অনন্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থ আর তার লেখককে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আলোচনা সমালোচনা আর বাদানুবাদ কম হয়নি, অথচ আশ্চর্য এমন একটি গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ইতিপূর্বে কি পূর্ব্ব কি পশ্চিম— কোন বাংলা থেকেই প্রকাশিত হয়নি। সৈয়দ আলী আহসানের 'পদ্মাবতী' শুধু যে সে অভাবটাই পূরণ করলো তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে আলাওল সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্রটাকেও করে দিলো প্রসারিত। নিঃসন্দেহে আমাদের ক্রম বর্ধমান গবেষণা সাহিত্যে এ বই এক মূল্যবান অবদান।

সাহিত্যে, বিশেষতঃ কাব্যে দেহ-চেতনা কিছুমাত্র উপেক্ষণীয় নয়, সৈয়দ আলী আহসানের নিজের কবিতায় এ চেতনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মনে হয় এ তাঁর মন দিয়ে 'পদ্মাবতী' আর তদ্-আনুষঙ্গিক বাংলা আর হিন্দী পুঁথি পাঠেরই ফল। না হয় তাঁর সমসাময়িকদের রচনায় দেহ-চেতনা প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। অব্যবহিত পূর্ববর্তীদের মধ্যে আবদুল কাদির ব্যতিক্রম — দেহ-চেতনা আর রূপ-বর্ণনা কাদিরের কবিতার এক বড় বৈশিষ্ট্য। মনে হয় তিনিও পুথির অভিনিবেশী পাঠক। তার উপর তিনি দেহবাদী মোহিতলালের অনুরাগী, কিছুটা অনুসারীও। তবুও নিজের বিশিষ্টতায় তিনিও স্ববিশেষ। এ কারণে তাঁর কবিতায় তাঁকে চেনা যায়। এ চেনা যাওয়াটা কবির পক্ষে যেমন তেমনি তাঁর কবিতার পক্ষেও একটি বড় গুণ। তবে অত স্বল্পপ্রসূ কবির খ্যাতি দীর্ঘস্থায়ী আর খুব দূর প্রসারী হবে কিনা সন্দেহ।

উপন্যাসের মধ্যে খোন্দকার ইলিয়াসের 'কতো ছবি কত গান' পড়লাম। বিরাট বই, দাবী করা হয়েছে আকারে এটি পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত বৃহত্তম উপন্যাস। উপন্যাসের আকারে লেখা

হলেও এতে এমন বহু বিষয় আমদানী করা হয়েছে যা সাক্ষাৎভাবে উপন্যাসের ঘটনাবলী কিম্বা তার পাত্রপাত্রীদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় মোটেও। অপ্রাসঙ্গিক বহু প্রক্ষিপ্ত বিষয় এসে পড়ায় উপন্যাসটির কলেবর আশাতিরিক্ত ভাবে না বেড়ে পারেনি। দাসপ্রথা ঔপনিবেশিকবাদ, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সে সংগ্রামের কুশীলবদের জীবন সমীক্ষা, এশিয়া-আফ্রিকার গণজাগরণ, পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব, সে সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্ব ইত্যাদি যা-কিছু লেখকের প্রিয় বিষয় সে সব এ বইর এক প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে। কলাকৌশলের দিক দিয়ে এটিকে খুব সার্থক উপন্যাস হয়তো বলা যাবে না; কিন্তু এ বইর এক মস্ত অবদান, এটি আমাদের উপন্যাসকে নিয়ে গেছে ঘরোয়া পরিবেশ আর স্বদেশ সীমার বাইরে, বাড়িয়ে দিয়েছে উপন্যাসের পরিধি আর বিষয়-বস্তুর সীমানা। এদিক দিয়ে খোন্দকার ইলিয়াসের কৃতিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই, বিশেষতঃ বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়ন অনুশীলনে তিনি যে নিষ্ঠা আর শ্রমের পরিচয় দিয়েছেন, যা 'কতো ছবি কতো গানে' অসন্দিগ্ধভাবে প্রতিফলিত, তা যদি আমাদের নবীন ঔপন্যাসিকদের অনুপ্রাণিত করে তাতেও আমাদের সাহিত্য উপকৃত হবে—তাহলে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য বিস্তারে আর বিষয়-বৈচিত্র্যে হয়ে উঠবে সমৃদ্ধ। বইটি পড়ে অনেক কিছু আমার জানা হয়েছে যা আমি আগে জানতাম না। যে কোন সফল গ্রন্থ মানুষের শুধু অনুভূতি আর আবেগকে জাগায় না, পাঠকের জ্ঞানের সীমাকেও বাড়ায়। 'কতো ছবি কতো গান' তেমন একটি গ্রন্থ।

ডষ্টোভস্কি সম্বন্ধে আঁদ্রে জিদের লেখা একটি বই হঠাৎ পেয়ে গেলাম। আঁদ্রে জিদ নিজে বিশ্ববিখ্যাত লেখক, আর লিখেছেন বিশ্বের এক সেরা ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে। সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনা আর নামজাদা লেখকদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সব সময়

আমার এক প্রিয় পাঠ্য। জিদের বইটি তাই সাগ্রহে পড়ে ফেললাম। জিদ অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি আর বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অসীম জ্ঞান নিয়ে ডষ্টোভস্কিকে করেছেন অধ্যয়ন। য়ুরোপীয় লেখকদের জ্ঞানের পরিধি দেখলে অবাক হতে হয়—ওঁদের সামনে আমাদের নিজেদের মনে হয় নেহাৎ নাবালক। উপলখণ্ড সংগ্রহ দূরে থাক, মনে হয় আমরা এখনো সমুদ্র-তীরেই পারিনি পৌঁছতে।

ডষ্টোভস্কি নিজেও কি কম পণ্ডিত ছিলেন!

১৮৫৪-এর ২২শে ফেব্রুয়ারী সাইবেরিয়ার কারা-জীবন থেকে তিনি ভাইকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানান: 'তাঁর জন্য এক কপি কো'রান, কান্টের Critique of pure Reason, হেগেলের রচনা, বিশেষ করে তাঁর দর্শনের ইতিহাস' পাঠাতে। সে সঙ্গে মন্তব্য করেছেন: 'Upon that depends my whole future।' ডষ্টোভস্কি এভাবে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক জীবন। ঐ বছরের ২৭শে মার্চের অন্য এক চিঠিতেও উক্ত ভাইকে ফের অনুরোধ করেন: তাঁকে এক কপি কোরান, একটি জার্মান ভাষার অভিধান আর 'As many of the classics as possible, অর্থাৎ যতখানি সম্ভব ধ্রুপদী বই পাঠাতে। কত বিচিত্র আর বিপরীতধর্মী জ্ঞানের সাহায্যেই না ডষ্টোভস্কি নিজেকে উপন্যাস লেখার জন্য তৈরী করে নিয়েছিলেন। এঁদের প্রস্তুতি-পর্বের খতিয়ান নিলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়।

ঔপন্যাসিককে স্রেফ গল্প উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হলেই চলে না, মানব-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত তাবৎ জ্ঞানকে সামনে রেখেই তাঁকে এগুতে হয় লেখার পথে।

ঐতিহাসিকের পক্ষে ইতিহাসের, দার্শনিকের পক্ষে দর্শনের, বিজ্ঞানীর পক্ষে বিজ্ঞানের, ধার্মিকের পক্ষে শাস্ত্রীয় বই-পুস্তক পড়লে বা সেটুকু জ্ঞান আয়ত্ত করলেই হয়তো চলে কিন্তু ঔপন্যাসিকের

পক্ষে জ্ঞানের তেমন কোন বিশেষ শাখারোহী হয়ে থাকলে মোটেও চলে না—বিদ্যার সব শাখা-প্রশাখায় তাঁর বিচরণ সহজ হওয়া চাই। বিশেষজ্ঞের অর্থে না হলেও স্রেফ জানার দিক দিয়ে তাঁকে হতে হয় সর্ববিদ্যাবিশারদ। উপন্যাস-লেখককে ইন্দ্রিয় থেকে অতিন্দ্রীয়, আত্মা থেকে পরমাত্মা, জীব থেকে শিব, শয়তান থেকে ফেরেস্তা, দস্যু থেকে দরবেশ, সব ঘাটের, সব পারাপারের, সব জাহাজের খবর নিতে হয়, রাখতে হয়। স্রেফ আদার ব্যাপারী হয়ে থাকলে চলে না ঔপন্যাসিকের।

ডষ্টোভস্কি এ করেই সফল ঔপন্যাসিক হয়েছেন। ঔপন্যাসিকের কাছে কোন জ্ঞানই অপাংক্তেয় নয়, এ বিশ্বাস ছিল তাঁর আন্তরিক।

ডষ্টোভস্কি থেকে আর একটা পাঠ আমাদের নেওয়ার আছে—তিনি আর তাঁর রচনা খাঁটি অর্থেই খাঁটি রুশ। এবং তা বলেই তাঁর সাহিত্য হয়েছে যথার্থভাবেই মানবিক তথা বৈশ্বিক।

ডষ্টোভস্কির এদিকটার উপর জোর দিয়ে আঁদ্রে জিদ বলেছেন:
There never was an author more Russian in the strictest sense of the word and withal no universally European. Because it is essentially Russian, his humanity is all embracing and touches each one of us personally.

অকৃত্রিম মানুষ সর্বত্রই এক—সে অকৃত্রিম মানুষটার উদ্ঘাটন, উদ্ভাসনই সাহিত্যের কাজ। বিশেষত কথা সাহিত্যের।

মানবতাকে পুরোপুরি বুঝতে ও উপলব্ধি করতে হলে নিজের কাছের মানুষের ভিতর দিয়েই করতে হয়। ডষ্টোভস্কি তাই করেছেন—এর ফলে তাঁর রচনা খাঁটি রুশীয় হয়েই হয়েছে, জিদের ভাষায়, খাঁটি য়ুরোপীয় ও সর্বগ্রাহী তথা সর্বজনগ্রাহ্য। এ সম্বন্ধে

ডষ্টোভস্কির নিজের মন্তব্যও স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন। A Raw Youth উপন্যাসে তিনি যা বলেছেন তা সব দেশের সব লেখকের বেলায়ই খাটে "...Every Frenchman can serve not only his Franch, but humanity, only on condition that he remains french to the utmost possible degree, and it is the same for the Englishman, and the German,..." এর সঙ্গে আমরাও যোগ করে নিতে পারি আমাদের দেশের নাম। অর্থাৎ আমরাও যদি দেশের খাঁটি মানুষ হই, হই মাটির খাঁটি সন্তান তখনই আমাদের দ্বারা এমন সাহিত্য রচনা সম্ভব হবে যা যুগপৎ দেশের হয়েও হবে বৈশ্বিক আর মানবিকও।

বৈদেশিক হওয়ার মধ্যে মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যায় যার ফলে শিল্পী নিজের প্রতিও খাঁটি হতে পারেন না। মানবতা সর্বত্র এক বটে, তবে গাছ যেমন একটা নির্দিষ্ট মাটিতে শিকড় গেড়ে বেড়ে পল্লবিত হয়ে উঠে, মানবতাও তেমনি একটা ভৌগোলিক পরিবেশেই হয়ে ওঠে বিকশিত। লেংরা আম এ দেশের মাটিতে জন্মালেও বিশ্বজনের ভোগ্য হতে বাধে না। পূর্ববঙ্গ গীতিকা খাঁটি দেশজ বলেই আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেয়েছে অতি সহজে।

শুধু ডষ্টোভস্কির কেন সারা রুশ সাহিত্যেরই এ এক বড় বৈশিষ্ট্য যে তা পুরোপুরি রুশীয় আর তা বিশ্বজনের দরবারে পৌঁচেছেও এ পথেই। বলা বাহুল্য, আমাদের সাহিত্যেরও এ পথ অর্থাৎ দেশজ হয়েই হতে হবে আন্তর্জাতিক।

৩০. ১. ৬৯

সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের দিক থেকে বিচার করে না দেখার ফলে আমাদের দেশে তথাকথিত পীর-দরবেশদের প্রশ্রয় আর অহেতুক

প্রভাব অসম্ভব বেড়ে গেছে। এঁদের প্রতি দুর্বল-চিত্ত - মানুষের আকর্ষণ আর ভক্তি গদগদ হওয়ার বড় কারণ বিচার-বিমুখতা—কোন কিছুকে যাচাই করে গ্রহণ এ যেন আমাদের ধাতেই সয় না। ধর্মের ভেক থাকলে ত আর কথাই নেই। অথচ সহজ চোখেই দেখা যায় এসব পীর ফকিরেরা সমাজ দেহের এক একটা পরগাছা আর পরভৃত ছাড়া কিছুই না। সমাজ কল্যাণমূলক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে এরা চিরকালই গরহাজির, দেখা যায় না এঁদেরে দেশ বা সমাজের কোন সৃষ্টিমূলক কাজ কর্মে শরিক হতে। একমাত্র বংশ বৃদ্ধি ছাড়া দেশের সম্পদ বলতে যা বুঝায় তার উৎপাদনে এঁদের অস্তিত্ব চিরকালই দুর্নীরিক্ষ—দেশ গঠনে যেমন তেমন দেশ রক্ষায়ও এঁদের নেই কোন ভূমিকা। মানব কল্যাণমূলক কাজে এঁদের তেমন কোন মহৎ অবদানের কথা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ এঁদেরে পুষতে দেশের নিরক্ষর জনগণের কি অশেষ ত্যাগই না স্বীকার করতে হয়। নিরক্ষর বলাও হয়তো ঠিক নয়, শিক্ষিতদের মধ্যেও এঁদের অন্ধভক্তের অভাব নেই। মানুষের বুদ্ধির প্রতি সব চেয়ে নিদারুণ পরিহাস এনে জমি-জেরাতের মতো এ সব লোকের সাধুতা বা ফকিরীও বংশানুক্রমিক মিরাছ হয়ে বিরাট এক অদৃশ্য পুঁজি হয়ে দাঁড়ায়—যা কালক্রমে শতবাহু হয়ে অন্ধবিশ্বাসী মুরিদদের দোহন করে করে হয়ে ওঠে আরো স্ফীত ও মেদবহুল।

এভাবে অন্ধ ভক্তি রপ্ত হতে হতে এমন হয়ে পড়ে যে, দৈনন্দিন বাধ্যতামূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিও যারা অগ্রাহ্য করে, দেখা যায় তেমন পীর ফকির কিম্বা তাদের অপদার্থ বংশধরদের প্রতিও এসব মুরীদদের ভক্তিতে কিছুমাত্র ভাটা পড়ে না। যুক্তি বিচার আর বুদ্ধিচর্চার অভাবে মানুষের মন এভাবে হয়ে পড়ে অভ্যাসের দাস। বলা বাহুল্য, মানসিক দাসত্ব শারীরিক দাসত্বের চেয়ে অনেক বেশী ভয়ংকর।

চল্লিশ বছর আগে ঢাকায় যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল, মনে হয় তার প্রয়োজন আমাদের সমাজে আজো নিঃশেষিত নয়। বরং প্রয়োজনটা যেন আরো বেশী ক'রে দেখা দিয়েছে এখন।

অন্ধ বিশ্বাসও এক রকম মারাত্মক ব্যাধি—বুদ্ধি আর যুক্তিবাদের অনুশীলনই তার একমাত্র চিকিৎসা।

২৬. ৩. ৬৯

গতকাল সকালের দিকে বিখ্যাত কৃষক নেতা শ্রীমণি সিং আমার প্রাক্তন ছাত্র চৌধুরী হারুনর রশীদকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সাহিত্য নিকেতনে। এঁরা জেলে আর আত্মগোপন অবস্থায় আমার কোন কোন বই পড়েছেন, আমার প্রতি এঁদের অনুরাগের ঐ একমাত্র কারণ। মণি সিং বিশেষ করে আমার রেখা-চিত্রের প্রশংসা করলেন। অবস্থার হেরফেরে যাঁরা লোক চক্ষুর অন্তরালে ফেরারী জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন, আমার রচনা তাঁদের অন্তরেও প্রবেশ পথ খুঁজে নিতে পেরেছে এ আমার জন্য কম সৌভাগ্যের কথা নয়। মণি সিং-এর সেবা বনাম নির্যাতন ভোগের ইতিহাস সুদীর্ঘ। তাঁর প্রধান কর্ম ক্ষেত্র পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক সমাজ। আমাদের দেশে শতকরা আশি জনই কৃষিজীবী আর তারা যে অত্যন্ত অবহেলিত, নির্যাতিত আর জীবনের ন্যূনতম দাবী থেকেও বঞ্চিত তা এক রকম সর্বজনবিদিত সত্য। তাই জীবনের কর্মক্ষেত্র হিসেবে তিনি এ কৃষক সমাজকেই বেছে নিয়েছেন। তার ফলে ইংরেজ আমল থেকেই নানা সময় নানা নির্যাতন আর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে—অধিকন্তু দীর্ঘ সময় আত্ম-গোপন থেকে চালিয়ে যেতে হয়েছে নিজেদের অভিষ্ট কাজ। এভাবে কাজ করা যে কি বিপজ্জনক আর কতখানি কষ্টকর এক ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে তা আন্দাজ করাই মুস্কিল। এ রকম অবস্থায়, বছর দুই আগে হঠাৎ ধরা প'ড়ে যান তিনি ঢাকার এক রাস্তায়।

মাত্র অল্পকাল আগে ছাড়া পেয়েছেন উত্তাল গণ-জাগরণ আর দুর্বার ছাত্র-আন্দোলনের ফলে। গত ২৪শে মার্চ তাঁকে আর কয়েকজন সদ্য কারামুক্ত রাজবন্দী আর হুলিয়া থেকে ছাড়া-পাওয়া স্বদেশ-কর্মীকে এক গণসংবর্ধনা জানানো হয়েছিল চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে। আমাকে করতে হয়েছিল ঐ সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব। সে সভাতেই আমার প্রথম দেখা মণি সিং-এর সাথে। বুড়ো হয়েছেন, সত্তরের কাছাকাছি বয়স, দুঃস্থ কৃষক সমাজের পেছনে নিজের আয়ু আর যৌবনকে ক্ষয় করে এখন জীবনের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। মনে হলো তবুও দমেননি। সেদিনের সভায় মতিয়া চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন—কারাগার থেকে তিনিও মাত্র কয়েকদিন আগে বেরিয়ে এসেছেন। ছাত্র-রাজনীতির পথ বেয়েই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীর সংখ্যা অতি নগণ্য—এ প্রতিভাময়ী তরুণীর আবির্ভাব তাতে একটি সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে মহিলা সমাজের সামনে। আজকের দিনে রাজনীতি এমন সর্বব্যাপক হয়ে উঠেছে যে মেয়েদেরও এতে অংশ না নিয়ে উপায় নেই। ছাত্র-রাজনীতির অভিজ্ঞতা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা নিয়েই মতিয়া রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেছেন—এ প্রবেশের মুখেই তিনিও নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কারাগারে। তাঁর মুক্তিও এ দুর্বার গণজাগরণেরই ফল। এ গণজাগরণ অনেক বিকৃতি আর অপরাধমুলক কাজকেও যে প্রশ্রয় দেয়নি তা নয়—সে সম্পর্কে আমার অন্যত্র আলোচনার ইচ্ছা রইল। তবে এ অনেক অসাধ্য সাধনও যে করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এ জাগরণ—আর আন্দোলনের ফলে সুদীর্ঘ এগারো বছর পরে কৃষক-নেতা আবদুস সাত্তার আর শ্রমিক-কর্মী চৌধুরী হারুনর রশীদও ফেরারী-জীবনের অন্ধকার থেকে মুক্তির আলোয় বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। এবং এর ফলেই রাজবন্দী শ্রীপূর্ণেন্দু দস্তিদারও কারাগার থেকে বেরিয়ে

এসেছেন মুক্তির আলো-হাওয়ায়। সম্মিলিত ভাবে এঁদের সবাইকেই সেদিন সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

কৃষক-কর্মী হিসেবে জনাব আবদুস সাত্তারের নাম বহু দিন শোনা ছিল। চাটগাঁর লোক হওয়া সত্বেও কিন্তু ইতিপুর্বে তাঁর সঙ্গে আমার কখনো দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেনি। এবার বেরিয়ে আসার পরই প্রথম দেখা। তাঁরও কর্মক্ষেত্র কৃষক সমাজ, দীর্ঘকাল ধরে কৃষকদের সেবায়, ওদেরে জাগিয়ে তোলার কাজে তিনি আত্মনিবেদিত। এমন একনিষ্ঠ কর্মী আমাদের সমাজে খুব বেশী নেই।

পূর্ণেন্দু দস্তিদারের জীবনের সুদীর্ঘ সময় জেল প্রাচীরের অন্তরালেই কেটেছে, জেল প্রায় তাঁর ঘর হয়ে উঠেছে বল্লেই চলে। জেল-জীবনের গোড়ার দিকে জেল-প্রাঙ্গণে তিনি নিজের হাতে যে পেয়ারা আর আমের চারা লাগিয়েছিলেন এবার গিয়ে নাকি তার ফল খেয়েছেন, জেল-কর্মচারীরা ত আগে থেকেই খাচ্ছেন! তিনি সুলেখক, আঁকতেও পারেন ভালো। তাঁর লেখা 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' একটি উল্লেখযোগ্য বই। তাঁর রচিত 'কবিয়াল রমেশশীল'ও একটি মূল্যবান প্রকাশনা। তিনি এক নিরলস কর্মী মানুষ—রাজনীতি, সমাজ-সেবা আর সাহিত্য—এ তিনের প্রতি তাঁর সমান আগ্রহ। হারুণ এখনো তরুণ। চট্টগ্রাম কলেজে অল্পকালের জন্য ও আমার ছাত্র ছিল। তখন থেকেই ও রাজনীতি আর দেশসেবার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে এবং পরিণামে তাতে জড়িয়ে পড়ে আষ্টে-পৃষ্টে। ফলে অকালে পড়াশোনা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজনীতি আর দেশ সেবার বিপদ সংকুল পথে। কারাগারে কেটেছে ওর অনেককাল—তারপর শুরু হয় সুদীর্ঘ ফেরারী জীবন। হারুণের মতো অমন আন্তরিক ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী সব সমাজেই বিরল। ওর কর্ম ক্ষেত্র আমাদের শ্রমিক শ্রেণী—ওদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব আর ভাগ্যোন্নয়নই মনে হয় ওর এখনকার

রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য। প্রথম দিকে রেল শ্রমিকদের মধ্যেই ওর কর্মক্ষেত্র সীমিত ছিল—তখন ও সম্পাদনা করতো শ্রমিকদের মুখপত্র 'আওয়াজ' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকাও। এখন ওর কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়েছে মিল শ্রমিকদের মধ্যেও।

যে ক'জন নির্লোভ আদর্শনিষ্ঠ কর্মীর নাম এখানে উল্লেখ করা হলো এঁরা কোনদিনই নেতা হতে চায়নি, চায়নি জিন্দাবাদ আর ফাঁকা হাততালি পেতে। মনে হয় আজো তাঁরা সর্বতোভাবে সে সহজ পথ এড়িয়ে চলেন। নিজেদের যথাসম্ভব লুপ্ত আর জনতার পেছনে সরিয়ে রেখেই এঁরা দেশের কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্য বদলাবার দুরূহ দুর্গম পথকেই নিয়েছেন বরণ করে। এমন মানুষের কপালে যে বহু দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-নির্যাতন অবধারিত তা দেশের মানুষের মতো তাঁদেরও অজানা নয়। তবুও তাঁরা নন ভগ্নোদ্যম।

আমি নিজে ত্যাগী কিম্বা কর্মী মানুষ নই। তবুও যে কোন আদর্শনিষ্ঠ আন্তরিক কর্মী ও আত্মত্যাগী মানুষের প্রতি আমি একটা শ্রদ্ধাবোধ না করে পারি না। তাই সেদিনের সংবর্ধনা সভার উদ্যোক্তাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি যদিও আমার কর্ম ও চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। তার উপর আমার বিশ্বাস লেখকের জন্য কোন এলাকাই নিষিদ্ধ নয়—মানুষের মতো মানুষের সব কর্মও তাঁর বিষয়ীভূত।

২৮. ৩. ৬৯

যিনি লেখক তাঁকে এমন অনেক কিছুই লিখতে হয়—যা না লিখে তিনি পারেন না। লাভ লোকসান খতিয়ে দেখার তর সয় না তাঁর। সম্প্রতি এক বন্ধু একটি বিশেষ সাহিত্য পুরস্কার নেবেন না বলে ঘোষণা করেছেন কিন্তু কারণ হিসেবে তিনি যে সাফাই দিয়েছেন তা মোটেও যথাযথ নয় বরং বলা যায় স্রেফ কাল্পনিক। নিজের গায়ে সরাসরি না লাগলেও লেখকরা অন্যায় আর

অসত্য সহ্য করতে পারেন না সহজে—লেখা আর লেখক সম্বন্ধে এ আমার বিশ্বাস ও ধারণা। বন্ধু বিচ্ছেদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তাই এবারও আমি প্রতিবাদ না করে পারিনি। আমার প্রতিবাদের কথা শুনে উক্ত বন্ধুটির এক অনুরাগী তরুণ কবি নাকি বলেছেন তাঁরা আটাশজনে সই করে আমার প্রতিবাদের প্রতিবাদ করবেন সংবাদপত্রে। কথাটা শুনে আমার পক্ষে হাসি সংবরণ করা কঠিন হলো এ কারণে যে, যা সত্য তা যেমন আটাশ জনে বল্লে, কি সমর্থন করলেই আটাশ গুণ সত্য হয়ে দাঁড়ায় না, তেমনি যা মিথ্যা তাকে আটাশ দ্বিগুণে ছাপ্পান্ন জনে সমস্বরে সমর্থন জানালেও তা মিথ্যাই থেকে যায়। সত্য একজনে বল্লেও সত্য, মিথ্যা বহু জনে বল্লেও মিথ্যা। বরং সাফাই সাক্ষী দিতে গেলে মিথ্যাটা যে স্রেফ মিথ্যা তা আরো বেশী করে ধরা পড়ে হাতেনাতে। বলা বাহুল্য, সত্যের কোন সাফাই সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না।

২. ৩. ৬৯

দিলীপ কুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণে' 'দিলাশা' বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর আগে এ শব্দের ব্যবহার আমি দেখিনি। দিল আর আশা সন্ধি করেই বোধ করি, শব্দটা গঠিত। দিলের আশা তথা উৎসাহ উদ্দীপনা তাঁর প্রয়োগ থেকে মনে হলো শব্দটার এ অর্থই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। এটি তাঁর নিজের তৈয়ারি শব্দ না বাংলা দেশের কোন অঞ্চল বিশেষে তা প্রচলিত—এ খবর আমার অজানা। সহজবোধ্য নতুন শব্দ গড়া বা চালু করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। এতে ভাষা সমৃদ্ধ হয়, ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা বাড়ে। পরে দেখেছি হিন্দীর পথ বেয়ে শব্দটি উর্দুতেও ব্যবহৃত হয়। সৈয়দ মুজতবা আলীও তাঁর 'দেশে বিদেশে' বইতে 'দিলাশা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শুনেছি শব্দটি আদতে হিন্দী। দিলীপ কুমারের স্বচ্ছন্দ রচনাশৈলী আমার প্রিয়, কিন্তু

তাঁর অত্যধিক ভক্তিবাদ, বিশেষ করে গুরুবাদ আমার যুক্তিবাদী মন কিছুতেই মেনে নেয় না। তবুও তাঁর লেখা একটানা পড়ে যেতে কিম্বা উপভোগ করতে আমার বাধে না। বিপরীতমনা পাঠককেও এ ভাবে আকর্ষণ করতে পারা নিঃসন্দেহে রচনার এ এক বড় গুণ। তাঁর লেখায় অন্তরঙ্গতার এক আশ্চর্য দোলা অনুভব করা যায়। সমাধি অবস্থায়—যার প্রচুর উচ্ছ্বসিত ভক্তি গদ গদ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাঁর 'স্মৃতিচারণে', কৃষ্ণ বা কালীকে স্বচক্ষে দেখা বা না দেখার সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন ছাড়াও এ সম্পর্কে এ জিজ্ঞাসাও আমার মতো পাঠক-মনে উদয় হয়ঃ এতে কার কি ফায়দা? দর্শকের নিজের, বিশ্বের বা তাবৎ মানব সমাজের? ভারতে এমন বহু ভক্তের আবির্ভাবের কথা বহু গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। এমন কি কোন কোন আধুনিক লেখকও এ ধরনের ভক্তিবাদের বর্ণনায় চরম লিপি-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। লিপি-চাতুর্যের জনপ্রিয়তা অনেক সময় চিত্রতারকাদের জনপ্রিয়তার মতই। কালের হাতের রবারের একটা ঘষাতেই যা মুছে যায়।

ঈশ্বর দর্শন সম্ভব, বহু ভক্তের ঈশ্বর দর্শন ঘটেছে এ কথা যদি মেনেও নেওয়া যায় তা হলেও ত প্রশ্নটার ইতি ঘটে না। জিজ্ঞাসা করা যায়ঃ এতে সামগ্রিক ভাবে ভারত বা ভারতবাসীর কি লাভ হয়েছে? যে সব দেশে এমন দেব-দর্শন ঘটে না বা ঘটেনি কোন-দিন সে সব দেশেরই বা এমন কি মারাত্মক ক্ষতিটা হয়েছে? মহা-যোগী অরবিন্দের ভাব-সমাধিও ভারতীয় জনগণের জন্য তেমন কোন মহাকল্যাণ বহন করে এনেছে বলে শোনা যায়নি। এমন কি এদেশের কি ওদেশের স্বাধীনতাও এসেছে রাজনৈতিক নেতা আর কর্মীদের দ্বারাই। বরং দেখা গেছে এসব সমাধি-সিদ্ধ যোগীদের কেউ কেউ সংগ্রাম ক্ষেত্র ত্যাগ করে অতি নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন আশ্রম গুরু হয়েই বসে গেছেন। সত্যিকার সংগ্রামের সময় এঁদের চুল-

দাড়ি-টিকি কিছুই দেখা যায়নি। অধিকন্তু তাঁদের আরাম-আয়েস আর খোরপোষের ভার তাঁরা তুলে দেন অপরের শ্রমের উপর। আমার নিজের মনেও এ প্রশ্ন জাগে: এ ভাবে যদি আল্লাহ আমাকে দেখা দেন তা হলে বা তার ফলে আমি কি আরো সৎ ও লোক হিতকর মানুষ হয়ে উঠব? আমার দ্বারা দেশ আর মানব জাতির তাতে কি অধিকতর কল্যাণ সাধিত হবে? তেমন কোন অলৌকিক শক্তি আর অসাধ্যসাধনী যোগ্যতা কি মুহূর্তেই আমার অর্জিত হয়ে যাবে? পৃথিবীতে এত যে যুদ্ধ আর রক্তপাত আমি কি তা তখন বন্ধ করতে পারবো? আমি কি তখন হতে পারবো তেমন শক্তির অধিকারী? ঈশ্বর-দর্শন যদি জীবনের কোন কাজেই না লাগে তা হলে তার উপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়ার দরকারটা কি? কিছুটা সংশয়ী বলেই কি এ সব জিজ্ঞাসা মাঝে মাঝে আমার মনকে আলোড়িত করে তোলে? জানি না। এ ছাড়া অন্য কোন উত্তর আজো আমি খুঁজে পাইনি।

৭. ৪. ৬৯

বাহ্যিক সব কথা সব আচরণ হয়তো পষ্টাপষ্টি বলা বা লেখা যায়। কিন্তু প্রতি মানুষের অন্তর-জীবনের একটা গুহ্য দিক আছে—তার সঙ্গে ধর্ম ও আত্মিক উপলব্ধির সম্পর্ক নিবিড়। সাধারণত আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্বন্ধে আমি কিছুটা উদাসীন, অনেক সময় তার নিষ্করুণ বুদ্ধিহীনতা আমাকে পীড়া দেয়। আমার অনেক রচনায় তার দেদার প্রতিবাদ রয়েছে। তবে মুখে বা কলমে আমি যাই বলি বা লিখিনা কেন, মনে হয় আমার ভিতরেও একটা ধর্ম-চেতনা ফল্গুধারার মতো নীরবে প্রবাহিত রয়েছে। এ ব্যাপারে আমার মধ্যেও স্ববিরোধিতার অন্ত নেই।

অনেক সময় ধর্মকে, আল্লাহকে আমি অস্বীকার করতে চেয়েছি, কারণ আমার যুক্তিবাদী সত্তা যুক্তি দিয়ে ঐ সবের কোন হদিস

পায় না। অথচ অস্বীকার করতে পারিনি, পারিনে আজো। এ না-পারার হয়তো একটা বড় কারণ আমার জন্ম এক গভীর ধর্ম-বিশ্বাসী পরিবারে। আমার শৈশব কৈশোর কেটেছে ঐ পরিমণ্ডলেই। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সব আনুষ্ঠানিক ধর্মই দীর্ঘকাল রপ্ত করতে হয়েছে আমাকেও। কালক্রমে তার অনেক কিছুই অভ্যাসের রূপ নিয়েছে আমার ব্যবহারিক জীবনে আর হয়ে পড়েছে তা আমার অন্তর-সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ডক্টর এনামুল হক আমার সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে একবার মন্তব্য করেছিলেন—আমার সাহিত্যের মূল বুনিয়াদ নাকি ধর্ম, তিনি এ সিদ্ধান্তে কি করে পৌঁচেছেন তা আমি বলতে পারবো না। আমার অন্তরের গভীর অনুভব-অনুভূতি আর অন্তর-সত্যের দিকে তাকালে তাঁর সিদ্ধান্ত যে অনেকখানি নির্ভুল, ইদানীং আমার মনেও তেমন একটা বিশ্বাস যেন জন্ম নিতে শুরু করেছে। যদিও বাইরের দিক থেকে দেখলে আমার সাহিত্যে দেদার কালা পাহাড়ী কাণ্ড যে আবিষ্কার করা যাবে না তা নয়। যে-স্ববিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছি মনে হয় এ তারই ফল। আমি প্রতি ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী হতে চেয়েছি, তাই ধর্মীয় অর্থে ভক্ত বা বিশ্বাসী হয়ে উঠা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদিও আমার প্রথম জীবন আর শিক্ষাগত পরিবেশ ছিল এর সম্পূর্ণ অনুকূল।

ভক্তি আর বুদ্ধির মধ্যে একটা চিরন্তন বিরোধ রয়েছে। মনে হয় আমিও এ বিরোধের শিকার। বিশ্বাস মানে অন্ধ বিশ্বাস—যত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মূল এখানে। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর—এ আপ্ত বাক্যে আমি কোন স্বস্তি পাই না, পারিনি কোনদিন এতে স্থাপন করতে কোন রকম আস্থা। অন্ধ বিশ্বাস মানে মনের পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়তা, নিজের বিবেক বুদ্ধিকে তালাক দেওয়া। এ করা আমার পক্ষে কিছুতেই হয়ে ওঠে না বলে আমার মন মাঝে

মাঝে হয়ে ওঠে কালাপাহাড়। এতে যে আমার কোন অনুতাপ অনুশোচনা হয় তাও না। তাই মনে হয় আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের হাত থেকে কোন কালেই রেহাই নেই আমার।

উল্লেখ করেছি ভক্তি বিশ্বাসের নির্মল আবহাওয়া আর পরিবেশেই আমি মানুষ। ফলে এমন কিছু ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠান অভ্যাসের পথে রপ্ত হতে হতে এখন প্রায় স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটিক হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার মধ্যে। যেমন ধরুন কোন কিছুর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ না বলে আমি পারি না। এমন কি লিখতে বসে কলমটা কাগজে ঠেকাবার আগেই আপনা থেকেই বিস্‌মিল্লাহ উচ্চারিত হয়ে পড়ে আমার মুখে। আমার কাছে এ প্রায় সংস্কারে পরিণত। কোন সময় ক্ষণিকের বিস্মৃতির ফলে বা কারো সঙ্গে আলাপ করতে করতে যদি লেখা শুরু করে দিই বিস্‌মিল্লাহ না বলে, হঠাৎ সে কথা স্মরণ হলেই না দোহরিয়ে, অর্থাৎ নূতন করে বিস্‌মিল্লাটা না আউড়িয়ে স্বস্তি পাই না। কিছুটা লেখা হয়ে গেলে তা কেটে হয়তো নতুন করে লিখি, না হয় লেখাটার উপর বিস্‌মিল্লাহ বলার পর কমলটা ফের বুলিয়ে নিই। একে সংস্কার না বলে উপায় কি! এর সঙ্গে বুদ্ধি বা যুক্তির কোন যোগাযোগ নেই। নিজের কাছেও এসব অনেক সময় হাস্যাস্পদ মনে হয়।

তা হলেও সংস্কার যখন অভ্যাসে রূপ নেয় তখন তার উপর একটা আস্থাও এসে যায় ধীরে ধীরে। আমার বেলায়ও তাই হয়েছে। ভক্ত-বিশ্বাসীর মতো স্রষ্টার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি বা না করি, স্রষ্টা সম্বন্ধে আমার মনেও একটা উপলব্ধি আছে বই কি। সে উপলব্ধি হচ্ছে তিনি করুণাময়। তাই আপদে-বিপদে শোকে-দুঃখে আল্লাহ রহমাতুল্‌লিল্‌ আলামীন আর নিজের কিম্বা প্রিয়জনের অসুখে-বিসুখে আল্লাহু আরোগ্যকারী তথা 'আল্লাহু শাফী' এ পড়া আমার প্রায় সহজাত অভ্যাসে পরিণত। আর আমার

আযৌবনের জপমন্ত্র হচ্ছে, কোরআনের সে স্মরণীয় উক্তি, যার বাংলা অনুবাদ ঃ তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো আর যাকে ইচ্ছা করো অপমানিত। সংকট ত বটেই অন্য সময়ও এ প্রায় আমার ঠোঁটস্থই বলা যায়। এ সব ব্যাপারে সেরা বিস্ময় হচ্ছে, এ না করলে যেন আমি পারি না আর করতে করতে এ সবের অন্তর্নিহিত সত্যে আবার একটা প্রতীতীও যেন জন্মে গেছে। শুনে অনেকে অবাক হবেন, আমার অনুশীলিত যুক্তিবাদ, আমার এসব প্রতীতীকে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি আজো। কোনদিন পারবে বলেও মনে হয় না। মানুষ অনুভব-অনুভূতি আর আন্তর-উপলব্ধির ক্ষেত্রে কত যে স্ববিরোধী আমার নিজের কাছে আমি নিজেই তার এক বড় দৃষ্টান্ত। এ সব আন্তর-সত্য এত বেশী ব্যক্তিগত যে এ রোজনামচায় তা বলবো না বলেই ভেবেছিলাম প্রথমে। কিন্তু পরে মনে হলো এখন না বল্লে হয়তো আর বলাই হবে না কোনদিন। নিজের সম্বন্ধে অপরের কাছে কোন রকম সাফাই দেওয়ার ইচ্ছা বা প্রযোজনের তাগাদায় এ সব কথা লেখা হচ্ছে না। এ স্রেফ নিজের কাছে নিজের আত্ম-উদ্‌ঘাটন। এ সব ক্ষেত্রে অপরের বিশ্বাস অবিশ্বাস অবান্তর ও মূল্যহীন। এও কোন পূর্ণ ছবি নয়, সামান্য ইংগিৎ মাত্র। মনের পূর্ণ ছবি কেই বা পারে সবটা প্রকাশ করতে? ব্যাপারটি এত নাজুক যে অনেকে চায়ও না তা করতে। 'রোজনামচা' আত্মপরিচয়মূলক রচনা বলেই আমি এ অনধিকার চর্চা বা বেরেওয়াজ কাজটা করে ফেল্লাম। আমার দ্বিধা-সংকোচটা উহ্যই থাকলো। মনের ভিতর কত আকুলি-ব্যাকুলি, কত চিন্তা ভাবনার আনাগোনা, কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা বুদ্‌বুদের মতো অবিরত ওঠা-নামা করে, ফের হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। কত বিশ্বাস-অবিশ্বাস পাশাপাশি জড়িয়ে থাকে দুই ভাই-বোনের মতো। এ অবস্থায় আমার মতো যারা কিছুটা জিজ্ঞাসু আর সংশয়ী

তাদের মন দ্বন্দ্ব-বিরোধ আর সংকট-সংঘর্ষের এক কুরুক্ষেত্র না হয়ে যায় না। বুদ্ধি আর যুক্তির আলোয় যারা পথ চলতে চায় এ ধরণের বিপদ তাদেরই সব চেয়ে বেশী। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে এদের জীবন বিশ্বাস-অবিশ্বাস তথা স্বর্গ-নিস্বর্গের মাঝখানে সব সময় দোদুল্যমান। এদের অবস্থা শ্যাম রাখি না কুল রাখি! এদের কপালে নেই স্বস্তি কিম্বা সুখ নিদ্রা! মনে হয় আমি সে হতভাগ্যদের অন্যতম।

১৫. ৪. ৬৯

সেদিন 'সোভিয়েট সাহিত্য' পত্রিকায় এ ঘটনাটি পড়লাম:

১৯৩১-এর গরমের মৌসুমে বার্ণাডশ' সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন। চাইলেন লেনিনের বিধবার সঙ্গেও একবার সাক্ষাৎ করতে। সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো—শ' নিজে এলেন লেনিন-পত্নীর আস্তানায়। সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, জন-শিক্ষা ইত্যাদি বহু বিষয়ে আলাপের পর হঠাৎ শ' লেনিন-পত্নীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: বলুন ত, আপনার ভরণ-পোষণের কি ব্যবস্থা করে গেছেন?

লেনিন-পত্নী ক্রুপস্‌কায়া কিছুক্ষণ বিব্রতভাবে চেয়ে থেকে বল্লেন: কেন? আমার স্বামী আমার জন্য কোন ব্যবস্থাই করেন নি। আমি কাজ করি, উপায়ও করি যথেষ্ট (I work myself earn enough.)। শ' ভাবলেন তাঁর প্রশ্নটা বোধ করি মহিলা বুঝতেই পারেন নি। এবার তিনি ইংরেজিতেই দোহরালেন। তারপরও যখন একই উত্তর পেলেন তখন তিনি তাঁর প্রশ্নটা এবার ফরাসীতেই করলেন। এবারও পেলেন একই উত্তর।

তখন বিস্মিত শ' জানতে চাইলেন: আপনার স্বামীর বইগুলি ত লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়। আপনি নিশ্চয়ই তার একটা রয়ালটি পেয়ে থাকেন?

উত্তরে লেনিন-পত্নী জানালেন, আমার স্বামীর সব লেখার মালিক জাতি, আমি নই।

বার্নাড শ'র সঙ্গে ছিলেন লেডি এসটর (Lady Astor) স্বনামখ্যাতা বিদুষী ও বৃটিশ পার্লামেন্টের তখনকার সদস্যা—এবার তিনিই করলেন প্রশ্ন: আপনার স্বামীর অবদানের জন্য, আপনি নিশ্চয়ই কিছু ভাতা (পেনশন) পেয়ে থাকেন রাষ্ট্রের কাছ থেকে ?

যখন জানা গেল তিনি কোন ভাতা কিম্বা পেনশন পান না তখন বিস্মিত শ' দুই শীর্ণ হাত ঊর্ধে উৎক্ষিপ্ত করে বলে উঠলেন: না, এমন কথা ইংলণ্ডে আমি কিছুতেই বলতে পারবো না। লেনিনের স্ত্রীকে নিজের জীবিকা নিজেকে উপার্জন করতে হয় এ কথা ওখানে একটা প্রাণীও বিশ্বাস করবে না।

শেষের মন্তব্যটা পুনরাবৃত্তি করলেন শ' বার কয়েক। যে দেশে রাজবংশের দূরতম বংশাবতংশের জন্যও রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয় সে দেশের মানুষের পক্ষে এ বিশ্বাস করতে না পারা তেমন অবিশ্বাস্য নয়। রাজবংশের পেছনে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হয় তা অপরের শ্রমে অর্জিত—রাজতন্ত্রের চরম কলঙ্ক আর চরম দুর্বলতা এখানেই। অপরদিকে শ্রমই হলো সমাজ তন্ত্রের শক্তি আর চরম মানবিক মর্যাদা। ইংলণ্ডের চেয়ে বহুগুণ বড় দেশের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত জন-নায়কের জীবন-সঙ্গিনী সারা-জীবন সগৌরবে সে মর্যাদার ঐতিহ্যই বহন করেছেন। সম্ভবতঃ একমাত্র সমাজতন্ত্রেই এ সম্ভব। যেখানে প্রতিটি মানুষ, মানুষ হিসাবেই স্বীকৃত এবং অপরের শ্রমে জীবন যাপন যেখানে ধিকৃত।

২০. ৪. ৬১

একবার এক মুসলিম প্রতিনিধিদল কি একটা ব্যাপারে কায়েদে আজমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে দলীয় মুখপাত্র তখন বেশ গর্ব করে নাকি বলেছিলেন: আমাদের ত্যাগ আর আত্মোৎসর্গের ফলেই পাকিস্তান হাসিল হয়েছে। শুনে বেশ রুষ্ট

কণ্ঠে কায়েদে আজম নাকি উত্তর দিয়েছিলেনঃ Nonsense. I won Pakistan for you with the help of my Secretary & his typewriter. অর্থাৎ স্রেফ বাজে কথা, আমার সেক্রেটারী আর তার টাইপ-রাইটারের সাহায্যে আমিই পাকিস্তান হাসিল করেছি তোমাদের জন্য।

কথাটার সত্যাসত্য আমি বলতে পারবো না, আমি ঘটনাটা পড়েছি ফিরোজখাঁ নুনের আত্মজীবনী 'From Memory' নামক বইতে।

৩০. ৪. ৬৯

একজন তুর্কি লেখক (ওকতাই একবাল) বলেছেনঃ শিল্প কর্ম হচ্ছে যুগপৎ ঘড়ি আর দিগদর্শন যন্ত্রের মতো, একদিকে তা ঘড়ির মতো আমরা কোন কালে বাস করছি তা দেখায়, অন্যদিকে দিগদর্শনের মতো তা নির্দেশ দেয় কোন দিকে আমাদের পদক্ষেপ হওয়া উচিত তার। মনে হয় শিল্পের এ সজ্ঞাটাও মনে রাখবার মতো।

২. ৫. ৬৯

গ্রীসে বেড়াতে গিয়ে হেনরি মিলার দেখেছেন—ওখানকার একমাত্র প্রয়োজন আর দাবীঃ গাছ, গাছ, আরো গাছ। কারণ গাছ দেয় পানি, দেয় মানুষ আর পশুর খাদ্য, দেয় ফুল ও ফল। আর দেয় ছায়া, অবসর ও সংগীত। ডেকে আনে কবিদের, চিত্রকরদের, বিধান-রচয়িতা তথা দার্শনিক আর স্বাপ্নিকদের। যে গ্রীস হতে পারতো য়ুরোপের একমাত্র স্বর্গভূমি, সে গ্রীস আজ রিক্ত, যেন শীর্ণ এক নেকড়ে। ছাগল আজ গ্রীসের জাতীয় শত্রু। মিলার মনে করেন গ্রীসের দরকার নেই প্রত্নতাত্ত্বিকের, আজ গ্রীসের সবচেয়ে প্রয়োজন বৃক্ষবিদের।

পূর্ব পাকিস্তানকে 'সবুজ শ্যামলিমার' দেশ বলা হলেও, যে হারে এখানে বৃক্ষ বিনষ্ট করা হয় অচিরে এ অভিধা হয়তো

হারাতে হবে পূর্ব পাকিস্তানের বহু এলেকাকে। যত বৃক্ষ কাটা হয় এখন তত বৃক্ষ করা হয় না রোপন, সরকারী ভাবে প্রতি বছর ঘটা করে বৃক্ষরোপন উৎসব পালন সত্ত্বেও। আমাদেরও রয়েছে তাই আরো বৃক্ষ ও বৃক্ষ-বিদের প্রয়োজন। প্রয়োজন রয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপন আর সংরক্ষণ ব্যবস্থার। বৃক্ষও দেশের এক বৃহৎ সম্পদ। এর পেছনেও পরিচর্যা আর লালন অত্যাবশ্যক।

*　　*　　*　　*

নারী সম্বন্ধে হেনরি মিলারের এ মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য : সব নারীই কিছুটা রাণীও। এ রাণীত্বটুকু ছাড়া নারী কখনো পূর্ণতা পায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিকাদের মধ্যে এ রাণীত্ব-টুকুর একান্তই অভাব। তাই তারা শ্রদ্ধা জাগায় না, জাগায় না নিষ্ঠা বা লয়ালটি। পুরুষ সম্বন্ধেও একথা হয়তো এক তিল মিথ্যা নয়। তারাও আজ সব রকম রাজসিক মহিমা বা পৌরুষ বর্জিত। নারী আর পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। এখন অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবন যে তুচ্ছ কারণেও সংকটাকীর্ণ হয়ে ওঠে তার বড় কারণ এ ভূমিকার অভাব ও অনুপস্থিতি। সহ-শিক্ষা এই দুই মহৎ গুণ বিকাশের চমৎকার ক্ষেত্র হতে পারা উচিত ছিল কিন্তু তা যেন আরো বেশী করে সামাজিক অবক্ষয়ের হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রুটি কোথায় এ সম্বন্ধে শিক্ষাবিজ্ঞানীদের ভেবে দেখা উচিত। আগের দিনে, ভদ্র সমাজে অন্তত নারীকে যুগপৎ রাণীর ভূমিকাও পালন করতে আমরা দেখেছি। নারীত্বের সঙ্গে রাণীত্বের সংযোগ ঘটলেই নারী শুধু শ্রদ্ধেয়া নয়, হয়ে ওঠে মনোরমাও। নারীতে রাণীত্ব এক অপার্থিব গুণ।

গ্রীক রমণীদের সম্বন্ধে হেনরি মিলারের মন্তব্য : এমনকি সংস্কৃতিবান তথা cultured বিশিষ্ট হলেও গ্রীক রমণীরা সর্বাগ্রে আর প্রধানত

নারীই থাকে। সে বিচ্ছুরিত করে এক সৌরভ, আর তোমার অন্তরে সঞ্চারিত করে দেয় উষ্ণতা ও শিহরণ।

একদিন এদেশের নারীও এরূপ ছিল।

৪. ৫. ৬৯

গতকাল (৩. ৫. ৬৯) ভারতের রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট ডক্টর জাকির হোসেন অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। শুনে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে এ কথা ক'টিই আমার মনে উচ্চারিত হলো :

* তিনি এক মহৎ মুসলমান ছিলেন।
* তিনি এক মহৎ ভারতীয় ছিলেন।
* তিনি এক মহৎ ভদ্রলোক ছিলেন।
* তিনি এক মহৎ শিক্ষাবিদ ছিলেন।
* সবার উপরে তিনি এক মহৎ মানুষ ছিলেন।

ইংরেজী গ্রেট কথাটাই আমার মনে জেগেছিল যার অনুবাদ করেছি মহৎ। তাঁর তিরোধানে মুসলমান সমাজ আর ভারত রাষ্ট্র-ই দরিদ্র হলো। এ দু'য়েরই এমন মানুষের প্রয়োজন আজ সব চেয়ে বেশী। ভারতের সৌভাগ্য এমন মানুষকে তারা জন-জীবনে পেয়েছিল, যে মানুষ দেশের সামনে এক আলোক-বর্তিকা হয়েই ছিল এতকাল। তাঁর মতো অজাতশত্রু এযুগে বিরল বল্লেই চলে।

অন্য রাষ্ট্রের মানুষ হয়েও আমার মনেও কাল থেকে শুধুই অনুরণিত হচ্ছে : একে একে নিভিছে দেউটি।

১২. ৫. ৬৯

অনুন্নত দেশ আর জাতির এক ত্রুটি সব ব্যাপারে তারা কিছুটা হীনমন্য হয়ে থাকে। সাহিত্য-শিল্পের ব্যাপারে এটা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে। তারা নিজেদের লেখক আর শিল্পীদের শুধু যে উপেক্ষা করে তা নয় অধিকন্তু রাখেনা তাঁদের উপর কোন রকম আস্থাই। নিজের দেশের লেখক আর শিল্পীরা কি করছে, মূল্যবান কিছু সৃষ্টি করছে

কিনা তার খবরাখবর এরা রাখেনা, মনে করেনা তার কোন দরকার আছে। অন্যদিকে বিদেশের সাধারণ তথা মাইনর লেখকদের প্রশংসায়ও এরা পঞ্চমুখ। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরাও এ রোগেই ভুগছি। পশ্চিম বঙ্গের লেখকদের মূল্যায়নে আমরা যতখানি আগ্রহী আমাদের নিজেদের লেখক সম্বন্ধে তার সিকি পরিমাণ আগ্রহও আমরা দেখাই না।

এ মনোভাবকে কিছুতেই সাহিত্য-শিল্পের অনুকূল বলা যায় না। সাহিত্য 'বৃন্তহীন ফুলের' মতো আপনাআপনি বিকশিত হয়ে ওঠে না। তার জন্য সমজদারি তথা গুণগ্রাহীতা অত্যাবশ্যক।

২৫. ৫. ৬৯

আজ প্রাতঃভ্রমণের সময় এক মৌলভী সাহেব এসে জুটলেন হঠাৎ। পরিচিত, আমাদের পাশের গ্রামের লোক। এখানে এক মসজিদে ইমামতী করেন। আরবী পার্সী বিদ্যাই এঁদের একমাত্র সম্বল—জ্ঞানের ক্ষেত্রে এঁদের দৌড় তার বেশী নয়। এঁদের মধ্যে সত্যিকার ধার্মিক আর সজ্জন যে নেই তা নয়—আমার পিতা পিতামহও এ ধারারই আলেম ছিলেন। তবু শ্রেণীগতভাবে এঁদেরে আমি পছন্দ করি না। আমার কোন কোন রচনায় এঁদের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কম বর্ষিত হয়নি।

সহ-ভ্রমণকারীদের সঙ্গে আজ দেখা হলো অনেক পরে। মৌলভী সাহেব তখনো আমার সঙ্গে, অগত্যা সৌজন্যের খাতিরে ওঁদের সঙ্গে মৌলভী সাহেবেরও পরিচয় করিয়ে দিলাম। রেলওয়ে এলাকা ছাড়িয়ে কিছুদূর আসার পর দেখলাম রাস্তার মাঝখানে একটা বড় আকারের ভাঙ্গা ইট পড়ে আছে। আমরা কেউ পাশ কেটে, কেউ ওটা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চল্লাম কথা বলতে বলতে। মৌলভী সাহেব কিন্তু হঠাৎ থেমে ইট-টা তুলে রাস্তার বাইরে ফেলে দিলেন।

তুচ্ছ ঘটনা, তবু মৌলভী সাহেবের সামনে নিজেদের ছোট মনে না করে পারলাম না মুহূর্তে। অসাবধানে কেউ হঠাৎ হোঁচট

খেতে পারে ভেবে মৌলভী সাহেব যে ইট-টা নিজের হাতে উঠিয়ে ফেলে দিয়েছেন এ তাঁর আধুনিক নাগরিক চেতনা নয়, এ তাঁরধর্ম-বোধ, ধর্মীয় নির্দেশের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য। ইসলামের নবী স্বয়ং পথে পাথর কি কাঁটা ইত্যাদি দেখলে তা নিজের হাতে সরিয়ে ফেলতেন। এক সময় আলেমরা নায়েবে রসুল হওয়ার চেষ্টা করতেন, এ মৌলভী সাহেবের আজকের এ আচরণ সে চেষ্টারই হয়তো ক্ষীণতম অভিব্যক্তি।

ধর্ম-বিদ্যা একদিন বহু সৎ-কর্মের উৎস ছিল—এমন ছোট ছোট বহু সদাচার তখন অনেকের প্রাত্যহিকের অঙ্গ হয়ে উঠতো। আজকের দিনে তেমন মানুষ প্রায় দুর্লভ। নাগরিকতা বা নাগরিক চেতনা সম্বন্ধে আমাদের স্কুল কলেজে এখন কম শেখানো হয় না কিন্তু সে সব বিদ্যা ব্যবহারিক জীবনের অঙ্গ হতে কদাচিৎ দেখা যায়। স্কুল কলেজের চৌকাঠ না মাড়ালেও, মনে হয় এ মৌলভী সাহেবের মনে কল্যাণবোধ তথা নাগরিক চেতনা সহজাত হয়ে গেছে। তাই রাস্তার উপর থেকে পাথরটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে তাঁকে এক মিনিট ভাবতে কি ইতস্তত করতে হয়নি।

বাসায় ফিরতে ফিরতে মনে হলো যাঁকে বা যে শ্রেণীকে আমি এতকাল কিঞ্চিৎ কৃপার চোখে দেখে এসেছি আজ আমিই যেন হয়ে পড়লাম তাঁদের চোখে কৃপার পাত্র! অন্তত আমার নিজের মনের কাছে আমাকে নীচু করতেই হলো মাথা।

আমার বিশ্বাস এমন সব ছোট ছোট কাজেই মানুষের চরিত্র আর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভংগীর একটা পরিচয় মেলে। বড় বড় কাজ অনেক সময় বাইরের আবেগ উত্তেজনায়ও করা হয়ে থাকে। জনতার উত্তেজনার বন্যাবেগে চরম ভীরুকেও বীর কিম্বা শহীদ হতে দেখা যায়। প্রতিদিনের নিরুত্তাপ মুহূর্তে ছোট ছোট সৎকর্মে যে চারিত্রিক সৌন্দর্য তা অনেক সময় আমাদের নজরে পড়ে না।

২৬. ৫. ৬৯

লেখক আর প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহিত্যের বিস্তৃতি হয়তো কিছুটা বুঝায় কিন্তু সাহিত্যের সমৃদ্ধির নিসন্দিগ্ধ লক্ষণ তা নয়। নতুন সাহিত্য কি নতুন সত্য কিম্বা নতুন তথ্য অর্থাৎ নতুনত্বের কোন স্বাদ বহন করে আনলো কিনা তা দেখা চাই। স্রেফ আঙ্গিকে নতুনত্বও কিছুটা নতুনত্ব বটে কিন্তু অত্যন্ত ক্ষণজীবী। নতুন লেখক কিছুটা নতুন কথা শোনাবেন। অন্ততঃ পুরাতন কথাকে নতুন পাত্রে পরিবেশন করবেন এমন একটা প্রত্যাশা পাঠকের মনে থাকে যা না পেলে পাঠক হতাশ হন। নতুন লেখক মানে নতুনত্বের পরিবেশক। নতুন একটা বই পড়ে নতুন কিছু একটা জানা হলো কিনা অথবা আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রে কিম্বা মানস চেতনার নতুন অভিজ্ঞতার সাথে পরিচয় ঘটলো কিনা বইয়ের অন্তে এ কৌতু-হলের কিছুটা চরিতার্থতা পাঠকের লভ্য হওয়া চাই। এর অভাবে অনেক বিরাট বিরাট গ্রন্থের লেখকেরা হারিয়ে যান আবার রূপে আর আঙ্গিকে সামান্য নতুনত্বের জোরেও অনেক মাইনর লেখক লাভ করেন দীর্ঘায়ু। 'মেঘনাধ বধের' তুলনায় 'বৃত্র সংহার' আকারে অনেক বড়, 'মহাশ্মশানের' তুলনায় 'নকশীকাঁথার মাঠ' কত ছোট। পরিচিত অভিজ্ঞতাও শিল্পির উপলব্ধি:তে নতুন রূপ দিতে পারে। পারে নতুন আঙ্গিকে আর আবেদনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে। জসীমউদ্দীন কিম্বা জীবনানন্দ দাশ একটিও নতুন কথা শোনাননি তবুও তাঁদের কবিতায় নতুত্বের স্বাদ আর আবেদন যথেষ্ট। 'নকশী কাঁথার মাঠ' বা 'বনলতা সেন' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখনকার শিহরণ আজো আমাদের মনে পড়ে।

২৭. ৫. ৬৯

হযরত আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র হাসান যখন একদিন গোসল করছিলেন অসাবধানতাবশত এক গোলাম তাঁর গায়ে হঠাৎ গরম পানি ছুঁড়ে ফেলেছিল। গোসল শেষে হাসান উক্ত গোলামকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

ভীত গোলামের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে হাসান বল্লেন: যারা ক্রুদ্ধ হয় না তাদের জন্য নির্দিষ্ট আছে এক স্বর্গ, যারা ক্ষমা করে তাদের জন্য আছে তার উপরে আর এক স্বর্গ, আর যারা অনিচ্ছাকৃত অপরাধকে পুরস্কৃত করে তাদের জন্য বরাদ্দ আছে আরো উপরে অন্য এক স্বর্গ।

এ গল্পটা আমি ভল্টেয়ারের নোট বইতে পড়েছি।

নিচের গল্পটাও ভল্টেয়ারের নোট বই থেকে নেওয়া: যিশু, পিটার আর জুডাস একদিন রাত্রে দেখলেন স্রেফ একটা ডিম ছাড়া ঘরে আর কোন খাবারই নেই তাঁদের জন্য। তখন যিশু বল্লেন: এত ছোট একটা বস্তু তিন জনে মিলে খেলে কারো ক্ষুধা মিটবে না। তার চেয়ে চলো আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। যে ঘুমে সব চেয়ে উত্তম স্বপ্ন দেখবে ডিমটা সে-ই খাবে। এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে সবাই অভুক্ত ঘুমিয়ে পড়লেন এবার।

ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর পিটার বল্লে: স্বপ্নে দেখলাম স্বর্গে আমি ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছি।

যিশু বল্লেন: আমি দেখলাম তুমি আমার ডানেই বসে রয়েছ।

জুডাস জানালেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম ডিমটা আমিই খেয়ে ফেলেছি।

সত্য সত্যই বদমাইশটা এঁরা দু'জন যখন ঘুমিয়ে তখন এক সময় উঠে ডিমটা সাবাড় করে ফেলেছে!

১৪. ৬. ৬৯

গত মাসে লাহোরের 'উর্দু ডাইজেষ্ট' পত্রিকার সম্পাদক আলতাপ হাসান কোরায়েশী পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন। আমার বাসায় এসে আমার সঙ্গেও তিনি দেখা করেছিলেন এবার। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কিছু আলাপ আলোচনা হয়েছিল। দেখলাম জুন সংখ্যার উর্দু ডাইজেষ্টের সম্পাদকীয় কলামে এ

সম্পর্কে একটি বিবরণ তিনি লিখেছেন। তাতে আমার সঙ্গে মোলাকাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে এক জাগায় মন্তব্য করেছেন তিনি ..... আবুল ফজল সাহেব তাঁর ড্রয়িং রুমে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসালেন। দেখলাম সামনের দেওয়ালে টেগোরের একটি ছবি। তখনই তাঁর সম্বন্ধে এক অধ্যাপকের এ মন্তব্য আমার মনে পড়ল: "আবুল ফজল সাহেব তাঁর কোন এক গ্রন্থে টেগোরের সাথে রসুলে খোদার তুলনা ক'রেছেন।"

বলা বাহুল্য 'টেগোর' মানে রবীন্দ্রনাথ। সাধারণত কোন ডাইজেষ্ট পত্রিকাই আমার প্রিয় পাঠ্য নয়। উর্দু ডাইজেষ্টের এ কথাও আমার নজরে পড়তো না যদিনা একজন উর্দুভাষী তরুণ উক্ত ডাইজেষ্টের এ কপিটা এনে আমাকে দেখাতেন। দেখে আমি ত আকাশ থেকে পড়লাম। তুলনা করা দূরে থাক আমার কোন লেখায় নবী আর রবীন্দ্রনাথের নাম এক সঙ্গেও উল্লেখিত হয়নি কোথাও। উর্দুভাষী কোরায়েশী সাহেব যিনি এক হরফও বাংলা জানেন না, এ অদ্ভুত তথ্য কোথায় পেলেন জানি না। নবী আর কবি দু'জন ভিন্ন জগতের মানুষ, পারস্পরিক তুলনার কোন প্রশ্নই ও'ঠে না। তক্ষুণি কোরায়শীকে লিখে দিলাম, যে অধ্যাপক এ মূল্যবান তথ্য তাঁকে পরিবেশন করেছেন তাঁর আর যে গ্রন্থে আমার এমন বক্তব্য লেখা হয়েছে বলে উক্ত অধ্যাপকের বরাত দিয়ে তিনি লিখেছেন সে বইটার নাম আমাকে জানাতে। দুঃখের বিষয় তিনি আমার এ চিঠির জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। বন্ধুদের কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন মানহানির একটা কেস্ দায়ের করে দিতে।

পুরুষানুক্রমে বাদী কি বিবাদী হয়ে আমরা কোনদিন আদালতের সিঁড়ি মাড়াইনি। তাই আজো সে পথ গ্রহণে দ্বিধান্বিত। কোরায়েশী তার উক্ত সফর নামায় পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে আরো কিছু মন্তব্য

করেছেন যা মিথ্যা এবং অত্যন্ত আপত্তিকর। আমার বৈঠকখানায় শুধু যে টেগোরের তস্‌বির আছে তা নয়, আমার নিজের আর নজরুল ইসলামেরও ফটো টাঙ্গানো রয়েছে। নজরুলের ছবিটা বরং রবীন্দ্রনাথের ছবির চেয়ে আকারে বড়। আমার মেয়ে স্কুলে থাকতে রবীন্দ্রনাথের এ ছবিটা ওর আনাড়ি হাতে এঁকেছিল, কাজেই খুব ভাল ছবি নয়। তবে মেয়ের হাতের আঁকা বলে আমাদের কাছে তার একটা আলাদা মূল্য আছে। শিল্পীশ্রেষ্ঠ জয়নাল আবেদিনের আঁকা এক বৃহৎ পেন্টিংও রয়েছে আমার বৈঠকখানায় টাঙ্গানো। আশ্চর্য, এসব কিছুই কোরায়েশীর নজরে পড়লো না, পড়লো শুধু অপরিপক্ক হাতে আঁকা টেগোরের ছবিটার উপর।

আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা যে দয়া করে পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন মনে হয় স্রেফ অকৃত্রিম 'ভ্রাতৃপ্রেমের' টানে তাঁরা আসেন না। আস্তিনের নিচে কিছু একটা উদ্দেশ্যও লুকানো থাকে তাঁদের কারো কারো। বোধ করি এঁদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে: মুখে শেখ ফরিদ বগলে ইট!

১, ৭, ৬৯

আজ আমার জন্মদিন গেল। ছাত্ররা অন্যান্য বছরের মতো, এবারও এক সভায় মিলিত হয়েছিল সকালে আমার বাসায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত রিডার ডক্টর আনিসুজ্জমান করলেন সভাপতিত্ব, আলোচনায় অংশ নিলেন কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক আর সাহিত্যসেবী। আলোচনা শেষে সংগীত পরিবেশন করলো স্থানীয় তরুণশিল্পীরা। কিন্তু এবার ব্যাপারটির সমাপ্তি ঘটলো না নির্জলা আনন্দে। কিছু দুর্ভোগ পোয়াতে হলো, দুর্ভোগটা শুরু হলো বিকালের দিকে।

আজকের এ ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের দিন দুই আগে অর্থাৎ ২৭শে কি ২৮শে জুন এক ভদ্রলোক আমার বাসায় আমাকে বল্লেন: তিনি ডি, আই, বি, অফিস থেকেই আসছেন। জানতে চাইলেন আমার জন্মদিন কবে।

বল্লামঃ পয়লা জুলাই।

তিনি তখন জানালেন ঃ এ উপলক্ষে জে, এম, সেন হলে সভা করার জন্য অনুমতি চেয়ে ছাত্ররা এক দরখাস্ত দিয়েছে। আমাদের অফিস জানতে চায় তাতে আপনার সম্মতি নেওয়া হয়েছে কিনা।

প্রত্যুত্তরে বল্লাম ঃ আমি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছি আর এখন সাহিত্য নিয়েই আছি, এ কারণে আমার জন্মদিনে সাহিত্যানুরাগী ছাত্র আর সাহিত্যসেবীরা একত্রিত হয়ে আমাকে প্রতিবছরই শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে। আর এতে সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছুই আলোচিত হয় না। কাজেই আমার সম্মতি না থাকার কোন কারণ নেই। ছাত্ররা আমার সম্মতি যথাসময়ে নিয়েছে।

আমাকে এতটুকু জানার জন্যই পাঠানো হয়েছে। এ বলে সালাম জানিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। সেদিন আর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে দেখা হলো না। পরদিন ওরা এলে বল্লাম ঃ এবার তোমরা হয়তো হলের অনুমতি পেয়ে যাবে। ডি, আই, বি, অফিসের প্রতিনিধির সঙ্গে আমার যে আলাপ হয়েছে তা এদেরে জানিয়ে দিয়ে বল্লাম ঃ পেলে ভালো হয়। আমার সম্বন্ধে সভা আমার বাসায় ভালো দেখায় না।

তারা বল্লে ঃ হাতে মাত্র সময় আছে আর একদিন, এখন অনুমতি পেলেও হলে করা সম্ভব হবে না। হলে করতে হলে কয়েকদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। আমরা ঠিক করেছি রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী যেমন আপনার বাসায় করেছি এটাও সে রকম ঘরোয়াভাবে আপনার বাসাতেই করবো।

ওদের মুখেই শুনলাম ঃ প্রথমে ওরা স্থানীয় সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত দিয়েছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ তা পাঠিয়ে দিয়েছে ডি, সির কাছে, ডি, সি, এ, ডি, সির কাছে। হয়তো এ. ডি. সির দফতর ঘুরে তা এবার পৌচেছে ডি. আই, বিতে, যার ফলে আগের দিন ডি. আই, বি, প্রতিনিধির আবির্ভাব, যাই

হোক সভাটা আজ সকালে আমার বাসায় হয়ে গেছে। মোটামুটি মন্দ জমেনি।

বিকেল গোটা পাঁচেকের সময় দেখি মটর সাইকেল থেকে নেমে য়ুনিফর্মপরা এক সার্জেণ্ট আমার বাড়ীর আশেপাশের লোকদের কাছে কি যেন জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আমি বারান্দায় বের হতে কে একজন আমাকে দেখিয়ে দিল। এবার সার্জেন্ট আমার ঘরের সামনে এসে আমাকে সালাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলে: আজ আবুল ফজল সাহেবের এখানে জন্মদিনের একটা সভা হওয়ার কথা ছিল, সেটা কখন হবে!

বল্লাম: আমার নামই আবুল ফজল, সভাটা সকালে হয়ে গেছে।

: ওঃ আমাদের বিশ্বাস ছিল বিকালে হবে। সভাটা ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত হয়েছিল, স্যার?

: আটটা থেকে সাড়ে নয়টা।

সালাম জানিয়ে মটর সাইকেলে উঠে সার্জেন্টও বিদায় নিলে।

সন্ধ্যায় বারান্দায় পায়চারি করছি। দিনের আলো প্রায় নিভে এসেছে। দেখলাম তিনজন কনষ্টেবল আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পথচারীদের কাছ থেকে কি সব যেন জানতে চাইছে। আমার নামটা কানে এলে এগিয়ে এসে বল্লাম: আমার নাম আবুল ফজল।

তখন ওদের একজন বল্লে: আজ আপনার বাসায় একটা সভা হওয়ার না কথা ছিল?

বল্লাম: সভা ত সকালেই হয়ে গেছে।

ওরা বল্লে: আমাদেরে বলা হয়েছিল বিকালে জে. এম. সেন হলেই হবে। ওখানে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর শুনলাম: সভাটা আপনার বাসাতেই। তাই খোঁজ নিতে এলাম।

সভা সকালেই হয়ে গেছে শুনে সালাম ঠুকে এবার তারাও বিদায় নিলে।

সকালে নিজের সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাই শুনলাম। যে প্রশংসা আমার প্রাপ্য নয় তাও শুনতে হলো নীরবে। প্রায়ই কানে আসে এ যুগের তরুণরা গুরুজনদের প্রতি আগের মতো আর তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে না। এ অবস্থায় একদল তরুণের কাছ থেকে আজ অযাচিতভাবে এতখানি ভক্তি শ্রদ্ধা পেলাম। অতিরঞ্জিত হলেও শুনলাম নিজের অনেক তারিফ, এ জন্য অন্তত কিছুটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আর কৃতজ্ঞতার মালিক ত আছেন একজনই। তাই মগরেবের সময় জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজে দাঁড়ালাম। ছোট ছেলেটার পরীক্ষা, পাশের রুমে সে বসেছে পড়তে। আমাদের মতো অভক্তদের মনোযোগের দৌড় ত সহজেই অনুমেয়। নামাজে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলাম কে একজন এসে ছেলেটাকে যেন বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। ওর মা দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে বারান্দায় ছুটে এসে কি যেন চেঁচিয়ে বলছে।

ফরজটা শেষ হতেই, দরজাটা ফাঁক করে রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম আমার পাশের ধোপার দোকানটার সামনে এক শাল-প্রাংশুদেহ ভদ্রলোক আমার ছেলের এক হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বেশ অন্তরঙ্গভাবে কি সব যেন ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

কানে এলো ওর মা বারান্দা থেকে পরিচিত একজনকে হাঁক দিয়ে বলছে: তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকো, একে কোথাও নিয়ে যেতে দিয়ো না।

কাগজে ছেলেধরার বিচিত্র লোমহর্ষক কাহিনী পড়তে পড়তে ছেলেধরা সম্বন্ধে ওর মনে ভয়ানক একটা আতঙ্ক সব সময় ঘোরাফেরা করে। সন্ধ্যার সময় কোন ছেলের বাসায় ফিরতে সামান্য একটু দেরি হলেও ওর উৎকণ্ঠার অন্ত থাকে না। সুন্নৎ-টা কোন রকম শেষ করে পৈত্রিক জায়নামাজটা গুটিয়ে, আমার সংখ্যাতীত ভায়রার একজন হাজী হয়ে ফিরে এসে আমাকে যে একটি মাত্র উপহার দিয়েছিলেন, সে টুপিটা যথাস্থানে রেখে বারান্দায় এসে

দেখলাম উক্ত ভদ্রলোক এখনো সে একই ভাবে আমার ছেলের হাত ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্ত্রীর উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ এবার আমাকেই ধমকে উঠলো: গিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে এসো। অত বড় বিরাট লোকটা একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কি সব গুজগুজ করছে। এখনি হয়তো বলে বসবে: চলো ঐ দোকান থেকে চা খেয়ে আসি, আমার ছেলেও যে রকম সুর সুর করে তখন লোকটার সঙ্গে চলে যাবে। তারপর হয়তো বলে বসবে: চলো বেবি টেক্সি করে একটু বেড়িয়ে আসি। তারপর দেখবে নিখোঁজ!

এমন লোমহর্ষক ভাষায় এক ভয়াবহ পরিণতির কথা শুনে, ছেলেটা চোখের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দেখেও ভয়ে আমার ভিতরটা টিপ টিপ করতে লাগলো। অগত্যা পাঞ্জাবীটা চড়িয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম। ভদ্রলোক এবার ছেলেকে ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে, সালাম জানিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরে বল্লেন: আপনার জন্মবার্ষিকী সভাটার খবর নিচ্ছিলাম। বুঝেন ত স্যার আমাদেরও ত চাকুরি বাঁচাতে হয়। না হয় আপনার মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় .....কে না চেনে আপনাকে? ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথার পর তাঁর পারিবারিক দুঃখের বারোমাসীও শুনিয়ে দিলেন। বৈমাত্রেয় ভাইরা যে এক একটা আস্ত দজ্জাল তা হয় তো আপনার জানা নেই স্যার, কত পরিবার যে এদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে! আমরা মুসলমানরা একজনের ভাল আর একজন কিছুতেই দেখতে পারি না। এ ধরনের এক সকরুণ বর্ণনা দিয়ে শেষে জানালেন: তাঁর নিজের জীবন-কাহিনী নিয়েও একটা সিনেমা হয়। একদিন এসে আপনাকে শুনিয়ে যাবো স্যার, এ আশ্বাসও দিয়ে রাখলেন।

বল্লাম: আমার ত এখন অবসর-জীবন। আসবেন যখন খুশী, শুনবো আপনার জীবন-কাহিনী।

এ সময় ঘুরতে ঘুরতে দু'জন কনষ্টেবল এসে হাজির। বল্লে: আমরা বেলা দু'টা থেকে জে. এম. সেন হলে গিয়ে বসে আছি। সভার কোন নাম নিশানা না দেখে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছি।

ডি. আই. বি. ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়ে বলে উঠলেন: চেন এঁকে? কতবড় লোক আমাদের দেশের, জানো? সালাম করো, সালাম করো এঁকে! কনষ্টেবলরা গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে লুঙ্গি পরা আমাকে বাকায়দা এক স্যালুয়েট্ দিয়ে দিলে!

ভদ্রলোক এবার হুকুম দিলেন: তোমরা চলে যাও, আর দরকার হবে না।

ওরা বিদায় হতেই আগের কথার জের ধরে বল্লেন: জানেন ত স্যার, আমাদের আবার যত্রতত্র যাওয়ার উপায় নেই....।

বল্লাম: হাঁ, তাও ত ঠিক। আপনারা ত আর যেখানে সেখানে যার তার বাড়ী যেতে পারেন না।

এবার বল্লেন: কসম খোদার, আপনার সম্বন্ধে আমাদের অফিসে কোন রিপোর্ট নেই। শুনে হঠাৎ 'ঠাকুর ঘরে কে' কথাটা আমার মনে পড়ে গেল! বল্লাম না কিছুই। আমি চুপ করে আছি দেখে বল্লেন: তবুও একটা রিপোর্ট ত স্যার আমাকে দিতেই হবে আজকের এ সভা সম্বন্ধে। লিখে দেবো ঐ কিছুই না, জাষ্ট এ বার্থ-ডে মিটিং।

একটু ইতস্তত করে বল্লেন: আপনার ওখানে একটু আসি, স্যার। কয়েকটা খবর টুকে নিয়ে যাই।

বল্লাম: আসুন, আসুন। কোন আপত্তি নেই।

এলেন। সঙ্গে কাগজ নেই বলাতে আমি আমার ছাপানো প্যাড্ থেকে ছিড়ে এক ফর্দ কাগজ তাঁকে দিলাম। তাতে তিনি সভাপতি আর আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের নাম ধাম টুকে নিলেন।

টোকাটুকি শেষ হলে বল্লেন: আপনাদের নিয়ে স্যার আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই, ছাত্রদের নিয়েই যত ভয় ......। বুঝেন ত স্যার, আমরাও ত এদেশের মানুষ......তবে চাকুরি না বাঁচিয়েও ত উপায় নেই, ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করি ....।

অবশেষে একটি বিশেষ ছাত্রকর্মীর নাম করে ও এসেছিল কিনা জানতে চাইলেন।

বল্লাম: এসেছিল। তবে কোন কিছুতে অংশ নেয়নি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্লেন: তা হলেই হলো স্যার। আসায় কোন দোষ নেই। বক্তৃতা না দিলেই আমরা নিশ্চিন্ত।

নমাজের প্রশান্তি আর আগের নিয়ম মাফিক সান্ধ্যভ্রমণের আনন্দটা আজকের মতো মাটি করে দিয়ে এবার তিনি গা তুল্লেন। বিনীত সালাম আর হ্যাণ্ডশেক করতেও ভুললেন না যাওয়ার সময়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কনিষ্ঠদের ভক্তিশ্রদ্ধা না পেলে মনে একটা অভাব বোধ হয়তো থেকে যায় কিন্তু পেলে ইদানিং কেমন বিপদ আর ঝামেলা পোয়াতে হয় আজকের ঘটনা তারও এক নজির হয়ে থাকলো আমার জীবনে।

ছাত্র অধ্যাপক সাহিত্যানুরাগীদের সংবর্ধনা আর ডি. আই. বির শুভাগমনের স্মৃতি নিয়ে আমি আজ আমার জীবনের সাতষট্টি বছরে পা দিলাম।

২৫. ৭. ৬৯

জুলিয়ান হাক্সলী বলেছেন: The concept of God has reached the limits of its usefulness; it cannot evolve further.

যার কোন বিবর্তন নেই, কালের সঙ্গে সঙ্গে যা গতিশীল নয় তা চিরকাল মানুষের প্রয়োজন মিটাতে পারে না। সামাজিক যে স্তরে ঈশ্বর বা ঈশ্বরচেতনা মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করতো অর্থাৎ যখন

অলৌকিকতায় মানুষ স্থাপন করতে পারতো আস্থা সে স্তর এখন পার হয়ে এসেছে মানুষ। এখন শত্রুকে ঘায়েল করতে হলে দোয়া দরুদ মন্ত্র বা প্রার্থনার চেয়ে বেশী প্রয়োজন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের, হাওয়াই শক্তি আর আণবিক বোমার। বৈষয়িক উন্নতির জন্যও এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন অর্থনীতির কলা কৌশলের সঙ্গে পরিচয়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আর তার প্রয়োগ। এখন পরম পবিত্র-ভূমি রক্ষার জন্যও আবাবিল পাখী এসে শত্রুর বোমারু জাহাজের উপর পাথর ছুঁড়ে মারে না। আর আকুল প্রার্থনায়ও মেঘ করে না বর্ষণ কিম্বা রোধ হয় না বন্যার পানি তাতে। প্রার্থনার চেয়েও এখন জলসেচন ব্যবস্থা আর সার প্রয়োগ অধিকতর ফলপ্রসূ। বিজ্ঞান ছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণও অকল্পনীয়। এবার চূড়ান্তভাবেই দেখা গেছে জেরুজালেম রক্ষায়ও আরবরা কোন গায়েবী মদদ পায়নি। একই ভূমির ইসরাইলী অংশ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ফুলে ফলে সবুজ হয়ে উঠেছে আর আরব অংশ তা গ্রহণ না করার ফলে আজো রয়ে গেছে উষর শুষ্ক ও নিষ্ফল। ঈশ্বর যেখানেই ছিলেন সেখানেই আছেন। বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে প্রতিদিন। এ যুগের মানুষের জীবন আর তার ভালোমন্দ বিজ্ঞানের সঙ্গেই জড়িত, বিজ্ঞানের সঙ্গেই গাঁটছাড়া বাঁধা।

৮. ৮. ৬৯

পাকিস্তান কৌন্সিল, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে গত সন্ধ্যায় ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের উপর একটি আলোচনা সভা ছিল। সৈয়দ আলী আহসান সভাপতিত্ব করলেন। ডক্টর আনিসুজ্জমান পড়লেন প্রবন্ধ। বক্তার তালিকায় আমার নাম ছিল না—মনে করেছিলাম শেষের দিকে কিছু হয়তো বলে এ জ্ঞান-সাধকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবো। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি কিন্তু কিছু বলার জন্য আমাকেই প্রথমে আহ্বান জানালেন। গত দুই বছর আমি এক রকম ভালোই ছিলাম

—বেশ কয়েকটা সভাসমিতিতেও অংশ নিয়েছি। তেমন কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি। আজ হঠাৎ মিনিট দুই বলার পরই আমার মাথা ঘুরতে শুরু করলো। মনে হলো সমস্ত বাড়িটাই যেন নাগর-দোলার মতো দোল খাচ্ছে। বুঝতে পারলাম অন্যান্য বারের মতো রক্তের চাপ বৃদ্ধিরই এ ফল। বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে কোন রকমে চেয়ার ধরে বসে পড়লাম। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রতি বাচনিক শ্রদ্ধা নিবেদন আর হলো না সেদিন। বাইরে এসে বসার পর মনে হলো এবারও যেন ফাঁড়াটা কেটে গেল। উদ্বিগ্ন অধ্যাপক মমতাজ-উদ্দীন, অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিক, রফিকের স্ত্রী কবি জিনত আরা সভা থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে মনটাকে আমার চাঙ্গা করে তুল্লে। প্রয়োজন হলে সঙ্গে এসে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার সংকল্পও জানালে। সভায় আমি আর গেলাম না বটে তবে সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত রয়ে গেলাম। সেদিনের সভায় যা বলতে চেয়েছিলাম পরদিন তা লিখে 'ইত্তেফাকে' পাঠিয়েছিলাম। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ : স্মৃতিচারণ, এ নামে ওদের তা চৌদ্দই আগষ্টের বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।

১৫. ৮. ৬৯

দিন কয়েক আগে ডাকে নিচের অদ্ভুত চিঠিখানা পেলাম।

৯. ৮. ৬৯

বন্ধু,

সেদিন আমার জনৈক অধ্যাপক-বন্ধু 'সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন' বইখানা 'চোখ দিয়ে পড়ে' ফেরত দিতে এসে লেখকের মুখে গণগণে বুলেট ছাড়লেন। এ এক দজ্জাল বেরিয়েছে। আবুল ফজল দজ্জালটি আমাদের ইমান-আকিদা সংহার করবে দেখছি। মানবধর্ম নামক এক উদ্ভট তন্ত্রের নিশান ইসলামের মাথার উপর ওড়াবে? আমাদের শাশ্বত ইসলামিক বিধিনিষেধকে যুক্তি আর মুক্ত বিচার বুদ্ধির

নিকষে যাচাই করবে? হতবুদ্ধি বলে কিনা—জগৎ জঙ্গম। সমাজ গতিশীল, বিবর্তনমুখী! কাজেই সমাজের স্থবির বিধানের রূপান্তর চাই। কী শয়তানি উক্তি! ধর্মীয় বিধানে জিজ্ঞাসাবাদ কুফর। শাস্ত্রীয় বিধানের এক নোকতা রদবদলের চিন্তা যে করে সে কাফেরের সমতুল্য।'

আমার অধ্যাপক-বন্ধু গবুচন্দ্রের চোখে আবুল ফজল দজ্জাল। কিন্তু আমরা নিম মুসলিমের চোখে তিনি 'মোজাদ্দেদ'। সত্য-সুন্দর আর কল্যাণের ঋত্বিক। মানব-মুক্তির দিশারী। তাঁর জাগ্রত-চিত্তে যে শিল্প-সত্তার দীপ, তার শিখায় বিশ্বমানবতার, বিশ্বপ্রেমের আলো নিত্য উদ্ভাসিত। আবুল ফজলের আবির্ভাব সংস্কারাচ্ছন্ন জাতির জীবনে পরম দৈব। মঙ্গলময় তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন শাণিত কুঠার। তিনি শ্বাপদ-সংকুল ঘন বন কেটে গড়বেন নব মানবতার অবারিত তীর্থ। বিশ্বমিলনের আরাফাত। শীর্ণ নদীর ভাঙ্গা বন্দরে চৌদ্দ শ' বছরের নোঙর-বন্দী চাঁদ-তারার তরী ভাসিয়ে দিবেন নীল দরিয়ার অন্তবিহীন নির্মেঘ দিগন্তে। মনুষ্যত্বের সোনালী জলে আমাদের ললাটে এঁকে দিবেন মানুষের পরিচিতি স্বাক্ষর। যাক্।

শরীর কেমন? 'পাকওয়াতনের' বিশ্বখ্যাত উৎকোচবিদ আমরা। আজরাইলের জুব্বার জেব ফাঁপিয়ে তার 'লেজারে' আপনার মহাযাত্রার দিনক্ষণ আরও শতবর্ষ পেছিয়ে দিয়েছি। পালাবেনই বা কোথায়? স্বর্গে ত আপনার ঠাঁই নেই। ......

শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা জানাই। স্নেহ-ধন্য

আহমদুর রহমান

পত্র লেখক ডাক্তার আহমদুর রহমান চট্টগ্রাম, মীরেশ্বরী থানার লোক। দীর্ঘকাল সেন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর হজ্জযাত্রী জাহাজে ডাক্তার ছিলেন। কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। ভালো লেখা-পড়া জানেন আর এ বয়সেও লেখাপড়ার অভ্যাস ত্যাগ করেননি।

খান কয়েক বইও লিখেছেন তার মধ্যে 'মরু-মুকুর' উল্লেখযোগ্য। তাঁর চিঠি থেকে বুঝাই যাচ্ছে তিনি আমার রচনা আর মতামতের অনুরাগী। তবে তাঁর অধ্যাপক-বন্ধুটির কথার মতো আমার সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বাসও মাত্রাতিরিক্ত আর অবিশ্বাস্যরকম অতিরঞ্জিত। আমার সম্বন্ধে তাঁর আর তাঁর বন্ধুর মতামত কোনটাই সত্য নয়। আমার ব্যাপারে তথা আমার লেখা সম্বন্ধে পাঠক আর বন্ধুমহলে কি রকম পরস্পর-বিরোধী মতামত চলতি তার নিদর্শন হিসেবেই উধৃত চিঠিখানির যা-কিছু মূল্য। আর এখানে স্থান দেওয়াও হলো একমাত্র সে কারণেই।

১৮. ৮. ৬৯

আজ সকালে শওকত ওসমান এসেছিলেন দেখা করতে। দীর্ঘদিন পরে দেখা। দেখলাম আগের মতই মনে প্রাণে আর সর্ব অবয়বে তেমনি প্রাণবন্তই রয়েছেন। একটুও বদলাননি। শওকতকে দেখলে একটা সর্বতোভাবে জীবন্ত আর তাজা মানুষকে দেখার আনন্দ হয়। যদিও হুমায়ুন কবীরের মৃত্যুসংবাদে আজ উভয়ের মন ভারাক্রান্ত ছিল তবুও দিলখোলা আলাপ আলোচনা চল্লো অনেকক্ষণ ধরে। শওকতের উচ্ছলতাই মৃত্যু-শোক ভুলিয়ে রাখলে। সে ক্ষমতা শওকতের আছে। পঞ্চাশ-সন্নিকট শওকতের তারুণ্যে অনেকে বিস্মিত হন, উত্তরে শওকত বলেন: I know the philosophy of youth— যৌবনের দর্শন আমার জানা। মনে হয় কথাটা মিথ্যা নয়। তাঁর লেখায়, বলায়, চালচলনে সর্বত্র অশেষ তারুণ্যের একটা অভিব্যক্তি লক্ষ্য না করে পারা যায় না। তাঁর মতো এমন মুক্ত-মনা আর সর্ব-গ্রাহী লেখক আমাদের আর দ্বিতীয় জন আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর ব্যক্তিত্বই যেন তাঁর সাহিত্য, তা যেমন বিচিত্র ও প্রাণবন্ত, তেমন তীক্ষ্ণ, সময় সময় তা হয়ে ওঠে মর্মভেদী বর্শা-ফলক।

তাঁর মনের মতো তাঁর কলমের মুখও ধারাল, চকচকে আর

নিখাদ। বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেমন তেমনি রচনা-শৈলীতেও তাঁর অনন্য নিজস্বতা লক্ষ্য করবার মতো। বহু অপ্রচলিত, এমন কি অপাংক্তেয় শব্দকেও তিনি রচনায় স্থান দিয়ে ভাষার শব্দ-সম্পদ বাড়াবার পথ দেখিয়েছেন। বৈচিত্র্য তাঁর রচনার এক বড় বৈশিষ্ট্য। সবচেয়ে বড় কথা তিনি অত্যন্ত স্বনিষ্ঠ অনলস সাহিত্য-কর্মী। তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

গত বছর প্রেসিডেন্ট সাহিত্য পুরস্কার পাওয়ার পর আমার অভিনন্দনের উত্তরে তিনি আমাকে নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র চিঠি লিখেছিলেন তাও পূর্বোল্লেখিত চিঠিখানির সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে।

"...বে-মুরুব্বির দেশে আপনার মত কয়েকজন সবল মুক্ত প্রাণের জন্যই বাঁচার আস্বাদ হারিয়ে ফেলিনি। অনেকে Respectable কারণ তাঁরা old। শ্রদ্ধার আর কিছু মাপকাঠি নেই—শুধু বয়স, বয়স। আপনি তা মিথ্যা প্রমাণ করেছেন বলে আপনার স্নেহ-স্পর্শে বিচলিত না হয়ে পারি না, তা স্বীকার করছি এবং অকপটে। আপনার শুভেচ্ছা-সিক্ত প্রত্যাশা তাই যুগপৎ প্রেরণা ও ভয়—দুই আনে। আপনার মর্যাদাহানির কোন দুঃসাহস আমি ত দেখাতে পারব না। সাধনায় আমি অসাধু নই, এইটুকু আপনাকে আমি নির্ভয়ে জানাতে পারি। আপনার পত্র তাই পত্র নয়, ভবিষ্যতের পাথেয়

২০. ৮. ৬৮ — শওকত ওসমান

'সাধনায় অসাধু নই'— কথাটা সব শিল্পীর জন্যই মূল্যবান।

১৯. ৮. ৬৯

গতকাল হুমায়ুন কবীর মারা গেলেন দিল্লীতে। একটি অনন্য মেধা আর মনীষার অবসান ঘটলো—অবসান ঘটলো কিছুটা অকালে মাত্র তেষট্টি বছর বয়সে। ছাত্র-জীবনে হুমায়ুন কবীর ছিলেন

রীতিমতো এক কিম্বদন্তীর নায়ক, সমসাময়িক আর সতীর্থদের বিস্ময়, অনেকের আদর্শ, কারো কারো ঈর্ষার পাত্র। অনুকারকদের কেউই পৌঁছতে পারেনি তাঁর নাগালে। তাঁর যুগেও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর যে অভাব ছিল তা নয় কিন্তু কবীরের মতো বিভিন্ন বিষয়ে এতখানি মেধা, প্রতিভা আর কৃতিত্বের পরিচয় আর কেউ দিতে পারেনি। কবীর ছিলেন যাকে বলে অল্‌ রাউণ্ডার তথা সর্বতোমুখী। ইংরেজি সাহিত্যের কৃতীছাত্র, পরে উচ্চতর দর্শনও অধ্যয়ন করেছেন গভীর নিষ্ঠার সাথে অক্সফোর্ডে। ফলে তাঁর স্বাভাবিক মননশীলতা পেয়েছিল অধিকতর গভীরতা, হয়ে উঠেছিল আরো সমীক্ষিত। জীবন আর জ্ঞানের বিচিত্র পথে তাঁর সহজাত কৌতূহল আর প্রবণতা দিনে দিনে হয়েছিল সম্প্রসারিত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন বিষয় কম ছিল যে সম্বন্ধে তিনি প্রায় বিশেষজ্ঞের মতো কথা বলতে পারতেন না। কাব্য আর সাহিত্য ত ছিল তাঁর নিজস্ব এলেকা।

এ যুগে স্থূল উগ্রতা পরিহার করে থাকা বা চলা সহজসাধ্য নয়। মনে হয় দর্শন আর সাহিত্য কবীরকে তার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে মন-মেজাজে ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করেছিল। নিঃসন্দেহে মনে-প্রাণে আর প্রবণতায় তিনি ছিলেন সাহিত্য-শিল্প আর শিল্প-সংস্কৃতি জগতের মানুষ, তাতে তাঁর স্বকীয়তার স্বাক্ষরও যথেষ্ট। কিন্তু দেশের অবস্থা আর ভাগ্য তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল রাজনীতির দ্বন্দ্ব কোলাহল মুখরিত হট্টমন্দিরে—যা তাঁর অতি মূল্যবান পরিণত জীবনের এক বৃহৎ অংশকে করেছিল গ্রাস। ফলে বিদ্যা আর জ্ঞানের যে বিচিত্র ধারা-উপধারায় তাঁর বিচরণ ছিল সহজ তার প্রতি যেমন তেমনি তাঁর অসাধারণ মননশীলতার প্রতিও তিনি করতে পারেননি সুবিচার। তাঁর দেশ একারণে বঞ্চিত থাকলো তাঁর পরিণত আর প্রবীণ মন-মনীষার ফসল থেকে। তাঁর মৃত্যুতে এ ক্ষতিটাই সব চেয়ে শোচনীয়। রাজনীতি ভারতেও তেমন সুস্থ পথে

স্থিরতা লাভ করেনি। প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস- ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত আর কলুষিত, যুগের প্রয়োজনের আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ। দেশ আর জন-হিতে আত্মনিবেদিত নেতা আর কর্মীরা যতদিন কংগ্রেসে ছিলেন কবীরও ততদিন তাতে নিশ্বাস নিতে পেরেছিলেন স্বচ্ছন্দে। তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে সংস্কৃতিবান সংস্কৃতিমনা রুচিশীল মানুষ, সর্বসংস্কার-মুক্ত এক উদার সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের আবহাওয়ায় তাঁর মন আর চরিত্র হয়েছে রূপায়িত, তাঁর মন-মানস, ধ্যান-ধারণা তাতেই লালিত আর বর্ধিত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন তিনি ছিলেন সব সংকীর্ণতার উর্ধ্বে, তেমনি জীবন আর মত-বিশ্বাসেও ছিলেন ধর্মীয় কিম্বা সম্প্রদায়গত গোঁড়ামি থেকে মুক্ত। এ যুগে এমন মানুষ বিরল। এমন মানুষের পক্ষে কোন রকম ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শরিক হওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় ব্যক্তিগত কিম্বা দলীয় স্বার্থের রাজনীতি করা। তাই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে বার বার চেষ্টা করেছেন নতুন দল গঠন করতে কিন্তু কোথাও তাঁর মন স্বস্তি পায়নি। দল হতে না হতেই দেখেছেন শুরু হয়ে যায় দলাদলি, স্বার্থের আর ক্ষমতার লুকোচুরি খেলা। মনে হয় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ এক বিরাট রকমের মানসিক দ্বন্দ্ব, হতাশা আর ব্যর্থতায় তিনি ভুগেছেন।

একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি, সহিষ্ণুতা, যুক্তি বিচার আর সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনের পথে রাজনীতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য কবীরের মতো সৎবুদ্ধিজীবী লোকের হয়তো রাজনীতিতে আসার প্রয়োজন ছিল ও আছে কিন্তু পাক-ভারতে রাজনীতির এখন যে ঘোলাটে দশা তাতে এমন লোকের শান্তি কি স্বস্তি পাওয়ার কথা নয়। তিনিও পাননি, যেমন শেষ পর্যন্ত পাননি তাঁকে যিনি স্বাধীনতার পর জোর করে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন সেই মাওলানা আজাদও। কবীর যেমন ছিলেন পাশ্চাত্য 'ধর্মনিরপেক্ষ'

বিদ্যায় অসাধারণ বিদ্বান তেমনি মাওলানা আজাদ ছিলেন ইসলামী বিদ্যা আর ধর্মীয় জীবন-দর্শনে অসাধারণ পণ্ডিত। এ দুই বিপরীতের সহযোগ আর সমন্বয়ও লক্ষ্য করবার মতো। অত্যন্ত স্বল্লায়ু হলেও তা যে নিতান্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল, সে সত্য অনস্বীকার্য। কবীরের সহায়তা না হলে 'India Wins Freedom' আদৌ লেখা হতো কিনা সন্দেহ। কবীরের ইংরেজি বিদ্যা প্রশ্নাতীত। বাংলা কবিতা আর গদ্যেও তাঁর কলমের গতি ছিল সহজ আর অবাধ। এ দুই ক্ষেত্রেই তাঁর ভাষণ আর রচনা-শৈলীতে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর ভাষণ আর বক্তব্য যেমন সহজ ও সরল তেমনি তা আকর্ষণীয় ভাবে সুখপাঠ্য। তাঁর গদ্য ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মতো স্বচ্ছ আর গতিশীল, তাতে কষ্ট-কল্পনার দুরূহতা অনুপস্থিত। এমন সহজ সরল অনায়াস-বোধ্য গদ্য আজকের দিনে অনেকের পসন্দ নয় কিন্তু সর্বতোভাবে আধুনিক হয়েও কবীর তাঁর রচনার স্বাভাবিক গদ্য-ভংগী কখনো ত্যাগ করেননি। গ্রহণ করেননি আধুনিক কাব্যরীতিও। রাজনীতি তাঁর পরিণত জীবনের এক বড় অংশ গ্রাস না করলে, আমার বিশ্বাস, সাহিত্য আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে যেতে পারতেন।

সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, শিক্ষা আর সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদার চিন্তাবিদ, যাঁরা নিজেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন আর অকুতোভয়ে সে চিন্তা মার্জিত আর শৈল্পিক ভাষায় বলতে চান, বলতে সক্ষম, তেমন অনুশীলিত মন-মনীষার অধিকারী এ যুগের মুসলমান সমাজে বেশী জন্মাননি। আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে যে সীমিত সংখ্যক মনীষা মুসলমান সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছে নিঃসন্দেহে হুমায়ুন কবীর তার অন্যতম। তাঁর তিরোধানে ভারেতীয় মুসলমান সমাজ বহুদিক দিয়েই দরিদ্র হলো আর ভারতীয় রাজনীতি একটা সুস্থ ও স্বচ্ছ মনের অবদান থেকে হলো বঞ্চিত। রাজনীতি

এখন ও-দেশে নতুন পথে মোড় নিচ্ছে, মনে হয়, এখন থেকে তা গণমুখী খাতে বইতে শুরু করবে। এ পরিবেশে কবীরের মতো মনীষা অধিকতরগুরুত্বপূর্ণ আর ফলপ্রসূ ভূমিকা হয়তো পালন করতে পারতো। তার চেয়েও দুঃখের বিষয় তাঁর মৃত্যুতে মননশীলতার আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়লো। ভারতীয় রাজনীতি হারালো একজন বিজ্ঞ চিন্তানায়ককে আর ভারতের মুসলমানরা হারালো একজন সুযোগ্য প্রতিনিধিকে, যিনি তাঁদের হয়েও নিজের যোগ্যতা আর গুণপনায় হতে পেরেছিলেন সর্বভারতের, এমন মানুষ সব সমাজেই দুর্লভ।

দুর আকাশের দীপ্তিমান নক্ষত্রের দিকে যেমন মানুষ বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে তাকায়, তাঁর জন্মভূমি পূর্ব-পাকিস্তানের মননশীল বুদ্ধিজীবীরাও তাঁর প্রতি সে ভাবেই তাকাতো। এখন তাঁদের দৃষ্টি থেকে সে নক্ষত্র হারিয়ে গেল।

২১. ৮. ৬৯

আজ সকালে ডক্টর এনামুল হক এসেছিলেন। মনে হলো আলাপ-আলোচনা আর গল্পগুজব করে মনের ভার কিছুটা লাঘব করতে চান। সম্প্রতি শোকের এক বিরাট ঝড় তাঁর উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এমন শোকে আমরা হয়তো ভেঙ্গে মুসড়ে পড়তাম। তিনি দেখলাম মুখের স্বাভাবিক হাসি আর মনের রস-বোধ এ অবস্থায়ও অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। হতে পারে, বেদনার ফল্গু-ধারাকে এ ভাবে হাসি আর রসালাপ দিয়ে হয়তো চেপে রাখতে চেষ্টা করছেন অন্তরের গভীরতম লোকে। আমাদের এ মানসিক দরিদ্র সমাজে ডক্টর এনামুল হক এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব—কর্মে কিম্বা চিন্তায় যিনি জানেন না কোন রকম ফাঁকি। বিদ্যাচর্চা যেমন তাঁর নিখাদ, মন আর চরিত্রটিও তাই। এ যুগে তাঁর মতো চরিত্রবান লোক সত্যই দুর্লভ। কোন ব্যাপারেই নীচু হওয়া,

মাথা-নীচু করা বা নীচতা দেখানো তাঁর দ্বারা হয়নি। লোকটার বাহির-ভিতর দুই-ই যেন স্ফটিক স্বচ্ছ। তাঁর সঙ্গ আর সান্নিধ্য আমার কাছে অসীম আনন্দের। তাই তাঁকে পেয়ে আজ আবার নতুন করে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। মুহূর্তে আমাদের আলাপ-আলোচনাকে ঘিরে যেন চারিদিকে একটা প্রসন্ন পরিবেশ রচিত হলো তাঁর ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া আর রসালাপে। তাঁর সান্নিধ্যে দৈহিক ক্লান্তি কিম্বা মনের ঝিমুনি বেশীক্ষণ ঠাঁই পায় না। অতি বড় শোকের দিনেও তাঁকে বিরস-মুখ দেখিনি। তখন তিনি যেন হয়ে ওঠেন বিশ্বাস, প্রত্যয় আর অসীমের উপর নির্ভরতার প্রতীক।

বাংলা একাডেমি, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড—এই দু'টি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভিৎ-পত্তন, সংবিধান রচনা এবং প্রাথমিক কাঠামো গড়া এবং একটি শক্ত বুনিয়াদের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া তাঁর কর্মজীবনের অক্ষয় কীর্তি। ইতিপূর্বে একাধিক সমস্যা-সংকুল কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বও অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তিনি পালন করেছেন। তিনি পণ্ডিত মানুষ। কেউ কেউ বলেন, ডক্টর শহীদুল্লার পরে পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তিনিই আমাদের 'সবে ধন নীলমণি'। পেশাগত জীবনে তাঁকে বহু কঠিন আর অপ্রিয় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। সর্বত্র আর সবসময় তাঁর সততা, আন্তরিকতা আর সমস্যার মোকাবেলা করার সাহস আর যোগ্যতা তাঁকে উর্ধ্ব-শির থাকতে করেছে সহায়তা। মনে হয় তাঁর চারিত্রিক সততাই তাঁর আত্মবিশ্বাস আর অসীম মনোবলের উৎস। এ যুগে এমন চারিত্রিক সততা সচরাচর চোখে পড়ে না।

ছাত্র হিসেবে পড়েছেন আরবীতে অনার্স কিন্তু এম. এ. তে বাংলা, যাতে সে যুগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। তারপর উভয় বিদ্যার সারাৎসার ডক্টরেট নিয়েছেন বাংলা

দেশে সূফীজন বা সূফীবাদ সম্বন্ধে গবেষণা করে। ঐ দুই বিদ্যাই এ ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়ক হয়েছে তাঁর।

তাঁর ব্যক্তিগত সততার অনেক গল্পই শোনা যায়। তাঁর একটি বাড়ী করবেন বলে ঢাকায় জায়গা নিয়েছেন খানিকটা। কিন্তু তদবিরের অভাবে বাড়ীর প্ল্যান আর কিছুতেই মঞ্জুর হয় না। ছেলে মাস কয়েক হাঁটাহাঁটি ক:র শেষে বিরক্ত হয়ে বাপকে বল্লে: কয়েক শ' টাকা দিলেই ত প্ল্যানটা একদিনেই মঞ্জুর হয়ে যায়। টাকাটা ত আমিই দেবো, আপনাকে ত আর যেতে হচ্ছে না। কত লোকেই ত এ ভাবে প্ল্যান পাশ করিয়ে নিয়ে ঘর পর্যন্ত তুলে ফেল্লে!

শুনে বাপ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন: তা হলে আমাকে বাপ না ডেকে ওদেরে বাপ ডাকোগে না কেন? এমন বাপের ছেলে হওয়ার যে কি দায় ছেলে হয়তো এবার তা ভালো করেই টের পেলো!

তাঁর যে জামাইটি সেদিন আকস্মিক ভাবে মারা গেলো তার মুখে শুনেছি, তার শালা অর্থাৎ এনামুল হক সাহেবের ছেলে যখন পাশ করে বের হলো তখন ওকে ও চাটগাঁ নিজের বাসায় নিয়ে এসেছিল একবার। উদ্দেশ্য সদ্য পাশ করা শ্যালকের জন্য একটা চাকুরির চেষ্টা করা, জানে শ্বশুরের দ্বারা তদ্‌বির কস্মিনকালেও হবে না। ও নিজে এক বিদেশী কোম্পানীতে ভালো চাকুরি করতো—নানা মহলে আনা-গোনা আর পরিচয় ছিল। এখন চলনসই রকম চাকুরি পেতে হলেও অন্তত দু-এক মাস ধরে তদ্‌বির চালাতে হয়।

সপ্তাহ পার হতে না হতেই এনামুল হক সাহেব ছেলের উপর ফরমান জারি করলেন: বোনের বাড়ি এক সপ্তাহের বেশী থাকা অশোভন। আত্মসম্মানের খেলাপ। অতএব চলে এসো। যে ছেলের বাপের আত্মসম্মানজ্ঞান এমন টনটনে তার পক্ষে তাই কোম্পানীর বড় চাকুরি জোটানো আর হয়ে উঠলো না, ফিরে যেতে হলো বাপের ছেলে বাপের কাছে।

অবসর গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে বেশ ভালো মাহিনায় একটা চাকুরিও নাকি তাঁর হয়েছিল। এ টনটনে আত্মসম্মান-জ্ঞানের জন্য সেটাও এক মুহূর্ত্ত না ভেবে ছেড়ে দিয়ে তিনি এখন স্রেফ পেনসন-নির্ভর হয়েই আছেন।

সেটা ছেড়ে দেওয়ার পেছনেও যে লজ্জাকর কাহিনী জড়িত তাও কম কৌতুহলোদ্দীপক নয়। কর্তা ব্যক্তিদের নীচতা যে কতখানি নীচু হতে পারে এ তারও এক নজির।

ক্ষমতা আর উচ্চপদ মানুষকে উন্নত-মনা আর দরাজ দিল করে বলেই আমরা জানতাম। দুঃখের বিষয় এখন আমাদের কর্তা ব্যক্তিরা তার বিপরীতটাই পদে পদে প্রমাণ করে থাকেন। এও আমাদের এক বড় দুর্ভাগ্য। কিছুটা মার্জিত আর উন্নত চরিত্রের মানুষের দ্বারা শাসিত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের আর হলই না এ যাবৎ।

কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ খালি হলে তা পূরণের জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজে পাওয়া রীতি মতো সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো, শেষে অনেক বলে কয়ে ডক্টর কুদরৎ-এ-খোদাকে রাজি করানো গেল। অনুরাগীদের অনুরোধ উপরোধ এড়াতে না পেরে অগত্যা তিনিও মত দিতে বাধ্য হলেন। ভাবলেন হাজার হোক একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান আর মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের বই-পুস্তক রচনায় কিছুটা সাহায্য ত অন্তত করতে পারবেন তিনি!

তাঁর নিয়োগ যথাসময় গেজেট হলো, তিনিও যথাসময় তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান এলেন পূর্ব পাকিস্তান সফরে। এ সুযোগে সাবেক প্রদেশ-পাল তাঁকে জানালেন: ডক্টর কুদরৎ-এ-খোদা আমাদের সমর্থক নন্। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করে উচ্চ শিক্ষাকে প্রায় খতম করে এনেছিলাম তখন অধ্যাপক আর নাগরিকদের পক্ষ থেকে, আমার বিরুদ্ধে হুজুরের কাছে যে ডেপুটেশন এসেছিল সে ডেপুটেশনের যিনি নেতৃত্ব

করেছিলেন তাঁকেই কিনা এখন উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। এর চেয়ে বড় বেইজ্জতি আমার আর কি হতে পারে আপনিই বলুন, হুজুর ?

: তাই নাকি ? এত বড় বেয়াদবি ! 'লৌহ-মানব'র সর্ব অবয়ব মুহূর্তে হাপড়ে পোড়া লোহার মতো লাল হয়ে উঠলো।

: ওঁদের অভিযোগ, একদল ছাত্র এক অধ্যাপককে মেরেছে, আচ্ছা হুজুর, ছাত্রের বদলে গুণ্ডা দিয়ে মারালে কি অধ্যাপকের পক্ষে বেশী সম্মানের হতো ?

: জানোই ত বুদ্ধিজীবীরা সব সময় কিছুটা আহম্মক হয়ে থাকে, তাই দেখছ না ওদেরে আমি কোন পাত্তাই দিই না। আমার সরকারে এত পুলিশ অফিসার আমদানির বড় কারণ ত এখানে। পুলিশ অফিসারদের অন্তত 'বুদ্ধিজীবিতা' রোগ নেই।

: আমি ত হুজুর সে জন্যে পুলিশকে ঐ কেস্ নিতেই দিইনি, বরং ঐ অধ্যাপক যাতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয় সে ব্যবস্থাও করে রেখেছি।

: বেশ করেছ, এইতো চাই।

আমতা আমতা করে দুই নম্বর এবার তাঁর আসল মতলব পেশ করলেন : বোর্ডের এ চেয়ারমেনকে না সরালে হুজুর, এ নচ্ছার সুবাকে শায়েস্তা রাখা আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হবে।

: ঠিক হে। খামোখা তোম কষ্টো পাবে কেউ ? ঐ হোগা। এক নম্বর 'লৌহমানব' হুঙ্কার দিয়ে অভয় দিলেন তাঁর দুই নম্বরকে।

এ সংলাপটা কাল্পনিক মনে হলেও কাল্পনিক নয় মোটেও। Fact is stanger than fiction !

রাউলপিণ্ডি ফিরে গিয়ে তিনি বিভাগীয় মন্ত্রীকে ডেকে ধমকে দিলেন।

মন্ত্রী ভদ্রসন্তান। শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির মানুষ। বোর্ডের ভালোর জন্যই ডক্টর কুদরৎ-এ-খোদার মতো সম্মানিত ব্যক্তিকে তিনি

নিযুক্ত করেছিলেন। এখন দেখলেন কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। মন্ত্রী হয়েও তিনি নিরূপায়। অগত্যা তড়িঘড়ি ফোন করে দিলেন ঢাকায়ঃ ডক্টর কুদরৎ-এ-খোদাকে পদত্যাগ করতে বলে দিন।

ডক্টর কুদরৎ-এ-খোদার কাছে এ পরিণতি একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। কারণ সরকার ঘেঁষা মহলে গোড়া থেকেই তাঁকে নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়েছিল। তিনি ত মোটেও ঐ পদের প্রার্থী ছিলেন না। এক রকম জোর করেই অনুরোধের এ ঢেঁকি তাঁকে গিলানো হয়েছিল। এখন উদগার করতে পারলেই যেন বাঁচেন। তাই ভাবতে হলো না এক সেকেণ্ডও। পাঠিয়ে দিলেন পদত্যাগপত্র সঙ্গে সঙ্গে।

শাসন ক্ষমতা ইতর লোকের হাতে পড়লে ইতরামি কতদুর গড়াতে পারে এ সব নেপথ্য কাহিনী তারই দলিল। 'মানীর অপমান বজ্রতুল্য' —এ বাল-পাঠ্য বইয়ের উক্তি হলেও আজো তা মিথ্যা হয়ে যায়নি। এ ঘটনার অল্পদিনের মধ্যেই লোক-ধিক্কারের বজ্র কি ভাবে এ ইতরদের মাথার উপর নেমে এসেছিল তা আজ আর কারো অজানা নয়।

আত্মসম্মানের ব্যাপারে ডক্টর এনামুল হক ত আরো এক ডিগ্রী টনটনে। মুহূর্তে বুঝতে পারলেন তেমন একটা অপমান তাঁর জন্য ওঁৎ পেতে রয়েছে। কারণ তাঁর নিয়োগ নিয়েও নেপথ্য কানাকানির অন্ত ছিল না। ডক্টর খোদার পদ ছিল অনারারি—বিনা বেতনের কিন্তু তাঁর পদের মাসিক মূল্য ত দেড় হাজার কিম্বা অনুরূপ। তবে পদ বা অর্থ লোভে আত্মসম্মান খোয়াবার বান্দাও এনামুল হক নন্। তাই তাঁকেও ভাবতে হল না এক সেকেণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন পদত্যাগ পত্র। এমন কি নিলেন না কাজ-করা মুদ্দতের মাইনেও।

চারিত্রিক সততা আর আত্মসম্মান জ্ঞানের মণি-কাঞ্চন সংযোগ তাঁর ব্যক্তিত্বকে দিয়েছে এক মনোরম শোভনতা—তাঁর সান্নিধ্যে এলেই তার সৌন্দর্য সে সঙ্গে তার মাধুর্যও সহজে অনুভব করা যায়। আমাদের বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে ডক্টর এনামুল হক এক অনন্য চরিত্র।

তাঁর রচনা-সংখ্যা নেহাৎ পরিমিত হলেও তাতেও তাঁর জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা আর মানসিক সততার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এমন মানুষের বন্ধুত্ব সত্যই এক পরম সম্পদ।

২৮. ৮. ৬৯

শেষ বয়সে হঠাৎ এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অনেক দুঃখ কষ্ট, দারুণ অর্থাভাব আর দুরারোগ্য রোগ ব্যাধিতে ভুগে পঙ্গু অবস্থায় লোকমান খাঁ শেরওয়ানী গতকাল (২৭ শে আগষ্ট ১৯৬৯) লোকান্তরিত হলেন। স্বীকার করতেই হবে ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে তিনি বেশ কিছুটা অনন্যই ছিলেন আমাদের সমাজে। শেরওয়ানী লকবটিও সে অনন্যতারই এক ক্ষুদ্র স্বাক্ষর। চট্টগ্রাম শহরের পাঠানটুলি খাঁ-পরিবারেই তাঁর জন্ম। সে সূত্রে বংশের অন্যান্যদের মতো তিনিও বংশ পদবী খাঁ পর্যন্ত লেখারই ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। শেরওয়ানী তাঁর নিজের আমদানী, নিজস্ব নির্বাচন—নিজেই যোগ করে নিয়েছেন নিজের নামের সাথে। আমদানীর কারণ আর উৎস আমার জানা নেই। পরে অবশ্য ব্যবহার করতে করতে এ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে পড়েছিলেন ঘরে-বাইরে সর্বত্র। তাঁর যুগে বাংলা দেশে ব্যক্তিগত আর জন-জীবনে তিনিই ছিলেন একমাত্র আর অদ্বিতীয় শেরওয়ানী।

তাঁর অনন্যতার সব চেয়ে বড় নিদর্শন ছিল তাঁর দৈহিক অবয়ব। সাধারণত অমন শাল-প্রাংশু-দেহ বাংলা দেশে কোথাও নজরে পড়ে না। তাঁকে প্রথম দেখে রবীন্দ্রনাথ নাকি অবাক কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন: তুমি বাঙালীর ছেলে। বিশ্বাস ত হয় না! রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলে অপরিচিতরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতো না এ গৌর-বর্ণ বিরাট লোকটার জন্ম এদেশে। স্বাস্থ্য আর বর্ণের মণি-কাঞ্চন সংযোগ তাঁর দৈহিক ব্যক্তিত্বকে করে তুলেছিল অধিকতর আকর্ষণীয় এবং বিশেষ ভাবে দর্শনীয়। দেখলে তাঁর ঐ বিশাল সমুন্নত অবয়বের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে না থেকে

পারা যেতো না। কৈশোর আর যৌবনে ছিলেনও অমিত শক্তির অধিকারী—পারতেন দৈহিক বলের নানা দুঃসাহসিক কসরত দেখাতে। এমনকি চলন্ত মোটর গাড়ীও পারতেন ধরে রাখতে। সেদিন দেশব্যাপী জাতীয় জাগরণের আনুষঙ্গিক হিসেবে শরীর চর্চা, ব্যায়াম করা আর ব্যায়ামাগার গড়ে তোলা, জুজুৎসু শেখা, আখড়া প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির যেন একটা বান ডেকেছিল। দেশের তরুণদের মধ্যে দৈহিক বলে বলীয়ান হয়ে ওঠার একটা বাঁধ-ভাঙ্গা জোয়ার এসেছিল সেদিন সর্বত্র। সন্ত্রাসবাদের পটভূমিও রচিত হয়েছিল এসব ব্যায়ামাগার আর আখড়ায়। চট্টগ্রামের মুসলিম তরুণদের মধ্যে এক্ষেত্রে লোকমানের ছিল অগ্রভূমিকা, তিনি ছিলেন সে জোয়ারের প্রতিভু, তার সর্বোচ্চ তরঙ্গ শীর্ষ। উনিশ শ' ত্রিশে মল্লবীর গামা একবার চট্টগ্রাম এসেছিলেন, তখন শেরওয়ানী ষোল বছরের কিশোর। গামার সঙ্গে কুস্তি লড়তে সে বয়সেই এ দুঃসাহসী কিশোর এগিয়ে গিয়েছিলেন! গামার মতো প্রবীণ বিশ্বখ্যাত মল্ল যোদ্ধা এমন একটা অল্পবয়স্ক নাবালকের সঙ্গে মন আর সব শক্তি দিয়ে লড়তে যাবেন কেন? তবে বোধ করি বালকের শক্তি পরীক্ষা করে দেখার জন্য তার সঙ্গে লড়লেন বা কুস্তি-কুস্তি খেল্লেন কয়েক মিনিট ধরে।

লোকমানের দৈহিক গঠন আর ঐ বয়সেও শক্তির যেটুকু পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তাতে গামা নাকি খুশী হয়ে খুব তারিফ করেছিলেন। যৌবনে লোকমান খেতেও পারতেন প্রচুর। পাঠান-টুলীর খাঁ-বংশের মাংস-প্রিয়তা এক বহু-শ্রুত আর বহু-আলোচিত ব্যাপার। চট্টগ্রামের দেওয়ান হাট বহুকাল থেকেই গো-মাংসের জন্য বিখ্যাত আর সে হাট কিনা এঁদের বাড়ির লাগোওয়া। কাজেই এ লোভনীয় খাদ্যটা পেতে ওঁদের কোন বেগ পেতে হতো না। শুনেছি ঐ বাড়ির কোন ঘরই এখনো এক আধ সের মাংস কেনে না! গ্যাস্টিক আলসারে ভুগলেও ওঁদের বিশ্বাস প্রচুর গো-

মাংস খেলেই তা সেরে যায়। একবার ঐ পরিবারের এক উচ্চ শিক্ষিত এ রকম রোগীকে অত্যধিক গো-মাংস খেতে বারণ করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : তা হলে না খেতে না খেতে মাংস খাওয়ার অভ্যাস আর তা হজম করার শক্তিই আমার লোপ পাবে!

সুস্থ অবস্থায় লোকমানেরও প্রচুর মাংসের সেরা গো-মাংসের প্রতি অসম্ভব লোভ ছিল। খাওয়ার সময় ত বটেই, খেয়ে ওঠার পরও ওর সামনে বড় বাটিতে এক বাটি মাংস রাখা না হলে ও নাকি মায়ের উপর চটে আগুন হয়ে যেতেন! বসে বসে বাটিটা সাবাড় করে তবেই উঠতেন আচাঁতে! নিয়তির কী অপূর্ব কৌতুক যে গো-জবেহ বা গো-হত্যা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে সুদীর্ঘকাল ধরে পরস্পরের রক্তগঙ্গা বইয়েছে, যে মাংসের চেয়ে অস্পৃশ্য আর কিছু নেই হিন্দুর কাছে সেই হিন্দু সমাজের শিশির কণা গুহ কিনা স্বেচ্ছায় শবনম খানম শেরওয়ানী হয়ে দুর্দান্ত গো-মাংস-খোর লোকমানের বধূ বা গৃহলক্ষ্মী হয়ে এলেন! আর অচিরে হয়ে উঠলেন সত্যিকার অর্থে সহধর্মিনী, গৃহলক্ষ্মী আর আদর্শ মুসলিম স্ত্রী। পরে আদর্শ গৃহিনী, জননী, জীবন-সঙ্গিনী, সুখ-দুঃখ-ভাগিনী, আত্মবিলুপ্ত এক সেবিকা!

যে এখন বোরকা ছাড়া বাইরে যায় না, আজন্মের সমস্ত বিশ্বাস সংস্কার, অভ্যাস আর আচার-আচরণকে চিরতরে কর্ণফুলির জলে বিসর্জন দিয়ে সুস্থ অবস্থায় যে লোকমানের মতো খেয়ালী কর্কশভাষী স্বামীকে দিনের পর দিন, নিজের চৌদ্দপুরুষের জন্যে অস্পৃশ্য বস্তু রেঁধে খাইয়েছে (হয়তো নিজে কোনদিন মুখেও তোলেনি)! যে দীর্ঘ পাঁচবছর ধরে রুগ্ন, পঙ্গু এ শয্যালীন স্বামীর মল মূত্র নিজের হাতে করেছে পরিষ্কার!

শুধু কি তাই? নিজের সামান্য বিদ্যার পুঁজি নিয়ে প্রাথমিক স্কুলে ক্ষীণ বেতনে শিক্ষিকার কাজ করে স্বামীর চিকিৎসা-ব্যয় আর

ভরণ-পোষণ চালিয়েছে এ মেয়ে এ যাবৎ। লোকমানের কোনদিন নির্দিষ্ট কোন আয় ছিল না। শেষ পাঁচ বছর ত স্ত্রীর দু'খানি অনলস পা আর অক্লান্ত দু'খানা হাত ছাড়া আর কোন অবলম্বনই ছিল না তাঁর। এমন এক চাল-চুলাহীন চির বেকার এক খেয়ালী 'স্বরাজীর' সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়েছে, কখন কি অভাবের মধ্যে পড়ে কে জানে, এ ভেবে বিধবা মা মৃত্যুর সময় পুত্রদের বলে 'পরিবার-ত্যাগিনী' এ মেয়ের হাতে নগদ তেরটি হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন—দুর্দিনের নিদান। মেয়ে নিজের হাতে একটি পয়সাও না রেখে সে টাকার সবটাই তুলে দিলে স্বামীর হাতে। তের দিন কি তের মাস পরে দেখা গেল ঘরে তেরটি টাকাও নেই! অত্যন্ত স্বচ্ছল, সম্ভ্রান্ত এক শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে শিশির কণা ওর্ফে আজকের শবনম খানম। বিয়ের পর লোকমান যখন দীর্ঘ চার বছর ধরে জেলে আটকা তখন বিধবা মা-ই শবনমকে নিজের পক্ষপুটে দিয়েছিলেন আশ্রয়। লোকমানদের গোঁড়া মুসলমান পরিবার তখন শবনমকে হজম করার মতো অবস্থায় পৌঁছেনি। পরেও ভাইরা ওকে ওদের কাছে চলে যেতে বার বার করে বলেছে, শবনম যায়নি। শবনমের এক ভাই বিলাতে বড় চাকুরি করেন। তিনি তার এক ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ওখানে। বলেছিলেন: লেখাপড়া শিখিয়ে, মানুষ করে, তোমার ছেলে তোমার কাছেই পাঠিয়ে দেবো। লোকমান রাজি হয়নি বলে এমন লোভনীয় প্রস্তাবে শবনমও রাজি হতে পারেনি। স্বামীর মতই তার মত, এর অন্যথা হয়নি কোনদিন।

চট্টগ্রাম খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী শিশির কণা, স্কুলের সেরা গায়িকা, যারা শহরে 'কোকিল-কণ্ঠী' নামে পরিচিতা—সে মেয়ে একদিন দাদাদের বন্ধু আর দেশের কাজে সহকর্মী, সুদর্শন আর সমুন্নত-দেহ লোকমানকে দেখে ভুলে গেল,

ভুলে গেল নিজেকেও। মুহূর্তে বরণ করে নিলে মনে-প্রাণে সর্ব-সত্তা দিয়ে এ বিরাটদেহী মানুষটাকে জীবনের চিরসাথী হিসেবে। একটি বারও ভাবলে না জাত-ধর্মের কথা, ভাবলে না লোকটার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা, অবস্থা কিম্বা খেতে পরতে দেওয়ার সামর্থ্য ইত্যাদি কিছুই। ছাড়লে নিজের ধর্ম, সমাজ, পরিবার, পারিবারিক স্বচ্ছলতা, সুখ-শান্তি, স্নেহ-মমতার সব বন্ধন। এমনকি নিজের প্রিয়তম সাধনা সংগীত ছাড়বারও নিলে শপথ, কারণ, স্বামী-পরিবারের ধর্ম আর সংস্কারে তা বাধে। এভাবে পেছনের সব ঐশ্বর্য ছেড়ে সর্ব-রিক্তা হয়েই শিশিরকণা ওর্ফে শবনম খানম এক গোঁড়া পাঠান-পরিবারের বধূত্ব নিলে বরণ করে। বরণ করে নিলে এমন একজন মানুষকে যে দেহে বিরাট বটে কিন্তু মনের দিক দিয়ে একদম এক সরল শিশু। যার স্বভাব আর আচরণে দায়িত্ব বোধের কোন বালাই নেই।

এমন স্বামীকে নিয়েই শবনমের সারা জীবন কেটেছে।

চির উদার অসীম সহিষ্ণু আর পরম স্নেহশীল পিতৃ-পরিবার সব সময় তাকে স্বাগত জানিয়েছে (আশ্চর্য ওর সিদ্ধান্তকে ওঁরা কোনদিন নিন্দার চোখে দেখেনি!) কিন্তু সুখের সব প্রলোভনকে জয় করে সে যে একদিন বুকের তলায় প্রেমের একটি ক্ষুদ্র দীপ-শিখা জ্বালিয়ে তার আলোয় অচেনা অজানা এক অসীমের পথে পা বাড়িয়েছিল তা ছেড়ে সে আর একবারও পেছন ফিরে তাকায় নি। যাকে দেখে তার অন্তরের মণিকোঠায় জীবনের উষালগ্নে এ দীপ-শিখা জ্বলে উঠেছিল সে আজ নেই, হারিয়ে গেছে চিরতরে। নিয়েছে সব রকম ভবযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি। কিন্তু শবনম ত পায়নি মুক্তি, বরং এখন থেকে তার ভবযন্ত্রণা আরও বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। স্বামী ছ'ছ'টি নাবালক পুত্র-কন্যা রেখে গেছেন, রেখে যাননি ওদের মুখের গ্রাস। যে অনির্বাণ দীপ-শিখা ওকে এতকাল

১৩—

অভয় দিয়ে এসেছে, দিয়েছে শক্তি, পদে পদে জুগিয়েছে উৎসাহ ও প্রেরণা তার উৎস-মূল ত ওর মন, ওর অন্তরের সে মণিকোঠা। তাই লোকমানের মৃত্যুর পরও শবনম রয়ে গেছে অপরাজেয়। তার দুই পা আর দুই হাত আজো তেমনি অনলস ও অক্লান্ত।

শবনমের ভাই-বোনেরা সবাই বি. এ., এম. এ। শবনম নবম শ্রেণীর উপরে কেন যেতে পারেনি তার আভাস উপরে দেওয়া হয়েছে। বিয়ের সময় চিরদিনের জন্য গান ত্যাগের যে শপথ শবনব নিয়েছিলো, বিয়ের শপথের মতই তা আজো তার কাছে পবিত্র। তা না হলে সে যে-রকম সুগায়িকা আর মধুরকণ্ঠি, রেডিয়ো-টেলিভিশনেও গেয়ে কিছুটা উপার্জন সে করতে পারতো স্বচ্ছন্দে। শপথের অর্গল দিয়ে সে পথও তার জন্য বন্ধ। বিয়ের পর থেকে সে হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ নেপথ্যচারিণী, স্বামীর দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কাছে আত্মনিবেদিতা এক সেবা-সঙ্গিনী। এ সর্বত্যাগিণী সর্বংসহা অসামান্যা মেয়েটির কথা যখন ভাবি তখন আমার বার বার মনে পড়ে কোথায় লাগে এর কাছে শরৎচন্দ্রের কাল্পনিক চরিত্র ইন্দ্রনাথের দিদি—যার নাম অন্নদা। সাপুড়ের মৃত্যুর পর অন্নদা ত মুক্তি পেয়েছিল সহজে, শবনমের সে মুক্তিও নেই।

৩১. ৮. ৬৯

আজ প্রাতঃভ্রমণের সময় এক বাল্য-বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তিনিও অধ্যাপক ছিলেন, এখন আমার মতো অবসর-ভোগী। কথায় কথায় বল্লেন: তাঁর এক বন্ধু নাকি বলেছেন, 'আবুল ফজল আল্লাহ্ মানে না।' কথাটা সত্য কিনা জানতে চাইলেন।

বল্লাম: তাতে তোমার বন্ধুবরের এত মাথা ব্যথা কেন? আমার মানা না-মানায় তাঁর কি কোন ক্ষতি হচ্ছে? আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এ যদি তিনি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন তাহলে তাঁর ত জানা থাকা উচিত—আল্লাহ আমাকে মারতেও পারেন,

ধরতেও পারেন আবার রাখতেও পারেন। আমি যদি তেমন অপরাধ করে থাকি সে বিচারের ভার নিশ্চয়ই তোমার বন্ধুর উপর নয়—আল্লাই যে দণ্ডমুণ্ডের মালিক এ কথা কি তোমার বন্ধুর জানা নেই? আমার বিশ্বাস তার জন্য আল্লার কোন গোয়েন্দা বা ইনফরমার রাখার প্রয়োজন পড়ে না।

হঠাৎ এ সময় রবীন্দ্রনাথের এ বিখ্যাত উক্তি যা মিঃ এ, কে, ব্রোহীও তাঁর 'ধর্ম ও সমাজতন্ত্র' প্রবন্ধে উধৃত করেছেন আমার মনে পড়লো; I love God because He has given me the freedom to deny Him. কথাটা আমার উক্ত বন্ধু আর উপস্থিত সবাইকে শুনিয়ে দিলাম। কবির ঈশ্বর উপলব্ধির গভীরতা দেখে সবাই যেন অবাক হয়ে গেলেন। আমার বন্ধুটি মামুলি অর্থে ভক্ত আর স্বভাবে অতিরিক্ত মুখর, দেখলাম এমন লোকও লা-জবাব।

ভাবের কথার জয় এখানে যে, যারা স্বভাবে ভাবুক নয় তাদেরেও তা ভাবায়।

১৫. ৯. ৬৯

ঢাকা শহরের এক প্রান্তে তারাবাগ। অভয় দাস লেনের সীমান্তে 'সমকালের' পুরানো অফিস ছাড়িয়ে গেলে সামনে পড়ে একটা পুকুর। ওটার তিন পাড় ঘুরে একটা মেলা-খোলা মাঠ পার হলেই দেখা যায় জীর্ণ-শীর্ণ টিনের একতালা একটি ঘর। ধরতে গেলে ঘর একটাই, দু'পাশে দু'টা খুপরি, একটাতে রান্না চলে আরেকটায় কেউ বোধ করি শোয় বা ছেলেদের কেউ পড়াশোনা করে। দীর্ঘকাল এ বাড়িতেই কাটিয়েছেন স্বনামধন্যা কবি বেগম সুফিয়া কামাল। বরিশাল শায়েস্তাবাদের নবাব বংশের দৌহিত্রী কি প্র-দৌহিত্রী কিংবা প্র-প্র-দৌহিত্রী এমন কিছু একটা তিনি, যা এখন স্রেফ স্মৃতিতেই পর্যবসিত। যে স্মৃতির জাবর কাটেন না সুফিয়া নিজেও। এই ভাঙ্গা ঘরে তিনি নিজের হাতে রাঁধেন,

খাওয়ান ছেলেমেয়ে স্বামী আর আত্মীয়-অতিথি-অভ্যাগত সবাইকে। জ্বরতপ্ত দেহেও তাঁকে এ করতে দেখেছি। অকারণেও কোন ছেলের হয়তো তাড়াহুড়ার অন্ত নেই। বই বগলে জিন-বাঁধা ঘোড়ার মতো পা উঁচিয়ে আছে স্কুলের পথে ছুট দেওয়ার জন্য। সে অবস্থায়ও এক হাতে বর্তন তুলে ধরে অন্য হাতে গ্রাস বানিয়ে বানিয়ে অস্থির ছেলের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন মা। সুফিয়ার এ মাতৃমূর্তিও আমাদের অনেকের স্বচক্ষে দেখা। তবুও দেখিনি বিরক্তির চিহ্ন তাঁর মুখে কোনদিন।

সারা পূর্ব পাকিস্তানে এমন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী খুব কমই আছেন, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে, যে এক আধবার ঐ ভাঙ্গা ঘরে তীর্থ করতে যায়নি। বাংলা দেশের মানুষ প্রিয়জনের সঙ্গে কোনএকটা সম্বন্ধ না পাতলে কিছুতেই স্বস্তি পায় না। তাই তিনি কারো খালা, কারো ফুফু, কারো বা মা-ই। এখন বোধ করি দাদী নানীতেও উন্নীত। কাজেই অতিথি-মেহমানের কোন অভাব ঘটে না তাঁর ঘরে। পরিচিত নিম-পরিচিত, স্রেফ নামে পরিচিত কিংবা বাপের কি মায়ের সুবাদে একটুখানি জানা কি শোনা তারাও এসে জোটে। ফিরে যায় একটা সুকোমল মানুষের অকৃত্রিম স্নেহ-শীতলস্পর্শে স্নিগ্ধ হয়ে। তাঁর সান্নিধ্য থেকে বেজার মুখে ফিরতে কাকেও কোন দিন দেখা যায়নি।

সুফিয়া কবি হিসাবে যত বড় না তার চেয়ে অনেক বড় মানুষ হিসেবে —ব্যক্তিত্ব আর চরিত্রের দিক দিয়ে। সুফিয়ার বৈশিষ্ট্য আর বড় আকর্ষণ এ ব্যক্তিত্ব আর চরিত্র যা সব দিক দিয়েই অনন্য ও অদ্বিতীয়। দৈহিক অবয়বে ছোট-খাটো সুদর্শনা পরম স্নেহশীলা ও কোমল স্বভাবা সুফিয়া যে প্রয়োজনের সময় কতখানি কঠিন হতে পারেন, পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী আর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তা অজানা নয়। আয়ুবীয় সামরিক শাসনের জাঁতাকলে অনেক ডাক সাইটে বুদ্ধিজীবীকেও ভেঙ্গে চুরমার হতে দেখেছি, বহু সংগ্রামী বিপ্লবীকে মাথা নুইয়ে মুচড়ে ত্রিভঙ্গ হতে। প্রলোভনের ইন্দুরকলে ধরা দেয়নি এমন বান্দা খুব

কমই ছিল সেদিন। কিন্তু সুফিয়া কামাল থেকেছেন সব সময় উন্নতশির। ঘুষ বা ঘুষি কিছুতেই এ ক্ষুদ্রদেহী নম্র স্বভাবা মানুষটাকে নোয়াতে পারেনি। একখানি ক্ষুদ্র কোমল দেহের অন্তরে যে এমন শক্ত এক অনম্য মেরুদণ্ড বিরাজ করছে, তা সত্যই অকল্পনীয়। সাম্প্রতিক কালে তাঁর এই অসীম চারিত্র্য-শক্তির পরিচয় তিনি বার বার দিয়েছেন। দুর্দান্ত গভর্ণরের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কতবারই ত মিছিলের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে ন্যায় আর সত্যের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন তিনি। এমন কি সে পতাকাকে বহন করে নিয়ে গেছেন কংস প্রাসাদের প্রহরী বেষ্টিত ফটক পর্যন্ত। ফটক বন্ধ করে দিয়ে 'কংস-মহারাজকে'ও সেদিন মুখ ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে এক ক্ষুদ্র-কায়া মহিলা-পরিচালিত মিছিলের ভয়ে। এসবই ত আমাদের হালের ইতিহাসে এবং অলিখিত ইতিহাসের উপকরণ।

সুফিয়া কামালের দুই সত্তা। কবি হিসাবে তিনি এক সুকোমলা নারী, প্রেম ভালোবাসা আর সুকুমার অনুভব-অনুভূতির মূর্তিমান প্রতীক—তাঁর কবিতাও তাই। সুফিয়াকে মহিলা কবি বললে কিছুমাত্র ছোট করা হয় না। আপাদমস্তক মহিলাই তিনি, স্বভাবে-চরিত্রে আচারে-আচরণে মহিলাই তিনি থেকেছেন সব সময়। তাঁর জন্ম-সত্তা আর স্বভাবকে তিনি ডিঙ্গাতে চাননি কখনো। হতে চাননি মহিলা-পুরুষ কিংবা পুরুষ-মহিলা। সংগ্রামের সম্মুখ সারিতে দাঁড়িয়েও তিনি মহিলাই থেকেছেন, তাঁর স্বভাব-মাধুর্য আর মনের সুকুমারত্ব হারাননি এতটুকুন কোন অবস্থাতেই।

এখন অধীত বিদ্যার যুগ। আধুনিক কবিতা এ যুগধর্মেরই প্রতিনিধি। সুফিয়া অধীত বিদ্যার কবি নন, দোষ হলেও এসত্য, গুণ হলেও তাই। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কন্যা, তার আবহাওয়া আর পরিবেশে গড়া তাঁর কবি-সত্তা। তাঁর কবিতার গায়ে এখানকার শ্যামল প্রকৃতির সুকোমল ছায়া ছড়িয়ে আছে—অন্তরেও এ প্রকৃতির স্নিগ্ধতাই প্রতিবিম্বিত। প্রেম

তাঁর কবি-সত্তার মূল সুর, শুরু থেকে সে সুরেরই অনুসরণ চলছে তাঁর কবিতায়। জীবনের এ মুগ্ধ আবেশ বিচার-বিশ্লেষণের পরিপন্থী। তাই তিনি বিচার-বিশ্লেষণধর্মী কবি নন। আবেগী সৌন্দর্য চেতনায় তাঁর কবিতার দেহ-মন রঞ্জিত। নগরে থাকলেও নগর-জীবনের কবি তিনি হননি বা হতে পারেন নি। সহজ-সরল সুন্দরেরই এক স্বভাব-কবি তিনি। আমাদের চারদিকের প্রকৃতিতে 'জল পড়া, পাতা নড়া' দেখে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর কবিতা সেই মুগ্ধ মনেরই প্রকাশ।

সর্বতোভাবে মহিলা হলেও তাঁর মধ্যে এক অনম্য পৌরুষ সত্তা রয়েছে। জাতীয় জীবন ও মানসে সে সত্তার মূল্য ও অবদান আরো গুরুত্বপূর্ণ। যা তাঁর চরিত্রেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এ চারিত্র্য-শক্তিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

একটি অলিখিত ঘটনা :

মৌলিক গণতন্ত্রের দলিল তৈরী হয়েছে। এ দলিল তৈরীর শাসন-তান্ত্রিক দায়িত্ব আইনমন্ত্রীর। তখন আইনমন্ত্রী ছিলেন আর এক চরিত্রবান ও শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষ মরহুম জাস্টিস ইব্রাহীম। আয়ুবের রক্ত-চক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি এমন দলিল বানাতে আর তাতে নিজের নাম সই করতে স্রেফ অস্বীকার করে বসলেন। পরে ত এ কারণেই তিনি বেরিয়েই এলেন আয়ুবীয় মন্ত্রিত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে। তখন এ ঘৃণ্য কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় বৈদেশিক মন্ত্রীকে। এ কুকীর্তির পুরস্কার স্বরূপ তাঁর মাথার উপর তখন থেকেই অনবরত বর্ষিত হতে থাকলো অজস্র সরকারী প্রসাদ। এমনকি সরাসরি তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসও বানিয়ে দেওয়া হলো। হাইকোর্টের ইতিহাসে যা ইতিপূর্বে

দেখা যায়নি কখনো। এ চালের হিসাবে কোথায় যেন ভুল হয়েছিল। পরে দেখা গেল এ টোপ হজম করা মনজুর কাদিরের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। অগত্যা শেষ পর্যন্ত ঐ টোপ উদ্‌গার করেই তিনি বাঁচলেন। তারপর থেকে শুরু হলো অন্য ভাবে প্রসাদ বিতরণের পালা, যা তথাকথিত আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা পর্যন্ত এসে ঠেকেছিল। এ মামলার এক আর্জি তৈয়ারীর ফি-ই নাকি দেওয়া হয়েছিল তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ধার্য হয়েছিল তাঁর দৈনিক ফি পাঁচ হাজার! আয়ুব সরকারের আমলে গৌরীসেনের টাকার শ্রাদ্ধ কিভাবে হয়েছিল, এও এক নজিরবিহীন নজির।

যাই হোক, মৌলিক গণতন্ত্রের দলিল ত তৈয়ারী হলো, কিন্তু এ দলিলের কিছু সমর্থক জোটাতে না পারলে ত দেশে-বিদেশে মুখরক্ষা হয় না আয়ুবের। বুদ্ধিজীবীদের বেপরওয়া গালমন্দ দিয়ে যতই হেয় করার চেষ্টা হোক না কেন, কিন্তু দেশের মানুষের কাছে এদের সমর্থনের একটা বিশেষ মূল্য আছে—এ সত্য মনে মনে আয়ুবেরও অজানা নয়। তাই শুরু হলো সমর্থক সংগ্রহের অভিযান। অন্তত সই চাই দু-চার জন বুদ্ধিজীবীর। অভিযান শুরু হলো গোপনে এবং অত্যন্ত সুকৌশলে। চরদের এক হাতে তুলে দেওয়া হলো মোটা ঘুষ, অন্য হাতে মোটা লাঠি। যেখানে যেটা কাজে লাগে। সুফিয়া কামালের কাছেও পাঠানো হলো এমন এক চর। যিনি এলেন, তিনি অবস্থার হেরফেরে পরে সরকারী এক আধা প্রকাশ্য আর আধা গোপন সংস্থায় তখন চাকুরী করলেও অন্তরে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সুফিয়াকে জানেন দীর্ঘ কাল ধরে, মনে মনে শ্রদ্ধাও করেন। এমনকি আপাও ডাকেন।

একদিন সন্ধ্যার আবছা আঁধারে কিছুটা গা-ঢাকা দিয়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটলো সুফিয়াদের তারাবাগের সেই জীর্ণ কুটিরে। সৌভাগ্যবশতঃ ওঁদের ছোট ছেলে মেয়েরা ছাড়া বাইরের কেউ তখন

ছিল না ঘরে। আশ্বস্ত বোধ করলেন মৌলিক গণতন্ত্রের দূত। দেখলেন সুফিয়া কামাল তপ্ত উনানের কাছে বসে চাল ভাজছেন। পরিচিত স্নেহভাজনকে দেখে তিনি তাঁর স্বভাব মধুর কণ্ঠে বলে উঠলেন, এসো, এসো, বসো। ছেলে-মেয়েদের চা খাওয়ার জন্য কিছু নেই আজ ঘরে, তাই চাল ভেজে দিচ্ছি। চালভাজা দিয়ে চা খেতে তোমার অরুচি নেই ত? আজ এ দিয়েই চা খেয়ে যাও। আর একদিন এসো, ভালো করে খাইয়ে দেবো। ভদ্রলোক ভিতরে ভিতরে খুব খুশী হলেন। আশ্বস্ত বোধ করলেন। ধরে নিলেন এতো উপযুক্ত মওকা। অভাবে স্বভাব নষ্ট। এ শুধু মনস্তাত্বিক ব্যাপার নয়, পরীক্ষিত সত্যও। আশা জাগলো, তাঁর মিশন সফল না হয়ে যায় না আজ। চাল ভাজা দিয়ে চা তিনিও খেলেন। খেয়ে আস্তে আস্তে প্রস্তাবটা পেশ করলেন: স্রেফ একটা সই দেবেন শুধু। আর কিছু করতে হবে না আপনাকে। আপনি যত...চান। পাঁচ...সাত.. দশ হাজার পর্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ আছে আমার উপর।

সুফিয়া নীরবে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন নিজের দীর্ঘ দিনের স্নেহভাজনের প্রতি। কথা বলতে পারলেন না অনেকক্ষণ।

: সরকার আপনার একটা সই চায় মাত্র। অনেকেই দিয়েছেন, নাম বলা বারণ···না হয় তারা কেউই আপনার অপরিচিত নয়।

সুফিয়া কামালের মুখ এবার আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বিরক্তি প্রকাশ কি ক্রুদ্ধ হওয়া তাঁর ধাতের বাইরে। কোন অবস্থায়ই কথা আর ব্যবহারে মাধুর্য তিনি হারান না। সব সময় সংযত আচরণ তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। শান্ত কণ্ঠেই বললেন: তুমি যা বলছো তা যদি আমি করি কাল থেকে তুমিই আমাকে আপা ডাকা ছেড়ে দেবে। সত্য কিনা বলো?

এমন প্রশ্ন ভদ্রলোক আশা করেননি, ভাবেনও নি। উত্তর খুঁজে

না পেয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। সুফিয়াই ফের বললেন, দেশের অগণিত ছেলেমেয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। কিছুরই বিনিময়ে ওদের চোখকে আমি ফাঁকি দিতে পারবো না। তুমিই বলো, এ যদি আমি করি, কাল থেকে ওদের সামনে আমি মাথা তুলে কথা বলবো কি করে? তোমার মতো তারাও তো আমাকে আপা ডাকে। এর পর ডাকবে কি? অগত্যা মৌলিক গণতন্ত্রের দুতকে নিরাশ আর ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হ'লো।

এ সুফিয়া কবি সুফিয়ার চেয়ে বড়। এখানেই তাঁর আসল পরিচয়। তাঁর পূর্বসূরীদের কাছেও তিনি একারণেই শ্রদ্ধেয়া। ঐশ্বর্য আর দারুণ অভাব এ-দুয়ের সঙ্গেই সুফিয়ার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। কোন্‌টার কি স্বাদ সে অভিজ্ঞতা তাঁর মর্মে মর্মে জানা। তবুও প্রলুব্ধ তিনি হননি কখনো—কোন অবস্থাতেই প্রলুব্ধ হওয়ার পাত্রী তিনি নন। প্রলোভন যাকে টলাতে পারে না, নির্ভীকতা তারই ত সহজাত ভুষণ। তাঁর ললিত কোমল চরিত্রে মাঝে মাঝে যে ইস্পাত-কাঠিন্য দেখা যায় তা তাঁর এ সহজাত নির্ভীকতারই ফল। দেশে এমন চরিত্র আজ দুর্লভ।

ডক্টর এনামুল হক প্রসঙ্গে যে ডেপুটেশনের উল্লেখ করেছিলাম সুফিয়া কামালও সে ডেপুটেশনের সদস্য ছিলেন। যদিও স্বয়ং প্রেসিডেন্ট তখন ঢাকায় সরে-জমিনে হাজির, তবুও সেদিন ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চলছে ত্রাসের রাজত্ব। সর্বত্র একটা আতংক আর ত্রাহি-ত্রাহি রব। ছাত্র-অধ্যাপক কেউই বোধ করছে না নিরাপদ। কংস-প্রাসাদের সমর্থন ও ইংগিতে এক দল ছাত্র অধ্যাপকদের উপরও মার-মুখো আর পুলিশ হয়ে আছে নিষ্ক্রিয় দর্শক। তখন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকরা প্রতিকারের আশায় প্রেসিডেন্টের কাছে এক ডেপুটেশন পাঠান। ডেপুটেশন প্রেসিডেন্ট হাউসে গিয়ে দেখেন, প্রেসিডেন্টের পাশে বসে রয়েছেন স্বয়ং প্রদেশের কংস মহারাজ। বিচারকের পাশে আসামীর আসন ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি।

ডেপুটেশন বুঝতে পারলেন, এ অবস্থায় সুবিচারের আশা আকাশ-কুসুম।

এ ঘটনার কিছুদিন আগেই মাত্র তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঘটেছে পাক-ভারত সংঘর্ষের অবসান। দুই দেশেই নেমে এসেছে শান্তি। সাবেক প্রেসিডেন্টকে সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুফিয়া কামাল বললেন, আপনি তাসখন্দ চুক্তি করে অতবড় পাক-ভারত যুদ্ধ থামিয়ে দিতে পারলেন, সে তুলনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডগোল ত সামান্য ব্যাপার। এ-পারবেন না, এ-কি হয়?

মুহূর্তে রাষ্ট্র প্রধানের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ গর্জে উঠল: ওঁহা ত আদমি হে। ইহাঁ ত ছব হেওয়ান হে।

ছোট হোক বড় হোক সুফিয়া কামাল ত কবি। কবিরা চিরকালই সত্য ও নির্ভীকতার প্রতীক। এসব খড়ের বাঘদের দপ করে জ্বলে ওঠায় তিনি ভয় পাবেন কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন, তব আপ হেওয়ানকে প্রেসিডেন্ট হে…।

শুনে তপ্ত লোহার মতো লাল হয়ে উঠলেন সেদিনের 'লৌহমানব'। এক ক্ষুদ্রকায়া মহিলা যে তাঁর মুখের উপর এমন জবাব দিতে পারেন এ যেন তাঁর কল্পনার বাইরে। রাগে-বিস্ময়ে কোন রা-ই যেন করতে পারলেন না তিনি অনেকক্ষণ ধরে।

ডেপুটেশন ফিরে এলেন মর্মাহত চিত্তে। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান দেশের বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভালো-মন্দ বুঝতে চান না এর চেয়ে দুর্ভাগ্য দেশের জন্য আর কি হতে পারে।

কবির কথাটার ইংগিত মুখ ফুটে কেউ না বললেও বুঝতে বেগ পেতে হলো না কারো। হেওয়ানের প্রেসিডেন্ট হেওয়ানই ত হয়ে থাকে। যেমন সিংহকে বলা হয় পশুরাজ।

হাঁ, যে কবিরা হক কথা বলতে কখনো ভয় পান না, সুফিয়া কামাল সে জাতীয় কবি। তাঁকে নিয়ে আমাদের গৌরব এ কারণেই।

পাশাপাশি বসা দুই 'লৌহমানব'ও কবির কথার ইংগিত যে বুঝতে পারেননি তা নয়, পেরেছেন বলেই হুঙ্কার দেওয়ার সাহসটুকুও খুঁজে পাননি সে মুহূর্তে তাঁরা। হক কথা এমনি মর্মভেদী।

বহু বিপর্যয়ের ভিতর দিয়েই সুফিয়া কামাল পৌঁছেছেন তাঁর বর্তমান জীবনে। দুঃখ দহনে তাঁর জীবন বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। আশ্চর্য, সে সবের কোন প্রভাব পড়েনি তাঁর কবিতায়, তাঁর চরিত্রে আর মন-মেজাজে। তাঁর কবিতা আজো ললিত মধুর ও সুকোমল অনুভব অনুভূতিরই প্রকাশ—যেমন তাঁর কবি-জীবনের সূচনায় ছিল। কিন্তু দুঃখ-দহনে তাঁর চরিত্র হয়েছে দিনে দিনে সোনার মতো একদিকে কঠিন অন্যদিকে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। সুফিয়া কামালের এ দীপ্তিময় জীবন দেশের সামনে এক আলোকবর্তিকা হয়েই আছে।

শত উক্তি

লেখকের ষষ্টিতম জন্মদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর
বিভিন্ন রচনা থেকে সংকলিত ও প্রকাশিত

১

ধর্ম, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক মতবাদ বা ইজম্—এ সবের কোন একটাকে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি করতে গেলে বনের বাঘকে খাঁচায় বন্ধ করলে যে দশা হয় সাহিত্য শিল্পেরও সে দশা ঘটে।

২

লেখকের জন্য লেখার শাসন ছাড়া অন্য কোন শাসন নেই, অন্তত যখন তিনি লিখতে বসেন তখনকার মতো। তখন তিনি শুধু শিল্পী, শিল্পের শাসনে তিনি যুগপৎ বন্দী ও মুক্ত।

৩

শাস্ত্র, রাষ্ট্র ও মতবাদ সবই এক একটা শৃঙ্খল। সাহিত্য মানুষের মনের মুক্তির ক্ষেত্র। তাই সাহিত্যিককে এ সব শৃঙ্খল ভেঙ্গে ভেঙ্গেই এগুতে হয়।

৪

ঐতিহ্যকে মানা মানে অতীতের ও বর্তমানের যা কিছু স্মরণীয় তাকে যথাযথ মূল্য দেওয়া—এ মূল্য দেওয়ার উপরই নির্ভর করে সাহিত্য শিল্পের তথা সভ্যতার ধারাবাহিকতা।

৫

বর্ণ বা সম্প্রদায়ের নামে অথবা জাতি কি ভাষাগত কারণে সাহিত্য শিল্পের স্মরণীয় ঐতিহ্য বিশেষকে উপেক্ষা করা মানে নিজের শিল্প সাধনাকে খর্ব করা—ছোটর জন্য বড়কে ত্যাগ করা।

৬

সৃষ্টি বলতে যা বুঝায়—কি সাহিত্যে, কি জীবনে—তার .ষাল আনাই নির্ভর করে ধৈর্য্য ধরে খাটবার শক্তির উপর, যার চলতি নাম প্রতিভা। আমাদের তরুণরা যদি প্রতিভার এ অর্থ ও তাৎপর্য্য উপলব্ধি করেন, তার মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকেন তা হলেই তাঁরা সাহিত্যে, শিল্পে ও জীবনে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন--যে সৃষ্টি ছাড়া কোন জাতি, কোন দেশ কোনদিন বড় হতে পারেনি। আমরাও পারব না।

৭

সেয়ানা আর সুবিধা-সন্ধানী মাঝারীর ভাগ্যেই জোটে অর্ধেক রাজত্ব আর আস্ত রাজকন্যা। প্রতিভাবানের জন্য তোলা থাকে কাঁটার মালা। তবুও দুনিয়ায় কাঁটার মালা গলায় পরার লোকের অভাব হয়নি কোনদিন। যে জাতির মধ্যে ঐ রকম লোকের সংখ্যা যত বেশী সে জাতি তত মহৎ ও তত বেশী সভ্য। পূর্ব পাকিস্তানের তরুণদের ভাগ্যলিপি হোক গলায় এ কাঁটার মালা পরার সাধনা।

মানুষ যুক্তি, বিচার ও বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী, তার জন্য রচিত যে কোন শাসনব্যবস্থাও তাই যুক্তি বিচারের অনুগামী হওয়া চাই—বুদ্ধিগ্রাহ্য না হলে সেই শাসন কখনও মানুষের অন্তরের স্বীকৃতি লাভ করে না।

৯

আমার বিশ্বাস আজ মানুষের জন্যে আইনের তথা Constitution-এর পথ ছাড়া অন্য পথ নেই। পাকিস্তানেরও ভবিষ্যতে অগ্রগতি আইনের পথে চলার উপরই নির্ভর করে।

১০

মানুষ আত্মাহীন জড় পদার্থ নয়। রুদ্ধ নিশ্বাস আর রুদ্ধবাক কঠোরতার খড়্গ সব সময় তার উপর ঝুলতে থাকলে তার বিকাশ প্রাচীন চীনা রমণীর পায়ের মতই রুদ্ধ হয়ে থাকবে।

১১

যে শাসন কাঠামো দিয়ে মানুষকে শাসন করা হয়, তার সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার, আলোচনা-সমালোচনা করার অধিকার তার থাকা চাই। মানুষকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে শাসনতন্ত্র জড়যন্ত্রে পরিণত হতে বাধ্য। তখন বিচারক আর ফাঁসীর রজ্জুতে কোন তফাৎ থাকবে না।

১২

আলোচনা সমালোচনার সাহায্যেই শাসন ব্যবস্থা তার স্বাধীকার লাভ করে। গ্রহণ বর্জনের ভিতর দিয়ে নানা রীতি ও convention সৃষ্টি করতে রাষ্ট্র ও তার সভ্যতা সুস্থ ভাবে গড়ে উঠে আর স্বাভাবিক রূপ নেয়। এইভাবে আদিম মগের মুল্লুক হয়ে উঠে মানুষের মুল্লুক।

১৩

সমাজ ও রাজনীতি হাত ধরাধরি করে চলতে বাধ্য। চোরে আর সাধুতে মাসতুত ভাই হয় না—এটা রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও সত্য। ফেরেস্তার সমাজে রাজনীতিবিদরা সব সয়তান আর সয়তানের সমাজে রাজনীতিবিদরা সব ফেরেস্তা এমন স্ববিরোধী কথা কোন সমাজ-বিজ্ঞানীই মানবে না।

১৪

সাহিত্যের বাণী মাত্রই স্বাধীনতার বাণী। স্বাধীনতা মানে জীবনকে জানা, জীবনের দাবী বুঝে নিয়ে জীবনের রূপায়ন।

১৫

শিল্পী মানে জীবনশিল্পী, জীবনের লক্ষণ যেখানেই প্রকাশ পায়, শিল্পীমানস তাকে স্বীকার না করে পারে না।

১৬

সচেতন শিল্পীকে সব সময় মনের দরজা জানালা খুলে রাখতে হয় এবং তাহলেই অপক্ষপাত মন নিয়ে রাজনীতি ও অর্থনীতির যত সব ইজম্‌, সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে যত সব চিন্তাধারা তার বিচার তিনি করতে পারবেন এবং তখনই তাঁর পক্ষে সম্ভব নীর ছেড়ে ক্ষীর গ্রহণ।

১৭

আমরা যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিকামী। আমাদের লেখনী যুদ্ধ-প্রচারকের দাসীবৃত্তি করে কখনো কলুষিত হবে না, যুদ্ধ ও ধ্বংসের হাত থেকে মানবতাকে রক্ষা করা আমাদের এক পবিত্র ব্রত। এ অর্থেই সাহিত্যিকের লেখনী-মুখ-নিসৃত কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র' এক সার্থক ও অর্থবহ বাণী।

১৮

পাখীর পক্ষে যেমন এক সঙ্গে নীড় ও আকাশ সত্য, তেমনি আমাদের পক্ষেও স্বদেশ এবং বিশ্বজগৎ যুগপৎ সত্য।

১৯

গাছ আকাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে ফুল ফুটিয়ে সৌরভ ছড়ায়, কিন্তু শিকড় দিয়ে রস আহরণ করে মাটি থেকে। আমাদের পক্ষেও সাহিত্যের প্রাণরস স্বদেশের মাটি থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।

২০

বুদ্ধি ও যুক্তিবিমুখ যে রাজনৈতিক চেতনা তা সমাজ ও মানবতা বিরোধী তথা ব্যক্তিগত সুবিধাবাদে পর্য্যবসিত না হয়ে পারে না।

২১

সাহিত্যে স্বধর্মের একটা অর্থ নিজের মত হওয়া। আমি শরৎ চন্দ্রের নকল করতে গেলে শরৎচন্দ্র তো হবোই না বরং নিজের মত হওয়ার যে সম্ভাবনাটুকু ছিল তা-ও তিরোহিত হবে। বাঙালী আরব হতে চাইলে আরব তো হবেই না, বাঙালী হওয়ার সম্ভাবনা-টুকুও লোপ পাবে।

২২

জাতীয় জীবনে 'রেনেস াস' বা জাগরণ হাওয়ায় ভর করে উড়ে আসে না—আসেনা বন্যার পানিতে ভেসে। এর জন্যে যথেষ্ট প্রস্তুতি চাই, উপযুক্ত উপকরণ উপাদান সংগ্রহ করা চাই—চাই বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে তাকে গ্রহণ করার মনোভাব।

২৩

স্বাধীন যুক্তিবিচার ছাড়া কোন জ্ঞান সাধনাই সার্থক হতে পারে না।

২৪

গোঁড়ামী মানে—অন্ধতা, বুদ্ধি বিবেচনা ও যুক্তি বিচারের কানে তালা চাবি মারা।

২৫

আমার দেশ, আমার ধর্ম, আমার সভ্যতা, আমার জাতি জগতের সেরা—এ মনোভাব হাস্যাস্পদ। এতে শুধু সংকীর্ণ আত্মঅহমিকাই প্রশ্রয় পায় আর নিজেকে করে তোলা হয় কূপমণ্ডুক।

২৬

সাহিত্য ও শিল্পের কাজ মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করা—মনকে শুধু মুগ্ধ করা নয়, হৃদয়কে জাগিয়ে তোলাও।

২৭

মহাপুরুষের প্রতি যত বেশী অলৌকিকতার আরোপ আমরা করব তত বেশী তিনি আমাদের পর হয়ে যাবেন। তাঁকে গ্রহণ না করার ফন্দি হিসেবে এটা মন্দ উপায় নয়, কিন্তু নিজেরা থেকে যাবো বঞ্চিত।

২৮

দেশ বা জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায় মানুষের জন্য যত বড় সম্পদই হোক না কেন মনুষ্যত্ব বা মানবধর্ম তার চেয়ে অনেক বড়, বহু উর্ধ্বে তার স্থান।

২৯

বিশ্বাস বা ঈমান সবরকম শুভকর্ম ও সৎজীবনের উৎস। তাই ধর্মে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিশ্বাসহীন জীবন কেন্দ্রচ্যুত ও নোঙরছেঁড়া নৌকার মতই। জীবন কেন, সাহিত্য শিল্প বেঈমানীর উপর দাঁড়াতে পারে না। কোন একটা ঈমানের উপর দাঁড় করাতে না পারলে বইয়ের চরিত্রও পায়না কোন চরিত্র গৌরব।

৩০

আমাদের মন্ত্র হবে মানবতন্ত্র। কোন ধর্মের মহৎ শিক্ষাকেই আমরা নির্বাসন দেবনা।

৩১

পাকিস্তানী সভ্যতা কি আর তার খোঁজ মিলবে কোথায়? আচার ব্যবহারে তা রক্ষার ভার আমরা এখন তুলে দিয়েছি অন্তজাতির হাতে। তার বদলে আমরা তুলে নিয়েছি নকল আমেরিকিয়ানা তথা টেডিপনা।

৩২

আবরু রক্ষার জন্য যেটুকু বস্ত্র অত্যাবশ্যক তা অতি সামান্যই। কিন্তু সৌন্দর্য্য ও রুচির খাতিরে যে পোষাক তাতে কাপড়ের কৃপণতা চলে না—দরজির নৈপুণ্যকেও করা যায় না অগ্রাহ্য। রুচি কখনও সুবিধা আর প্রয়োজনের পাঁচিলে বাঁধা থাকে না।

৩৩

আধুনিক রাষ্ট্র স্থাণু নয়—প্রগতিশীল। প্রগতিশীল বলেই পরিবর্ত্তন-শীল।

৩৪

মনে রাখতে হবে আমরা আজ ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে বাস করছি। আমাদের তরুণরাও ইতিহাসের অংশ এবং নূতন ইতিহাস রচনার উপকরণ। এ বোধ দেশের প্রত্যেক তরুণ তরুণীর মনে জাগাতে হবে। এ ভূমিকা সম্বন্ধে তাদের হতে হবে সচেতন।

৩৫

ঐতিহ্যও ঐতিহ্যই শুধু। ঐতিহ্যের জাবরকাটা কখনো ঐতিহ্যকে গ্রহণ নয়। গ্রহণ মানে যাচাই করে গ্রহণ, নির্বিচারে গ্রহণ মানে অন্ধ অনুকরণ। অতীতের অন্ধ অনুকরণ কখনো ঐতিহ্যচর্চ্চা হতে পারে না।

৩৬

রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি তোমার বাইরের চেহারাটা দেখ। তাকে মেজে ঘসে সুন্দর করে তোলার চেষ্টাও কম করনা, এমন কি পাউডার ক্রিম মেখে খোদার উপর খোদকারী করতেও ছাড়না। অথচ মনকে সুন্দর করে তোলার কোন চেষ্টাই তোমার মধ্যে দেখা যায় না। আসলে মনই রচনা করে সাহিত্য। মনে ফুল ফুটলেই কলমের মুখে সাহিত্যের ফুল ফোটে।

৩৭

সাহিত্য একটি শিল্পকর্ম। সব শিল্পের মত সাহিত্যেও প্রস্তুতি বা শিক্ষানবিশি অপরিহার্য।

৩৮

জীবজগতে মানুষ এক বিচিত্র প্রাণী। তার দেহ ও মন দুইই বিচিত্র রহস্যের অতল ও অকূল এক সমুদ্র। এর আদি নেই, নেই অন্তও। এ রহস্যোদ্‌ঘাটনের বিরামহীন প্রয়াসই সাহিত্যশিল্পকেও দিয়েছে অনন্ত পরমায়ু।

৩৯

সব বনে বাঘ থাকে না, কিন্তু সব মনেই এক একটা বাঘ লুকিয়ে থাকে। এই বাঘের ভয়েই আমরা শঙ্কিত সন্ত্রস্ত। অধিকাংশ মানুষকে বনের বাঘে খায়না, কিন্তু তারা হয়ে পড়ে মনের বাঘের শিকার।

৪০

সব শিল্পের মূলকথা প্রকাশ। প্রকাশ যত অবাধ ও বিচিত্রমুখী হয় শিল্পও হয় তত সম্পদশালী।

৪১

চিন্তার চেয়ে, ভাবের চেয়ে বড় শক্তি নেই। চিন্তা ও ভাবের স্বাধীনতা হরণ করে তাকে রুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা মানে মানুষের মনকে খাটো করা, দুর্বল করা। এমন মন কখনওMature বা প্রবীণ হওয়ার সুযোগ পায় না। এমন নাবালক মন নিয়ে আর যাই হোক বড় কিছু করা যায় না, গড়া যায় না মহৎ কোন শিল্প-ইমারৎ।

৪২

আমি স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী। চিন্তা ভুল হতে পারে কিন্তু যে চিন্তায় আন্তরিকতা রয়েছে তা কখনো মূল্যহীন নয়। স্বাধীন চিন্তা লেখক ও পাঠক উভয়ের মনের দিগন্ত খুলে দেয়। মনের বন্ধনের চেয়ে বড় বন্ধন আর নেই। সে বন্ধন কাটার প্রধান হাতিয়ার স্বাধীন চিন্তা।

৪৩

লেখকরা যদি স্বাধীন চিন্তায় বাধা পান তাহলে অচিরে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতেই তারা যাবেন ভুলে। লেখকরা ভুলে যাওয়া মানে জাতি ভুলে যাওয়া। যে জাতির মনে নব নব চিন্তার অগ্নিস্পর্শ ঘটেনা সে জাতি অচিরে ভীরু আর কাপুরুষে পরিণত হবে।

৪৪

বলাবাহুল্য আন্তর্জাতীয়তার আগে জাতীয়তা। জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলার পর আন্তর্জাতিক সাহিত্যে বিচরণ সহজ ও সম্ভব। যে ব্যক্তি পুকুরে সাঁতার কাটতে অক্ষম তার পক্ষে সমুদ্র সন্তরণের বুলি না আওড়ানোই ভালো।

৪৫

কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়, বাইরের ঘটনা প্রবাহই যুগ বিশেষকে নতুন চেতনা ও নতুনতর জীবন জিজ্ঞাসায় সজাগ ও উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এই নতুন চেতনারই ফলশ্রুতি সাহিত্যে ও শিল্পে নতুনত্ব ও বৈচিত্র।

৪৬

নিঃসন্দেহে আত্মতৃপ্তি সাহিত্য ও শিল্পের এক বড় শত্রু।

৪৭

প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ অনেক সময় নতুনকে গ্রহণ করার পথ সুগম করে দেয়। কল্পনায় আর প্রকাশে দুঃসাহস যা আধুনিকতার এক লক্ষণ তার সঙ্গে গভীর ও আন্তরিক মননশীলতার সংযোগ না ঘটলে শিল্পসৃষ্টি সার্থক হতে পারে না।

৪৮

নিজে চিন্তা না করার সবচেয়ে বড় কুফল সত্য মিথ্যা যে কোন কথা আর প্রচারণা বিশ্বাস করে বসা, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন লোকের স্বার্থপর কথাকেও বেদবাক্য মনে করা।

৪৯

মানুষ যেমন বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনি তার সাহিত্যও বিচ্ছিন্ন নয়। বর্তমানের অতিরিক্ত তার যেমন অতীত ও ভবিষ্যত আছে—সাহিত্যেরও তাই আছে। বর্তমানের যোগসূত্রে এ তিন একই মালার ফুলের মত এক সূতায় গাঁথা। এ উপলব্ধির উপরই নির্ভর করে সাহিত্যে আধুনিকতা।

৫০

মানুষের এক বড় পরিচয়—সে ভাবতে পারে, পারে যে কোন বিষয়ে চিন্তা করতে। সে চিন্তা ও ভাব মানুষকে সাহায্য করে মানুষ হতে। যারা যত বেশী চিন্তাশীল সভ্যতার পথে তারাই তত বেশী অগ্রসর। আর চিন্তার ক্ষেত্রে যারা পেছনে পড়ে আছে, সভ্যতায়ও পিছনের সারিতেই তাদের স্থান।

৫১

আজ সভ্যতা মানে উপকরণ প্রাচুর্য্য ও গতি। দ্রুতগামী বায়ুযানে কে কত হাজার মাইল ঘুরে এলো, কার আগে কে পৃথিবী চক্কর দিতে পারলো—এ হলো এখন সভ্যতার মাপকাঠি। মানুষ ভাববে কখন, চিন্তা করবে কখন—জীবনের গভীরতা উপলব্ধির অবসর কোথায় মানুষের আজ? এ যুগের মানুষের জীবনে কোন দর্শন নেই, নেই কোন নীতিনিষ্ঠ ও চারিত্রিক সততা। ফলে মানুষের মন ও সভ্যতা আজ আশ্রয়চ্যুত। বুদ্ধি ও চিন্তার চর্চা মানুষকে যুক্তিবাদী ও বিবেকী করে তোলে। যে কোন অবস্থায় বিবেকী মানুষ 'হিরোশিমা কি নাগাসাকি' ঘটাতে পারে না। বিবেকহীন সভ্যতা মানুষকে বর্বরতার কোন চরম সীমায় নিয়ে গেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ দুটি নাম তারই অক্ষয় স্বাক্ষর।

৫২

বর্তমান সভ্যতা কোন গভীর ভাব ও চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে ক্রমবর্ধমান এত উন্নতি সত্বেও পদে পদে ট্র্যাজিক পরিণতির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেনা মানুষ। এ সঙ্কটের দিনে বাঁচতে হলে মানব সভ্যতাকে একটা নীতি ও সত্যের উপর দাঁড় করাতে হবে। আর তা করাতে হলে মানুষকে ভাবতে হবে, করতে হবে চিন্তা ও যুক্তির চর্চা, হতে হবে বিবেকী।

৫৩

সমাজের অংগ প্রত্যংগ ব্যক্তি। ব্যক্তি সজীব—তার আছে বিকাশ, আছে ক্রমোন্নতি ও পরিণতি। সমাজও তাই, সমাজের পাদপীঠ আইন। আইন ছাড়া সমাজ নৈরাজ্য।

৫৪

সমাজ যেমন সজীব, যে আইনের দ্বারা সমাজ শাসিত সে আইনও যদি সজীব না হয় তা হলে আইন তার স্বার্থকতা হারিয়ে বসে। আইন যদি সচল ও সজীব জীবনের অংশ না হয় তাহলে প্রাণহীন যন্ত্রের বেশী তার আর মূল্য থাকে না।

৫৫

সব মানুষেরই একটা সার্বভৌম এলেকা আছে। দেশ সম্প্রদায় ও জাতির উর্ধ্বে তার স্থান। ধর্ম, সত্য, মানবতা আর তার প্রতিভা এবং সেই সঙ্গে নবী আর মহাপুরুষেরা হচ্ছেন সে এলেকার বাসিন্দা। সে সবের গলায় 'জাতীয়' লেবেল লাগালে ঐ সবকে অত্যন্ত ছোট করে ফেলা হয়। তাতে ধর্ম ও সত্যের বৃহত্তর উদ্দেশ্য খণ্ডিত ও পীড়িত হয়।

৫৬

শক্তিমান লেখকের একটি গুণ—ভাষা ও ভাবে বেপরোয়া হতে তাঁর দ্বিধা নেই।

৫৭

অর্থনীতির যে তিনটি রূপ আজ আমরা আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি : ধনতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ ও ইসলামী অর্থনীতি—আমার বিশ্বাস শেষোক্ত দুই নীতির মধ্যে অনেকখানি মিল আছে। উভয়েই বাড়তি ধনের শত্রু। পার্থক্য যা তা উপায় বা পদ্ধতিতে।

৫৮

ইতিহাসের দুর্গম পথে প্রত্যেক জাতির জীবনেই সংকট মুহূর্ত আসে —সে সংকট মুহূর্তের মোকাবেলা করেই জাতি নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করে।

৫৯

মাতৃভাষার দাবী স্বভাবের দাবী, ন্যায়ের দাবী, সত্যের দাবী—এ দাবীর লড়াইয়ে কোন আপোষ চলে না। মৃত্যুর ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেই তার সম্মুখীন হতে হয়।

৬০

যে কোন জাতির জন্য সবচেয়ে মহৎ ও দুর্লভ উত্তরাধিকার হচ্ছে মৃত্যুর উত্তরাধিকার—প্রয়োজনের সময় মরতে জানা ও পারার উত্তরাধিকার।

৬১

ব্যক্তিগত সততা ও আন্তরিকতা যে কোন আদর্শ বা নীতি শিক্ষা থেকে বড়। বাইরের ধর্ম আদর্শবাদ কোন মানুষকেই খাঁটি মানুষ করতে পারে না যদি না তার ভিতরে সততা ও আন্তরিকতা থাকে।

৬২

বংশগত, সমাজগত, ধর্ম ও জাতিগত নানা সংস্কারের শৃঙ্খলে মানুষের মন বাধা। এ বন্ধন কাটাতে না পারলে মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ সম্ভব নয়। সাহিত্যের এক বড় কাজ মানুষের মনের এসব শৃঙ্খল ভেঙে দেওয়া মানুষকে সংস্কারমুক্ত করা।

৬৩

মানুষ প্রগতিশীল। চিন্তার রাজ্যে প্রগতি না এলে কর্মের রাজ্যে কখনও প্রগতি আসতে পারে না। আর চিন্তার বাহন হচ্ছে ভাষা ও সাহিত্য।

৬৪

দেশ ও জাতির বড় সম্পদ তার ভাষা ও সাহিত্য। সবদেশে, সবযুগে ভাষা ও সাহিত্য-শিল্পকে অবলম্বন করেই সম্ভব হয়েছে সব রকম উন্নতি ও প্রগতি।

৬৫

সাহিত্য ও শিল্পের পথ সত্যের পথ, সত্য অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম মনিব—ফাঁকি দিয়ে এ মনিবকে খুশী করা যায়না।

৬৬

জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করতে হলে জীবনকে জানা চাই—গভীর ও ব্যাপক পরিচয় থাকা চাই জীবনের সঙ্গে। জীবনের রূপায়ন খাঁটি ও সত্য হলে আপাত দৃষ্টিতে যাকে মানুষ মনে হয় চরিত্র গৌরবে সেও অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে।

৬৭

জীবনের লক্ষণই হচ্ছে নিজকে ছড়িয়ে দেওয়া, সংক্রমিত হওয়া। ইউরোপ আজ জীবন্ত, তাই তার ছোঁয়া ও প্রভাব আমাদের শাস্ত্রভীরু পীর সাহেবও এড়াতে পারেন না। তিনিও পরহেজগার আলেম ছেড়ে বেনামাজী সি, এস, পি'র সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে খুশী হন, তাঁর পুত্রবধূও বোরকা পরে সিনেমা দেখে।

৬৮

শিল্পীর পক্ষে অজ্ঞতা ও ভয়—দুইই শুধু মহা অপরাধ নয় মহা শত্রুও।

৬৯

জীবন্ত দেশ বা জাতি কিছুকেই অস্বীকার করে না। ইসলাম যখন জীবন্ত ছিল তখন সে একদিকে দু হাতে বিশ্বের সব জ্ঞান আহরণ করেছে অন্যদিকে নিজেকে আর নিজের সাধনা লব্ধ জ্ঞান বিশ্বময় দিয়েছে ছড়িয়ে। সে জীবন্ত যুগেরই হাদিস : 'জ্ঞান যদি চীন দেশে থাকে সেখান থেকেও তা আহরণ কর।'

৭০

সাহিত্যিকরা মনোধর্মী জীব। সব মনেরই খোরাক দরকার। বলাবাহুল্য আকাশকুসুম সে খোরাক নয়। বাস্তব থেকেই সংগ্রহ করতে হয় সে খোরাক। দেশের মাটি ও সব রকম উৎপাদন যন্ত্রকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর জনতার যে জীবন প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আবর্তিত, উন্মথিত ও বিকশিত হচ্ছে এখন তা দিয়েই সাহিত্য-শিল্পের নতুন ভুবন রচিত হবে।

৭১

বিশ্বাস ও উপাসনা মানুষের মনকে করে তোলে শ্রদ্ধাশীল ও বাড়ায় মনের গ্রহণ শক্তি বা Receptive power বিশ্বাস ও উপাসনার এ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ও সাক্ষাৎ ফল। হুরপরি বা অপ্সরী নয়।

৭২

গ্রহণ ছাড়া বিচারের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি বিচার ছাড়া গ্রহণও যে শুধু মূল্যহীন তা নয় বরং স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে তা হয়ে পরে মারাত্মক।

৭৩

জ্ঞান আর অন্ধ বিশ্বাস পরস্পরের জানা দুষমন। একের সঙ্গে অপরের আপোষ বা সমঝোতা সম্ভব নয় কখনো। তাই সর্বাগ্রে হতে হয় মুক্তবুদ্ধি।

৭৪

আজকের দিনে মুসলমানদের সামনে এ একটিমাত্র পথ ও এ একটি আদর্শই বিরাজ করছে—আধুনিক জ্ঞানকে গ্রহণ করা আর সে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে কোরাণ হাদিস ইতিহাস সব কিছুর অধ্যয়ন, যাচাই ও উপলব্ধি করা। এক কথায় বিচার করে গ্রহণ।

৭৫

ঐতিহাসিক বোধ ছাড়া আজকের দিনে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। এখন পৃথিবী আর আমাদের জেলা বা প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব আজ অকিঞ্চিৎকর।

৭৬

আজ সিনেমা ও রম্যরচনা যতই জনপ্রিয় হোক না কেন আমার বিশ্বাস মানব সভ্যতার শেষ আশ্রয় Wisdom বা বিজ্ঞতা। বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয়, ধর্ম নয়, জ্ঞান নয়, এখন কি Cultureও নয়। Wisdom। Wisdom মানে, আমার মতে, বিবেকের তথা মনুষ্যত্বের চিরজাগ্রত অবস্থা।

৭৭

রাষ্ট্রের চেহারা ও চরিত্র যেরূপ, দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির চেহারাও সেরূপ না হয়ে পারে না।

৭৮

পোষা বাঘ যেমন বাঘ নয়, পোষা শিল্পীও তেমনি নামি শিল্পী নয়।

৭৯

কোন চিন্তাই ব্যর্থ নয়। বিশেষ করে যে সব চিন্তায় রয়েছে সত্যানুভূতি ও প্রকাশের নির্ভিকতা।

৮০

রাষ্ট্রের সুরে সুর না মেলালেই মানুষ রাষ্ট্রদ্রোহী হয় না—হয় না রাষ্ট্রের দুষমন বা সমাজের শত্রু। যে সব যুক্তি মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে তার মধ্যে সবার সেরা হচ্ছে Reason বা যুক্তি।

৮১

ক্ষমতার মনোভাব—আমি যা ভালো মনে করি তাই একমাত্র ভালো, অদ্বিতীয় ভালো, জনসাধারণ তা মেনে নিতে বাধ্য! এ অবস্থায় যারা নিজের বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে ক্ষমতার ইয়েস্‌ম্যান্‌ হতে পারে তাদেরই পোয়াবারো।

৮২

মানুষ বিকাশধর্মী জীব—তার বিকাশের জন্য এযাবৎ যত উপায় উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সাহিত্য শিল্প শ্রেষ্ঠতম। এ বিকাশ মানুষের এত সহজাত যে মানুষকে মানুষ রেখে এর লোপ সাধন কিছুতেই সম্ভব নয়।

৮৩

অসহ্য কূপমণ্ডুকতার হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে শিল্পীকে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা দিতে হবে—মেনে নিতে হবে সাহিত্য শিল্পের এ প্রাথমিক শর্তটুকু।

৮৪

লেখক, পাঠক আর প্রকাশক এ তিনের যোগসূত্রে সাহিত্যের গতি আর সমৃদ্ধি বাঁধা আর গাঁথা। এ শৃঙ্খলের একটি কড়ার অনুপস্থিতিতেও সাহিত্যের গতিধারা অচল হয়ে পড়ে।

৮৫

খাঁটি সাহিত্যের কাছে শাস্ত্রকে এমনকি রাষ্ট্রীয় শক্তিকেও একদিন মাথা নোওয়াতে হবে—এ বিশ্বাসে আমি বিশ্বাসী।

৮৬

প্রাথমিক অবস্থায় মহৎ সব কিছুর প্রতি একটা অটল নিষ্ঠা থাকা চাই। অনেক সময় যে নিষ্ঠা হয়তো গোঁড়ামির কাছাকাছি গিয়েও পৌঁছে। তবে সাহিত্যই জোগায় সব রকম গোড়ামির সীমা পেরিয়ে উদার সূর্যালোকে পৌঁছার প্রেরণা।

৮৭

জাতীয় সংবাদপত্র জাতির কণ্ঠস্বর—সে কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়া মানে জাতিকে বোবা বানিয়ে দেওয়া।

৮৮

কৃষ্টি বা সংস্কৃতির মূলকাণ্ড সাহিত্য। সাহিত্যকে অবলম্বন করেই সাধারণত সংস্কৃতির নানা শাখা প্রশাখা দল মেলে।

৮৯

সাহিত্য-শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় বৈশিষ্টের কথা বলা হয় তা কখনো দ্বন্দ্বমূলক নয়, বরং মিলনমূলকই আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় Unity is Divinity—বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য।

৯০

আমার চতুর্দিকে যে জীবন ও প্রকৃতি—তা চেতন কি অচেতন যাই হোক তার সঙ্গে আমি নিঃসম্পর্কীয় নই—সে সবকে বাদ দিয়ে যে জীবন সে জীবন বাতায়নহীন কবরের জীবন।

৯১

সৌন্দর্য এ মহত্ত্বেকে কে দেশ ও কালের সংকীর্ণ গণ্ডীতে ফেলে বিচার করবে? প্রকৃত মূল্যবোধ যাঁর আছে তাঁর কাছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সত্য পালন আর বিংশ শতাব্দীর সত্য পালন সমান মর্যাদারই অধিকারী।

৯২

প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে না পারলে তা পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মতোই জীবনের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনাকে দলিত মথিত করে দেয়। ফলে প্রয়োজন হয়ে উঠে জীবন, তখন মহত্ত্বে ও সৌন্দর্য চর্চাকে মনে হয় বিলাস।

১৩

জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করতে ত্যাগের প্রয়োজন, ত্যাগ বর্জন নয়, বড় কিছুকে পাওয়া আর চাওয়ারই এক নাম ত্যাগ। ফুল ফলে পরিণত হয় তার পাপড়ি ঝরিয়ে দিয়ে। সভ্যতা আর সংস্কৃতির জন্য এধরণের ত্যাগের প্রয়োজন।

১৪

ঘরের প্রয়োজন আমাদের নিশ্চয়ই আছে এবং চিরকাল থাকবে কিন্তু ঘর যেন কবর হয়ে না ওঠে অর্থাৎ ঘর যেন ঘরের থেকেও বড় পৃথিবী ও আকাশকে আমাদের মন ও চোখ থেকে রুদ্ধ করে না রাখে, ঘরে বসে আমরা যেন বিশ্বের সঙ্গে বাণী বিনিময় করতে পারি।

১৫

সংস্কৃতি ও সজ্জীবন আমার কাছে একার্থবোধক। Cultured লোক বল্লে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে এমন লোকের ছবি যিনি সজ্জীবনের অধিকারী। সজ্জীবন Good life কে বাদদিয়ে কোন সংস্কৃতিরই আমি ধারণা করতে পারি না এবং সে রকম সংস্কৃতি আমার কাছে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার বস্তু নয়।

১৬

মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে, মানুষের স্রষ্টাও বিচ্ছিন্ন তথা শ্রেণীগত রূপ নিতে বাধ্য। তখন যত ধর্ম তত ঈশ্বর না হয়ে যায় না। মানুষের অখণ্ড রূপের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের অখণ্ড ধারণাও তখন নিশ্চিহ্ন। শ্রেণীগত ভাগের সঙ্গে তখন ঈশ্বরও ভাগ হতে থাকে।

১৭

সরকারের, বিশেষ ক[illegible]মহীন সরকারের মন অত্যন্ত নাজুক। আর তার চরম দুর্বলতা হচ্ছে তেমন সরকার নিজের সমর্থকদের কাছ থেকেও সমালোচনা শুনতে নারাজ।